অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন

রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ড. রাগেব সারজানি

অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসুল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ড. রাগেব সারজানি

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ

অনুবাদ

মুফতী সাইফুল ইসলাম
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)ভাটারা,ঢাকা-১২১২
সাবেক উস্তায,জামিয়া সাঈদিয়া কারীমিয়া ভাটারা,ঢাকা-১২১২

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল নবী-রাসূলগণের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন হলো ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি বিধি-বিধানের বাস্তব অনুশীলনের প্রদর্শনক্ষেত্র। তাই নবী-জীবন আমাদের জন্য জীবনাচারের এক অভিনব পন্থা পেশ করেছে। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবগোষ্ঠির প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য যতগুলো ঘটনাপ্রবাহের মুখোমুখি হতে হবে সকল কিছুর শর'ঈ সমাধানের বাস্তব ও সুস্পষ্ট নমুনা বিদ্যমান রয়েছে।

যে সমাজে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসবাস করতেন সে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে চাল-চলন ও আচার-আচরণের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর জীবনীতে। আর সে সমাজের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীই ছিলো ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিক প্রভৃতি অমুসলিমরা।

এ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ বিষয়ে। লেখক গ্রন্থটিতে বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণির অমুসলিমদেরকে সামাজিক স্বীকৃতি দান, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সদাচরণ, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিশেষ করে শত্রুনেতাদের প্রতি তাঁর মহানুভবতার চমৎকার বিবরণ পেশ করেছেন।

মুসলিম উম্মাহর নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে বাংলাভাষায় কোনো বই আমার

নজরে পড়ে নি। তাই বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ করার প্রয়াসী হই। অনুবাদে কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে আমাকে অবহিত করার জন্য পাঠকের নিকট বিনীত অনুরোধ রইল। অসীম দয়ালু আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন খালেসভাবে তাঁরই জন্য আমার এ পরিশ্রম কবূল করেন এবং এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতে নাজাতের অসীলা করে দেন। আমীন।

মু . সাইফুল ইসলাম

মুহাদ্দিস, জামিয়া ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)ভাটারা,ঢাকা-১২১২
সাবেক উস্তায,জামিয়া সাঈদিয়া কারীমিয়া ভাটারা,ঢাকা-১২১২
saifpas352@gmail.com :ই-মেইল

ভূমিকা

بسم الله والصلوة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد...

মানবজাতির জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম পূর্ণতার সুউচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ এবং সৃজনশীলতা ও অভিনবত্বের চুড়ান্ত সীমায় উপনীত। এ শাশ্বত ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রিকতার ব্যাপারে মহান আল্লাহর ঐ ঘোষণাই যথেষ্ট যা তিনি কুরআন অবতরণের সমাপ্তি লগ্নে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائ دة: ٣]

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি‘আমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩]

অর্থাৎ দীন পূর্ণাঙ্গ, নি‘আমতও পরিপূর্ণ। এতে কোনোরূপ অপূর্ণতার অবকাশ নেই। মানব জীবনের সকল বিভাগের প্রতিটি ক্ষেত্রের যাবতীয় নীতিমালা ও বিধি-বিধান এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছ। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ﴾ [الانعام: ٣٨]

“আমি কিতাবে কোনো ত্রুটি করি নি। অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৩৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«قد تركتكم على البيضاء . ليلها كنهارها . لايزيغ عنها بعدى إلا هالك»

“আমি তোমাদের সুস্পষ্ট-দীনের ওপর রেখে যাচ্ছি, যার রাত, তার দিনের

মতোই। আমার পরে যে ব্যাক্তি এর থেকে বিমুখ হবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।”[1]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন হলো ইসলামী শরী‘আতের প্রতিটি বিধি-বিধানের বাস্তব অনুশীলনের প্রদর্শনক্ষেত্র। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, শান্তি-অশান্তি, সফর-হযর, সুস্থতা-অসুস্থতা, সচ্ছলতা-দরিদ্রতা ও ভীতি-নিরাপত্তার সকল অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবগোষ্ঠির প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য যতগুলো ঘটনাপ্রবাহের মুখোমুখি হতে হবে সকল কিছুর শর‘ঈ সমাধানের বাস্তব ও সুস্পষ্ট নমুনা নবী চরিত্রের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবনে ঐ শ্রেণির মানুষের সাথে আচার-আচরণ এবং লেন-দেনের মডেলও উপস্থাপন করেছেন যে শ্রেণির মানুষের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিমদের কারো না কারো আচার-আচরণ এবং লেনদেন করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

নববী চরিত্রে মানবজাতির জীবন বিধানের যে রূপরেখা পেশ করা হয়েছে তা মূলতঃ মহান আল্লাহ তা‘আলারই প্রণিত, প্রদত্ত ও প্রেরিত জীবনবিধান, যা তিনি নবী জীবনের ২৩ বছরে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনানুসারে উপস্থাপন করেছেন। এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١﴾ [الاحزاب: ٢١]

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

---

1. ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৭১৮২; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩৩১।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে সংঘটিত প্রতিটি ছোট থেকে ছোট ঘটনার মাঝে রয়েছে তার পাক-পবিত্র ও স্বতন্ত্র আচরণ-বিধি, যা আমাদের মাঝে পেশ করেছে মু'আমালাত-মু'আশারাত ও সামাজিক রীতিনীতির এক আদর্শ মহাভাণ্ডার এবং আমাদেরকে দিয়েছে তার উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলির বিস্তারিত বিবরণ। ফলে তার প্রতিমুহুর্তের প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর আচরণ আমাদের জন্য হয়ে উঠেছে মহৎ চরিত্রের অনুপম দৃষ্টান্ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ»

“নিশ্চয় আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম গুণাবলীর পূর্ণতা বিধানের জন্যে।”[2]

নবী জীবনের কোনো কথা, কাজ, অবস্থা, ঘটনা কিংবা কারো আচরণের প্রতিউত্তর কিছুই তার প্রসংশনীয় চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত সংঘটিত হয় নি। এমনকি ঐসব স্থানেও তিনি তার মহৎ চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, যেখানে উত্তম ব্যবহার দেখানো সাধারণত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যেমন যুদ্ধ ও রাজনীতির ব্যাপারে, অত্যাচারী ও পাপাচারীদের এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সদা তৎপর ব্যক্তিবর্গের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে রাজনীতি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের অনেকের নিকটই রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের আচার-আচরণ ও মু'আমালা-মুয়াশারাতকে চারিত্রিক পরিধি ও মানবিক গুণাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ ব্যাপার বলে মনে হয়; কিন্তু সীরাতে নববীর পাঠক ও গবেষক মাত্রই নবী জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে এমনকি রাজনীতির ময়দানেও চারিত্রিক পরিস্থিতি ও মানবিক গুণাবলীর স্পষ্ট বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করবেন। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[2] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৪২২১; বায়হাকী, হাদীস নং ২০৫৭১; সিলসিলাতু আহাদীসিস সহীহাহ লিল আলবানী, হাদীস নং ৪৩।

ওয়াসাল্লামের এ অনন্য চরিত্রকে আল্লাহ তা‘আলা আযীম তথা ‘মহৎ’ বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤﴾ [القلم: ٤]

“আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।” [সূরা আল-কালাম, আয়াত: ৪]

নবী চরিত্রের এ মাহাত্ম্যের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তার চরিত্র যেমন চিন্তাগত দিক থেকে মহৎ ঠিক তেমনি বাস্তবায়নের দিক থেকেও মহৎ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবনে এ সত্যকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন যে, আল-কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় বিধিবিধানই মানব জীবনে বাস্তবায়নযোগ্য এবং গোটা মানবগোষ্ঠীকে সুশৃঙ্খলিত করার জন্য ও সৎপথ প্রত্যাশীদের জন্য একমাত্র সঠিক কার্যকরী দিক-নির্দেশনা। তাঁর জীবন ছিল আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। তার চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা[3] কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন,

«كانَ خُلُقُه القُرْآنَ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রেরই পূর্ণ ব্যাখ্যা হলো আল-কুরআন।”[4]

এ মহা সত্যের কেন এতো বিরোধিতা?

ইসলামের বিধি-বিধান ও নবী চরিত্র এত মহান ও গৌরবময়, সু-সভ্য, পাক-পবিত্র ও মহৎ হওয়া সত্ত্বেও পৃথীবির অনেক মানুষ আছে যারা এ মহান দীন ও মহা নবীকে অস্বীকার করে, তার ওপর মিথ্যারোপ করে। শুধু তাই নয়

3. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক ইহ ও পরকালে রাসূলের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী, অনেক বড় আলেমা সাহাবীয়া, ইন্তেকাল ৮৫ হিজরীতে।

4. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৫৩৪১।

অস্বীকার ও মিথ্যারোপের সীমা ছাড়িয়ে অনেকে নিন্দা, অপবাদ, গালাগালি, কটুক্তি এবং আরো নানাভাবে আঘাত করতেও ছাড়ে না। দীন ইসলামের এসব বিরুদ্ধাচরণ দেখে এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা-মানবের ব্যাপারে এ সকল ধৃষ্টতামূলক ব্যবহার দেখে হয়রান হয়ে যেতে হয়। বিবেক স্তব্ধ হয়ে যায়। এটা কীভাবে সম্ভব? এরা কি অন্ধ? এদের চক্ষু কি প্রকাশ্য দিবালোককে দেখতে পায় না? এদের বিবেকের দুয়ার কি তালাবদ্ধ? এরা কি সুস্পষ্ট সত্যকে অনুধাবন করতে পারে না?

ইসলাম বিরোধীদের শেকড় সন্ধানে

হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক! এসব মিথ্যাবাদী অস্বীকারকারীদের বাস্তবিক জীবনাবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবো। খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, গোটা দুনিয়ার ইসলামবিদ্বেষী মানুষগুলো দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক. হিংসুক। দুই. মূর্খ। হয়তো এদের কারো মধ্যে হিংসা ও মূর্খতা উভয়ই পাওয়া যাবে আর না হয় দুয়ের একটা অবশ্যই পাওয়া যাবে।

প্রথম শ্রেণি: হিংসুক

যারা হিংসুক তাদের দ্বারা ইসলামের বিরোধিতা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান কোনো কিছুই হিংসুকের হিংসাকে প্রশমিত করতে পারে না। হিংসুকরা দুনিয়ালোভী, স্বার্থবাদী হয়ে থাকে। এরা স্বভাবতই প্রতিপক্ষের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের কারণে মনের মধ্যে একধরণের ব্যাথা ও কষ্ট অনুভব করতে থাকে। এরা মানবতার এক বিকৃত শ্রেণি। কোনো দলিল-প্রমাণই এদের বিরোধিতার মাত্রাকে হ্রাস করতে পারে না। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ١٤﴾ [النمل: ١٤]

“আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ১৪]

এ হিংসুক শ্রেণিতে রয়েছে বড় বড় অপরাধী, ফিৎনা ও গুমরাহীর মূল হোতা এবং অভিশপ্ত ইবলিসের চেলা-চামুন্ডারা। এরা সব যুগেই ছিল। কোনো নবী, ওলী বা সিদ্দীক; কারো জীবনকালই এ শ্রেণি থেকে মুক্ত ছিল না। সব ক্ষেত্রেই এরা সত্য, সুন্দর ও শৃঙ্খলার শত্রু। সব সময়ই এরা অসত্য, অসুন্দর ও উশৃঙ্খলার বাহক। এদের আধ্যাত্মিক ও মূল চালিকাশক্তি ইবলিস হলেও এরা মানুষের মধ্য হতে এমন কিছু দূর্ভাগাকে নিজেদের নেতা বানিয়ে নেয় যাদের ভালো-মন্দের অনুভূতি শক্তির মৃত্যু ঘটেছে, যাদের স্বভাবে ধরেছে পঁচন, অন্তর হয়ে গেছে কালিমাযুক্ত এবং অন্তর্দৃষ্টি হয়ে গেছে অন্ধ। ফলে তারা নিজেদের ও অধিনস্থদের জন্য একমাত্র গোমরাহী এবং ভ্রষ্টতার পথ বেচে নেয়। সত্য ও কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী সকল কিছু থেকেই পূর্ণ বিমুখতা প্রদর্শন করে এবং সত্য ও কল্যাণের ধারক-বাহক ব্যক্তি বা আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে।

এ শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল ফির‘আউন, হামান ও কারূন। আবু জাহল, উবাই ইবন খালফ ও আবু লাহাব এ দলেরই অংশ। এ ক্যাটাগরীতেই ছিল কিসরা ও কাইসার। হুয়াই ইবন আখতাব এবং কা‘আব ইবন আশরাফও এদের বাইরে নয়।

এদের মধ্যে কেউ রাজা-বাদশাহর পোষাকে আত্মপ্রকাশ করে আবার কেউ ধরে সাধু-সন্ন্যাসিদের বেশ। কেউ তরবারী তুলে নেয় এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালায় আবার কেউ কলম হাতে নিয়ে ব্যাঙ্গ ও কটুক্তিতে লেগে যায়। এদের মধ্যে রয়েছে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, মুশরিক ও অগ্নিপূজক। রয়েছে নাস্তিক। রয়েছে মুসলিম নামধারী মুনাফিকরাও। যেমন আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূল-

এর ঘটনা কারো কাছেই অজানা নয়।

এরা বড় ভয়ংকর প্রজাতি। মুসলিমদের সব সময় এদের মুখোস উন্মোচন, এদের ষড়যন্ত্র ও নীল নকশার স্বরূপ উদঘাটনের এবং বিশ্ববাসীকে এদের অনিষ্ট ও অপকর্ম থেকে সতর্ককরণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। এত ভয়ংকর হওয়া সত্ত্বেও খুশির বিষয় হলো এরা সংখ্যায় অতি স্বল্প। সারা দুনিয়ার ইসলামবিরোধী জনগোষ্টির তুলনায় এরা সমুদ্রের মাঝে কয়েক ফোটা পানির ন্যায়। যেমন, সমগ্র মিসরবাসীর তুলনায় ফির'আউন, হামান ও কারূন কী? গোটা মক্কাবাসীর সামনে আবু জাহল, উবাই ইবন খালফ ও আবু লাহাব কয় জন? ফারস্য, ইরাক ও এতদুভয়ের আশ-পাশের গণমানুষের তুলনায় কিসরার অবস্থান কোথায়? শাম, এশিয়া মাইনর ও ইউরোপের খ্রিস্টানদের মধ্যে হিরাক্লিয়াসই বা কয় জন?

হিংসা ও খলতার ফাঁদে বন্দী এ শ্রেণির লোকেরা স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে, জেনে-বুঝে ইসলামের মাহাত্ম্য ও নবী চরিত্রের পবিত্রতার ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল হয়েই কেবল হিংসার বশবর্তী হয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতা করে এবং সত্যনিষ্ঠ মহামানবের চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। তবে ইসলামের নিন্দাবাদে লিপ্ত, বিরুদ্ধাচারী ও লোকদেরকে ইসলাম থেকে বাধা প্রদানকারী মোট জনগোষ্ঠির তুলনায় এ হিংসুক শ্রেণি হাতে গণা কয়েকজন মাত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণী: মূর্খ

প্রিয় পাঠক! তাহলে ইসলাম বিদ্বেষীদের অবশিষ্ট বৃহদাংশ কোন শ্রেণির? হ্যাঁ তারা এ প্রথম শ্রেণির হিংসুকদের অন্ধ অনুসারী মূর্খ শ্রেণির লোক। যারা অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপ-প্রচার ও তথ্য সন্ত্রাসের শিকার। যারা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক উৎস থেকে ধারণা লাভ করতে পারে নি। যাদের নিকট

ইসলামের বিকৃত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। যাদেরকে এ ধারণ দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম হলো নিছক কিছু অসংলগ্ন নব আবিস্কৃত বিষয়াবলি, কষ্টদায়ক অন্ধ অনুকরণ এবং কতিপয় বিকৃত চিন্তা-চেতনার নাম মাত্র। ফলে তারা ইবলিসদের পেছনে বকরীর পালের মতো ছুটে চলেছে এবং নিজেদের বাহনজন্তুকে তাদের পতনের পথে ছুটিয়ে দিয়েছে আর তারা ধারণা করছে যে, তারা ভালো কাজই করছে। এদের মধ্যে কেউ হয়ত একেবারেই মূর্খ; জ্ঞানের আলো যাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারে, আবার কেউ স্বল্প জ্ঞানী; বিস্তারিত ব্যাংখ্যা-বিশ্লেষণ যাদের সন্দেহ-সংশয় দূর করতে পারে কিংবা কেউ মোটামুটি জ্ঞানের অধিকারী; দলীল প্রমাণের বর্ধিত জ্ঞান যাদেরকে সত্যের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে। মোটকথা এ দ্বিতীয় শ্রেণির লোকদের শুধু জ্ঞান প্রদীপের অভাব। এরা জ্ঞান-দরিদ্র জনসাধারণ। এরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগ্রহী হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না এবং মন থেকে ইসলামের বিরোধিতাও করে না। এরা জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে এবং সংকল্পের সাথে ইসলামের বিরোধিতা ও নবী চরিত্রে কলঙ্ক লেপনে লিপ্ত হয় না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টালে আমরা কী দেখতে পাই? ফারস্যের জনসাধারণ কি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল? নাকি ইসলাম বিরোধী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শুধুমাত্র কিসরা তার সুবিধাভোগী উজির-উমারা এবং তার বশিভূত কিছু সৈনিকদের দ্বারা? ফারস্যের জনসাধারণ বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ এ বিশ্বাস লালন করে এসেছে যে, আগুন তাদের প্রভূ, বংশ পরম্পরায় কিসরা তাদের নেতা এবং মযদক[5] ও তার অনুসারীদের ধর্মই তাদের সঠিক ধর্ম। এভাবেই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। হঠাৎ তাদের

[5] মযদক, প্রখ্যাত ফারস্য দার্শনিক, আনুশারওয়া এর পিতা কবায কিসরা এর যুগে যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কবায কিসরা তার মাযহাবের অনুসরণ শুরু করে, ছেলে আনুশারওয়া তা জানতে পেরে তাকে হত্যা করে ফেলে।

মাঝে ইসলামের স্বচ্ছ-সুন্দর বাণী উপস্থাপিত হলো। তাদের চোখের পর্দা সরিয়ে ফেলা হলো। তাদের নেতা ও সর্দাররা তাদের কানে সত্য ও সুন্দরের প্রতিবন্ধক এবং ভ্রষ্টতার যে সরঞ্জামাদী স্থাপন করে রেখেছিল তা বিদূরিত করা হলো। ফলে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে তারা তাদের বিপদগামিতার স্বরূপ উদঘাটন করে ফেলল, ইসলামের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল এবং অতি নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত স্বভাব ও বিজ্ঞান সম্মত কথা-বার্তা, চাল-চলন অবলোকন করল। অতঃপর কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি ছাড়াই পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে ইসলামকে গ্রহণ করে নিল। আল্লাহর শপথ! কাউকে ইসলামে দীক্ষিত করতে আমাদের কোনো বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না এবং কারো চেতনা-বিশ্বাসে চাপ সৃষ্টির চেষ্টাও করি না। উপরন্তু আমরা জোর-জবরদস্তী ও চাপ সৃষ্টি না করতে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬]

ফারস্য জাতির সামনে ভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াত বা সৎপথ স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারা সত্যকে পেয়ে গেছে এবং স্পষ্টভাবে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বুঝে ফেলেছে। ফলে ফারস্যের বৃহৎ জনগোষ্ঠি তাদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তির পথ অবলম্বন করেছে। যে স্বভাবজাত প্রবৃত্তির বীজ আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতিটি বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন।

﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ﴾ [الروم: ٣٠]

“আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আর -রূম, আয়াত: ৩০]

অধিকাংশ ফারস্যবাসীই ইসলাম গ্রহণ করেছে। মিথ্যা, অস্বিকার ও বিরোধিতার ওপর অবিচল থাকে নি। তবে নেতৃস্থানীয় কাফিরদের কথা ভিন্ন; যারা জেনে-বুঝে হিংসা ও অংকারবশত স্বধর্ম ত্যাগ করে নি।

হুবহু একই ঘটনা ঘটেছিল শাম, মিসর, উত্তর আফ্রিকার জনগণ এবং স্পেন, এশিয়া মাইনর ও পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ব্যাপারেও। এমনকি পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং হিন্দুস্থান প্রভৃতির জনসাধারণের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

অস্ত্র ও তরবারীর জোরে নয়; বরং দলীল প্রমাণ ও আপন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইসলাম চিরবিজয়ী দীন। ইসলামের সঠিক দাওয়াত ও নবীচরিত্রের বাস্তবিক বিবরণ তুলে ধরতে পারলেই মানুষের হিদায়াতের জন্যে আর কিছুর প্রয়োজন নেই। দলে দলে লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গহণের জন্য শুধুমাত্র ইসলামের সুমহান আদর্শের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াই যথেষ্ট। এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿فَهَلۡ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ٣٥﴾ [النحل: ٣٥]

“আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া নয় কি?” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৫]

﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ٥٤﴾ [النور: ٥٤]

“আর রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৪]

﴿فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾ [المائدة: ٩٢]

“তার পর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্ট প্রচার।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৯২]

পবিত্র কুরআনে এ ধরণের অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যার সবগুলো উল্লেখ

করা দুরূহ ব্যাপার।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মুসলিমরা যদি তাদের ধর্মের পয়গাম ও যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সকলের কাছে পৌঁছে দিতে এবং নবীচরিত্রের সৌন্দর্যগুলো অন্যের নিকট তুলে ধরতে অক্ষম হয় তাহলে এর ফলাফল কী দাঁড়াবে? এ ব্যাপারে মুসলিমদের অক্ষমতা বিকৃত মতাদর্শের ধ্বজাধারীদের এবং ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর ধারক-বাহকদের জন্য এ পথ উন্মুক্ত করে দেয় যে, তারা নিজেদের মতো করে জনসাধারণের সামনে ইসলামের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করায় এবং এর ফাঁকে নিজেদের রচিত মতাদর্শের দাওয়াত গলাধকরণ করায়। আর মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজবদ্ধভাবে কারো নেতৃত্ব মেনে চলা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই ইসলামের ধারক-বাহকগণ যখন ইসলামের দাওয়াত, ইসলামী দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বদানে উদাসিনতা এবং অক্ষমতা প্রদর্শন করে তখন এর ফলাফল কী দাঁড়ায়? আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন:

«إِنّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ العِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা মানুষের অন্তর থেকে ইলম কেড়ে নেবেন না। তবে তিনি ‘আলেম শ্রেণিকে কবয করে ইলম তুলে নেবেন। যখন কোনো আলেম থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদের নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে ফাতওয়া চাওয়া হবে এবং তারা না জেনে ফাতওয়া দিবে। এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং লোকদেরও পথভ্রষ্ট করবে।”[6]

6. সহীহ বুখারী (كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم) হাদীস নং ১০০। সহীহ মুসলিম (كتاب العلم: باب رفع العلم و قبضه) হাদীস নং ২৬৭৩।

পৃথিবীতে মুসলিমদের ভূমিকা ও দায়িত্বের ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রখ্যাত সাহাবী রব 'ঈ ইবন 'আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু[7] এর একটি চমৎকার প্রজ্ঞাময় উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন,

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

"আল্লাহ আমাদেরকে (মুসলিমদেরকে) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহর গোলামীর দিকে, সংকীর্ণতা থেকে প্রসস্ততার দিকে এবং অন্যান্য মতাদর্শগুলোর অবিচার থেকে মুক্ত করে ইসলামের সাম্য ও সম্প্রীতির দিকে বের করে আনার লক্ষ্যে।"[8]

এ দায়িত্ব ও ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মহান। মুসলিমদের সর্বদা এ দায়িত্বের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরী। কারণ যারা আমাদের বিরোধিতা করছে তাদের অধিকাংশ আমাদের পরিচয় পায় নি। আমাদেরকে যারা ঘৃণার চোখে দেখছে, তাদের অনেকেই আমাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বে-খবর। আমাদের উচিৎ আমাদের দীন ও নবীচরিত্রের পূর্ণতা ও মাহাত্মের ক্ষেত্রগুলোকে খুলে খুলে বিশ্লেষণ করা। প্রয়োজন আমাদের কথা আমাদেরই মুখে বলা। আমাদের আখলাক-চরিত্রের বিষয়গুলো আমাদেরই কলমে লেখা। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাস আমাদেরই ভাষায় রচিত হওয়া। আমি ইংরেজি ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে লেখা বই খোঁজার জন্য ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় লাইব্রেরীগুলোতে প্রবেশ করেছি, সেখানে আমি ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লেখা

7. ফারস্য অভিযানে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত এক সাহাবী। সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস যাকে রুস্তমের নিকট দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন। খুরাসান বিজয়ের পর আহনাফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে তাখারিস্তানের গভর্ণর বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

8. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৭ম খণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠা।

হাজারো বই দেখতে পেলাম; কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয় যে, সেগুলোর অধিকাংশই রচিত হয়েছে অমুসলিমদের হাতে। ফল যা হবার তাই হয়েছে, খুব কম লেখকই ইসলামের সঠিক রূপরেখা তুলে ধরেছেন এবং সততার পরিচয় দিয়েছেন। অবশিষ্ট অনেকেই নিজেদের রুচি মতো বিকৃতি সাধন, মিথ্যারোপ, অপব্যাখ্যা ও অবিচার করতে ছাড়েন নি।

মুসলিমগণ কোথায়?

আল্লাহর সৃষ্ট সমগ্র মানবকুলের সামনে ইসলাম ও নবীচরিত্রের সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য ও পরিপূর্ণতা তুলে ধরে দাওয়াতের লক্ষ্যে লেখা-লেখি করা কি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত নয়? ইসলাম বিদ্বেষীদের মনে তাদের মূর্খতাহেতু সৃষ্ট সকল সন্দেহ-সংশয় রোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা কি আমাদের কর্তব্যের আওতায় পড়ে না? যারা অজ্ঞতার নিম্নসীমায় বাসকারী, অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী এবং ইসলামের বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও নবীচরিত্রের সৌন্দর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর -এ সকল মানবগোষ্ঠির দ্বারে দ্বারে ধর্ম-জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে ছুটে যাওয়ার কি প্রয়োজন নেই? আল্লাহর দীনকে তাঁর স্বকীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে ইসলামের সব সৌন্দর্য পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠির সামনে তাদের নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপিত হওয়ার কি কোনো প্রয়োজন নেই? আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ﴾ [ابراهيم: ٤]

“আর আমরা প্রত্যেক রাসূলকে তার কাওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তাদের কাছে বর্ণনা দেন।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ০৪]

ব্যাপক হারে মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে পূর্ণ উদাসীন হয়ে শুধুমাত্র খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা নিয়ে মগ্ন থাকতে দেখে কি আমাদের অন্তরে কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না? ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম বিদ্বেষীদের নিকট থেকে

ইসলামের বিকৃত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাখ্যা পাওয়ার কারণে লক্ষ-কোটি মানুষ যে আজ ইসলাম বিমুখ, সে জন্য কি আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে না?

দায়িত্ব অনেক মহৎ, অবহেলার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। গোটা পৃথিবী আমাদের দীনের পূর্ণাঙ্গতার পানে তাকিয়ে রয়েছে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নেতৃত্বের অভাব অনুভব করছে। পৃথিবীবাসীর সামনে এর সঠিক রূপরেখা তুলে ধরার কাজ এতো সহজ নয়। শত্রুরা ওঁত পেতে আছে। শয়তানও বসে নেই। চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তবে আমাদের সামনে রয়েছে আল্লাহর ঘোষণা, তিনিই আমাদের অন্তরকে মজবুত করবেন এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١]

"আল্লাহ নিজ কর্ম সম্পাদনে প্রবল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২১]

এ গ্রন্থে আমরা আমাদের ধর্মের শাশ্বত বিধানাবলী এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান জীবনচরিতের মধ্য হতে একটি বিষয়ে আলোচনা করব। এতে আমরা অমুসলিমদের সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করার প্রয়াস চালাবো। এটি বিশ্ব মানবতার জন্য স্বচ্ছ-সুন্দর অনুপম এক উপাখ্যান। কোনো দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা বুদ্ধিজীবি স্বপ্নে কিংবা কল্পনাতেও ভাবতে পারে নি যে, রক্তে মাংসে গড়া মানুষের দ্বারা এমন চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা সম্ভব হতে পারে। এমনকি প্লেটো[9] তার أفلاطون جمهورية""

9. প্লেটো (খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৩৪৭-৪২৭) প্রাচীন দার্শনিক, পশ্চিমা সভ্যতার প্রাণ পুরুষ, পশ্চিমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস। أفلاطون (প্লেটো) তার উপনাম, যার অর্থ হচ্ছে প্রশস্ত দুই

(The Plato's Repablican) গ্রন্থে, ফারাবী[10] তার "المدينة الفاضلة" (Ideal Devlet) গ্রন্থে এবং টমাস মোর[11] তার "المدينة الفاضلة الثانية" (Utopia) গ্রন্থের মধ্যেও নবীচরিত্রে যেসব অনুপম ঘটনাবলী বাস্তবায়িত হয়েছিল তার এক দশমাংশের ধারণাও দিতে পারে নি।

এখানে আমি এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, এ গ্রন্থে শুধু ঐসব অমুসলিমদের সাথে রাসূলের আচরণ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, যারা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত যিম্মী অমুসলিম বা যুদ্ধরত নয় এমন স্বাভাবিক অবস্থানে থাকা অমুসলিম। আর যারা দারুল-হারবে ইসলামের বিরুদ্ধে সদা-তৎপর কট্টরপন্থী অমুসলিম, পবিত্র কুরআনে যাদেরকে আমাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সে সকল শত্রু কিংবা কয়েদী অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্যে এ গ্রন্থ নয়।[12] আল্লাহ চাহে তো সে বিষয়ে

বাহুবিশিষ্ট। তার মূল নাম (أرستو كليس) এরোস্টো ক্লেস। جمهورية أفلاطون বা The Plato's Repablican তার অমর গ্রন্থ।

10. আবু নাসর মুহাম্মদ আল ফারাবী, (২৬০-৩৩৯ হি.) দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের গুরু। فاراب এর সাথে সম্পৃক্ত করে فارابي বলা হয়। ফারাব হচ্ছে বর্তমান তুরস্কের একটি শহর। المدينة الفاضلة বা (Ideal Devlet) তার অমর গ্রন্থ।

11. ইংরেজি রাজনীতিক ও দার্শনিক اليوتوبيا বা (Utopia) নামক গ্রন্থ লিখে সাড়া জাগিয়েছেন, জন্ম: ১৪৭৮, মৃত্যু: ১৫৩৫ ইং।

12. যুদ্ধকালীন সময়ে বা শত্রু কাফিরদের সাথে সদাচরণ কিংবা বন্ধুত্বস্থাপন যুদ্ধে নতজানু নীতি অবলম্বন, ক্ষতিকর শর্তে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া, পরাজয় বরণ বা ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার আশংকা সৃষ্টি **এমন কাজ** আর স্বাভাবিক অবস্থায় বা চুক্তিবদ্ধ যিম্মি অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ, তাদের মন গলানো, ইসলামের মাহাত্ম্যে অভিভূত হওয়া, ইসলামের প্রতি ধাবিত হওয়া ও আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার পথ উন্মুক্ত করা, দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট। একটি যুদ্ধক্ষেত্র আরেকটি দাওয়াতের প্রেক্ষাপট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধকালীন সময়ের বা শত্রু কাফিরদের সাথে আচরণ ছিল এক ধরণের আবার স্বাভাবিক অবস্থায় বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সাথে আচরণের ধরণ

ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা রয়েছে।

হায়! মুসলিমদের নিকট কী 'অমূল্য রত্ন' রয়েছে তা যদি তারা হৃদয়ঙ্গম করতো, অধ্যয়ন করতো, জীবনে বাস্তবায়ন করতো এবং বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌছে দিতো তাহলে তারা নিজেরাও সৌভাগ্যশীল হত, তাদের দ্বারা মানবতাও সৌভাগ্যের ছোঁয়া পেতো এবং তারা রবের প্রতি মানুষের পথ-প্রাপ্তিরও মাধ্যম হতো।

ছিল অন্যরকম। উভয়ের মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে। -(অনুবাদক)

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ

সর্বপ্রথম আমাদের এটা জানা উচিৎ যে, একজন মানুষ হিসেবে তার প্রতি সাধারণ বিবেচনায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কী? তাহলে আমরা জানতে পারব অমুসলিমদের বিষয়গুলোকে ইসলাম কীভাবে গ্রহণ করে এবং তাদের সাথে ইসলামের আচরণবিধি কী?

নিশ্চই একজন মানুষ সাধারণ মানবিক বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত এবং সাধারণভাবে এ সম্মানের বিষয়টি সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। জাতি, ধর্ম ও বর্ণে নির্বিশেষে এতে কোনো তারতম্য নেই। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে ঘোষণা করেন:

﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا ٧٠﴾ [الاسراء: ٧٠]

"আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছি।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭০]

আদম সন্তানের এ সম্মানের বিষয়টি ব্যাপক তথা সকল মানুষই এতে অর্ন্তভুক্ত। আল্লাহ নিজেই আপন অনুগ্রহের ছায়া মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্যই বিস্তৃত করেন। কাজেই সকল মানুষকেই তিনি জলে-স্থলে বাহন ও রিযিক দান করেন, সকল মানুষকেই আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সব কিছুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গিটি সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। ইসলামী শরী 'আতে সকল ক্ষেত্রেই মানবকুলের প্রতি এ সম্মান রয়েছে। শুধু তাই নয়,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কথা এবং কাজেই এ দৃষ্টিভঙ্গিটির প্রতিফলন ঘটেছে। এটা আমাদের জন্য এক মহান ও অনন্য পন্থা ও পদ্ধতির সন্ধান দেয়, যে পন্থা ও পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বিরুদ্ধাচারণকারী ও অস্বীকারকারীদের সাথে আচরণ করেছেন।

সকলের সাথেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ছিল সম্মানসূচক। কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে অপদস্থ করা বা কারো প্রতি যুলুম করা কিংবা স্বীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং তার মর্যাদাহানী করা বৈধ নয়। এ বিষয়টি কুরআনে কারীমের অনেক আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত থেকে স্পষ্টত ফুটে উঠে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ﴾ [الانعام: ١٥١]

“আর বৈধ কারণ ছাড়া সে প্রাণকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫১]

পবিত্র কুরআনের এ আদেশটি ব্যাপক অর্থবোধক। কাজেই মুসলিম এবং অমুসলিম সকল মানব প্রাণই এখানে উদ্দেশ্য। অতএব ইসলামের আদল তথা ইনসাফ ও ন্যায়ের বাস্তবায়নও সাধারণভাবে সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ধর্ম ও বর্ণ বিবেচনায় এখানে তারতম্য করা যাবে না।

ইমাম কুরতবী রহ. বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ কর্তৃক হারাম হওয়া প্রাণকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। চাই সেটি মু’মিনের প্রাণ হোক বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের। তবে যদি কারো দ্বারা এমন কোনো কাজ সংগঠিত হয়, যার দরুন তাকে হত্যা করা ওয়াজিব সেটা ভিন্ন ব্যাপার।[13] অতঃপর তিনি

[13] কুরতুবী (الجامع لأحكام القرآن) ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩২ (মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল

একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেমন,

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً فِي غَيْرِ كُنْهِه، حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجَنّةَ».

“যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধকে অন্যায়ভাবে কোনো কারণ ছাড়া হত্যা করেছে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।”[14]

ইসলামী শরী‘আতে সকল শ্রেণির মানুষের প্রতি সর্বপ্রকার যুলুম নিষিদ্ধ। আর এ নিষিদ্ধকরণ অগণিত আয়াতে কারীমাহ ও হাদীসে নববী দ্বারা প্রমাণিত এবং এ বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামত দিবসে বান্দার হিসাব-নিকাশের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡ‍ٔٗا﴾ [الانبياء: ٤٧]

“আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মীযানসমূহ স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৪৭]

এখানেও ন্যাবিচারের এ বিধানটি সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোনো শর্তযুক্ত হয় নি। কাজেই সেদিন কোনো মানবাত্মার প্রতিই যুলুম করা হবে না। চাই সেই মানবাত্মা আল্লাহতে বিশ্বাসী হোক বা কাফির হোক, মুসলিম বা নাসরানী, ইয়াহূদী কিংবা আরো যত একঘেয়ে বা ভিন্ন চিন্তাধারী হোক না কেন কারো প্রতিই যুলুম করা হবে না। নিশ্চই যুলুম খুবই জঘন্য কাজ,

আনসারী আল খাযরাজী আল মালেকী আল কুরতুবী, বিখ্যাত মুফাসসীর, (الجامع لأحكام القرآن) নামক গ্রন্থের প্রণেতা। মৃত্যু: ৬৭১ হিজরী। অধিকতর জানতে দেখুন- (الأعلام الزركلي ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২২।

[14] আবু দাঊদ, হাদীস নং ২৭৬০। নাসায়ী, হাদীস নং ৪৭৪৭। মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২০৩৯৩। দারেমী, হাদীস নং ২৫০৪।

আল্লাহ তা'আলা নিজ ও নিজ বান্দাদের জন্য যুলুম চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«يَا عِبَادِيْ، إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ، وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلَا تَظَالَمُوْا».

"হে আমার বান্দারা আমার নিজের জন্য যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা চিরতরে হারাম করেছি, কাজেই তোমরা পরস্পর একে অন্যের উপর যুলুম করো না"[15]

এটাই হচ্ছে মানুষের ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। এটা আত্ম-উপলব্ধি, সম্মান এবং মর্যাদাকর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাপারে কতই না হৃদয়গ্রাহী ও মহৎতর পন্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যখন তার পাশ দিয়ে একজন ইয়াহূদীর শবদেহ অতিক্রম করছিল। ইমাম মুসলিম রহ. ইবন আবী লাইলার সূত্রে বর্ণনা করেন,

«أَنّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كانا بِالقادِسِيّةِ. فَمَرّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ. فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا: إِنّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ. فَقَالا: إِنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ. فَقِيلَ: إِنّهُ يَهُودِيّ. فَقَالَ "أَلَيْسَتْ نَفْساً».

"কায়স ইবন সা'দ ও সাহল ইবন হুনায়িফ দু'জনই কাদেসিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। এতে তারা দু'জনই দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদেরকে বলা হলো যে, এ জানাযাটি একজন কাদেসিয়াবাসীর। তাঁরা দু'জনই বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

15. সহীহ মুসলিম (كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم); মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২১৪৮৫; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯০ (في الأدب المفرد); ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৬১৯; বায়হাকী, হাদীস নং ৭০৮৮ (في شعب الإيمان); সুনান কুবরা হাদীস নং ১১২৮৩।

ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছিল জানাযাটি ইয়াহূদীর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সে কি মানুষ নয়?"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত এ পন্থা বা অবস্থানটি কি শ্রেষ্ঠতম নয়?

এটাই হচ্ছে শুধুমাত্র একজন মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।

নিশ্চয়ই রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত অবস্থান বা আচরণের দ্বারা সকল শ্রেণির মানষের জন্য মুসলিমদের হৃদযন্ত্রে আত্ম-উপলব্ধি এবং সম্মানের বীজ বপন করেছেন এবং এরূপ সম্মানসূচক আচরণ তিনি সাধারণভাবেই করেছেন, তার (ঐ ইয়াহূদীর) আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্যে নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেছেন এবং অন্যদের এরূপ করার আদেশ দিয়েছেন -একথা জানার পরও যে, ঐ লোকটি একজন ইয়াহূদী ছিল।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, ঐ সমস্ত ইয়াহূদী যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ছিল -তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য রাসূল হওয়ার আয়াতসমূহ (নিদর্শানাবলী) দেখেছে এবং অখণ্ডনীয় দলীলাবলী ও উজ্জলতর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি শুনেছে। তার পরও তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইস সালাম-এর ওপর ঈমান আনে নি; বরং তারা নানানভাবে আক্রমণ করে তাঁকে হেনস্থা করেছে। ইয়াহূদীদের এতসব আপসহীনতা ও একগুয়েমির পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরই একজন অখ্যাত ব্যক্তির শবহেদের সম্মানে দাড়াঁলেন অথচ সে কোনো প্রসিদ্ধ লোক ছিল না, যদি হতো তাহলে তার ব্যপারে

হাদীসের বাণীতে নাম ব্যতিরেকে শুধু "একজন ইয়াহূদী" বলা হতো না। সে কখনই মুসলিমদের পরিচিত ছিল না। এসব কিছুই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট বৈ কিছুই নয়। ঐ ইয়াহূদীর অপ্রসিদ্ধ হওয়ার এটাও একটা প্রমাণ যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম তাকে চিহ্নিত করেছে তার ইয়াহুদিত্বের বৈশিষ্ট্য দিয়ে, তার নাম দিয়ে নয়। অতঃপর তাঁর দাঁড়ানোকে "সে কি একজন মানুষ নয়" কথা দ্বারা প্রত্যয়ন করেছেন, বৈধতা দিয়েছেন ও দৃঢ় করেছেন; কিন্তু তিনি ঐ ইয়াহূদীর কোনো বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করেন নি।

এটাই হচ্ছে দীন ইসলামে একজন মানুষ হিসেবে মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন। (এবং এটাই হচ্ছে ইসলামী শরী'আতে মানব মূল্যায়নের মূল দৃষ্টিভঙ্গি।)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এ সম্মান সূচক দাঁড়ানো সামান্যতম সময়ের জন্য ছিল না; বরং শবদেহটি অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছিল।

জাবের ইবন আব্দুল্লাহ সূত্রে ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন,

«قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ».

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ এক ইয়াহূদীর শবদেহের সম্মানে শবদেহটি অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলেন।"[16]

আমার ধারণা মতে ইয়াহূদীর জানাযা অতিক্রম করা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের শবদেহ দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার মহৎ ও উদার মনোভাবটি সকল সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী মুসলিমদের হৃদয়ে এ সুদৃঢ় চেতনা জাগ্রত করেছে যে, ইসলাম

16. সহীহ মুসলিম (كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة) হাদীস নং ৯৬০; নাসায়ী হাদীস নং ১৯২৮; আহমদ হাদীস নং ১৯২৮, সুনানে বায়হাকী, হাদীস নং ৬৬৭০।

একজন মানুষকে শুধু মানুষ হওয়া হিসেবে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় এবং সম্মানের চোখে দেখে। পরবর্তীতে কায়েস ইবন সা'দ[17] এবং সাহল ইবন হুনাইফ[18] রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক একজন (মজুসী) অগ্নিপূজকের শবদেহের সম্মানে দাঁড়ানোর মাধ্যমে ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত এ সম্মানের বিষয়টিই বাস্তবায়িত হয়েছে।

আর মাজুসী হলো যারা কোনো মৌলিক বা আসমানী কিতাবধারী নয় তারা দীন ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বিশ্বাসে বিশ্বাসী; বরং তারা ইসলাম বিরোধী যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়। এতদসত্ত্বেও সাহাবীগণ ইসলামের মানব মূল্যায়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা তাঁরা ইয়াহূদীর শবদেহকে সম্মান দেখিয়েছেন এবং তার সম্মানে দাড়িয়েছেন। এটাই হচ্ছে অমুসলিমদের ক্ষেত্রে আমাদের মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি। আর এটাই হচ্ছে সেই মহৎ মূলনীতি যা মুসলিমগণ অমুসলিমদের সাথে আচরণের ব্যাপারে

---

17. কায়েস ইবন সা'দ ইবন উবাদাহ, আরবের বিচক্ষণতম ব্যক্তিদের একজন। সমর কৌশলে পারদর্শী, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেই পতাকাবাহী করেছিলেন। তিনি ৫৯ মতান্তরে ৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। অধিকতর জানতে দেখুন: ابن الأثير: أسد الغابة ٤|262 رقم، الترجمة الإصابة : و ابن حجر ، (7176 الا :وابن عبد البر ،) - ستيعاب– 3\350.

18. সাহাল ইবন হুনাইফ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সর্বক্ষণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকতেন এবং ওহুদের যুদ্ধেও সুদৃঢ় ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মদীনা ছেড়ে বসরায় যাওয়ার সময় তাঁকে মদীনায় প্রতিনিধি হিসেবে রেখে গেলেন। তিনি উষ্ট্রীর যুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশেষ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁকে ফারস্যের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি ৮৮ হিজরীতে কুফায় মৃত্যুবরণ করেন। অধিকতর জানতে দেখুন:
ابن الأثير: أسد الغابة -2 |335 ، و ابن حجر : الإصابة، الترجمة رقم (5323) ، وابن عبد البر: الاستيعاب– 2\223.

নিজেদের মধ্যে পোষণ করে।

অতঃপর বিশ্বাসের জগতে যারা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোদ্ধাচরণ করে ও ভিন্ন নীতি অবলম্বন করে তাদের ব্যাপারে ইসলামের আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এ যে, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মতের ভিন্নতা থাকতেই পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক, সম্ভাব্য বরং অনির্বায বিষয়। কেননা কখনোই এমন কোনো যামানা পাওয়া যায় নি যখন কোনো একটি ইস্যুতে সকল ‘আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করতেন। অতএব উলুহিয়্যাত (প্রভুত্ব) ও তাওহীদ (একত্ববাদ) এর মতো ইস্যুতে সমগ্র মানব জাতির ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হবে এটা কি করে সম্ভব? আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ ١١٨﴾ [هود: ١١٨]

“যদি তোমার রব চাইতেন তবে সকল মানুষকে এক উম্মতে পরিণত করতেন। কিন্তু তারা পরস্পর মতোবিরোধকারী রয়ে গেছে।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১১৮]

কাজেই মুসলিমগণ এ কথা খুব সহজেই মেনে নেন যে, আকীদাহগত দিক থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী থাকতেই পারে এবং তারা একথাও জানে যে, এদের দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করাও একদম অসম্ভব। এজন্যেই মুসলিমগণ বিরুদ্ধবাদীদের সাথে স্বাভাবিকভাবেই সহাবস্থান মেনে নেয় এবং এ জন্যেই ইসলামী শরী‘আত অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সর্বোত্তম, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুস্পষ্ট আচরণ পরিকাঠামো প্রদর্শন করে।

অতএব, এ পটভূমিগুলোতে লক্ষ্য করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম সম্প্রদায় এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের দিবসে হিসাবের ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই হাতে। কোনো ব্যক্তি যদি ঈমান বা কুফুরকে গ্রহণ করতে চায় সেটা তার ওপরই বর্তাবে এবং প্রতিদান দিবসে

স্বীয় রবের নিকট তারই হিসাব দিতে হবে। মুসলিমদের চিন্তার জগতে যদি আপনি পরিভ্রমন করেন তাহলে এমন একজন মুসলিম দা'ঈ তথা দীনের পথে আহ্বানকারী ব্যক্তিও পাবেন না, যিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের ইসলামের ছায়াতলে আসা বা তাদের দীন পরিবর্তন করার ব্যাপারে বল প্রয়োগের মানসিকতা পোষণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٩٩﴾ [يونس: ٩٩]

"আর যদি তোমার রব চাইতেন, তবে জমিনের সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি বাধ্য করবে, যাতে তারা মু'মিন হয়?" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯]

মুসলিমদের মধ্যে লক্ষ্য করার মতো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, তাঁরা খুব সহজেই অমুসলিমদের কাছে নিজেদের সুস্পষ্টতম দীনের দাওয়াত নিয়ে পৌঁছে যেতে পারে। আর এমতাবস্থায় যদি অমুসলিমদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দীনি দাওয়াতকে বাধাগ্রস্তও করে তবুও কোনো দা'ঈ কর্তৃক তারা জিজ্ঞাসিত হবে না বা কেউ তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن جَٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٦٨ ٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٦٩﴾ [الحج: ٦٨، ٦٩]

"আর তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতণ্ডা করে, তাহলে বল, 'তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করে দেবেন।" [সূরা আল-হজ: ৬৮-৬৯]

এ লজিক তথা যৌক্তিকতা এবং ইসলামী শরী'আতে সকল মানবপ্রাণকে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন বাস্তবতার কারণে এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সকল আদম সন্তানকে সৃষ্টির সেরা ঘোষনার কারণে ইসলামী শরী'আতে মানব

শ্রেষ্ঠত্য এবং মহত্ব বজায়ে অনেক শর‘ঈ বিধান বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত আদল (ন্যায়পরায়নতা), রহমত (অনুগ্রহ), উলফত (অনুরাগ), তা‘আরুফ (পরিচিতি বা সামাজিক শিষ্টাচার) ইত্যাদি। এছাড়াও অনন্য ও উত্তম চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ সকল বিধি-বিধানগুলো সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই পরিবেষ্টন করে। কাজেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথেই চারিত্রিক মাহাত্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

আর ইয়াহূদী সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতকে বিকৃত করে উত্তম আচরণকে শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ এবং অন্যদের ক্ষেত্রে সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্মযজ্ঞকে বৈধতা দানের মতো গর্হিত কাজ উম্মতে মুসলিমাতে কখনও সম্ভবপর হবে না।

আমাদের ইসলামী শরী‘আতে রহমত তথা দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টান্তে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾ [الانبياء: ١٠٧]

“আর আমরা তো তোমাকে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭]

এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের রহমতস্বরূপ প্রেরিত হওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং ধর্মীয় মতপার্থক্য ও ক্ষেত্র বিশেষ উগ্রতা থাকা সত্যেও সকল মানবগোষ্টিই এ রহমতের অন্তর্ভুক্ত।

আর তা‘আরুফ (পরস্পর পরিচিতি বা সামাজিক শিষ্টাচার) ¬এর দৃষ্টান্তে আল্লাহ তা‘আলা বলেন

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ﴾ [الحجرات: ١٣]

“হে মানুষ, আমরা তোমাদেরকে এক নারীও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

অত্র আয়াতের আঙ্গিকে এ কথাই প্রতিয়মান হয় যে, তা‘আরূফ তথা পরস্পরে সামাজিক শিষ্টাচার সুন্দর করার বিষয়টিও নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না; বরং চেষ্টা করতে হবে যাতে সকল জাতি ও গোষ্টিকে যেন পারস্পরিক পরিচিতি ও সু-সম্পর্ক স্থাপনের আওতায় আনা যায়। আল্লাহ তা‘আলা নিজেই তো স্বীয় অনুগ্রহে জমিনে অবস্থানরত সকল মানুষের রিযিকের নিশ্চয়তা দিয়েছেন ও জমিনের সকল কিছুকে নিজেদের প্রয়োজনে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন এবং এতে তিনি মুমিন ও কাফির হওয়ায় কোনো তারতম্য রাখেন নি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡفُلۡكَ تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِأَمۡرِهِۦ وَيُمۡسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ٦٥﴾ [الحج: ٦٥]

“তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, জমিনে যা কিছু আছে এবং নৌযানগুলো, যা তাঁরই নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণ করে সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। আর তিনিই আসমানকে আটকে রেখেছেন, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তা জমিনের উপর পড়ে না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই করুণাময়, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৬৫]

উক্ত আয়াতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং জলরাশিকে অনুগত করে দেওয়ার বিষয়টি সকল মানুষের জন্যই অবধারিত। আর এ আয়াতের চূড়ান্ত মন্তব্যে

এ কথাই স্পষ্ট হয় যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই সাধারণভাবে সহানুভূতি ও অনুগ্রহ প্রযোজ্য। তাওরাতকে বিকৃতকারী ইয়াহূদীদের মতো স্ব-সম্প্রদায়ের সাথে উত্তম আচরণ আর ভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কাজের বৈধতা ইসলাম দেয় না।

আর ক্ষমার দৃষ্টান্তে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣، ١٣٤]

"আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৪]

ক্ষমা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য আর উক্ত আয়াতে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে সেটা শুধু মু'মিনদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং এখানে ক্ষমা শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে যা মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য প্রযোজ্য।

আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ন্যায়পরায়নতার বিধান বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি এটাকে শুধু মু'মিনদের জন্য বা মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্যই নির্ধারণ বা সীমাবদ্ধ করেন নি; বরং তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন এ কথার যে, নগণ্যতম ব্যক্তির জন্যও ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨]

“কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ০৮]

অনুগ্রহ, অনুরাগ, ইনসাফ এবং সহনশীলতার এটাই হচ্ছে সেই প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান চরিত্র মাধুর্য আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামী শরী‘আতের উল্লিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করেছেন।

ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কথা হচ্ছে এ যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহিমান্বিত চরিত্র মাধুর্য এমন এক সময়ে করে দেখিয়েছেন, যে সময়ের সভ্যতম রাজন্যবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের থেকেও এটা দুষ্প্রাপ্য ছিল।

আর এ বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট ধারণা পেতে চাইলে পাঠকবৃন্দের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তারা সেই বিকৃত তাওরাত গ্রন্থ যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও ছিল এখনও রয়েছে -তার কিছু বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করবেন। তাহলে পাঠক সুস্পষ্টতই শরী‘আতে ইসলামিয়াহ এবং মানব উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন মতবাদ, যা মূল তাওরাত গ্রন্থে অনুপ্রবেশ করা হয়েছে -তার মধ্যে বিস্তর ফারাক উপলব্ধি করতে পারবেন।

যথা (سفر يشوع)[19] জিহুশো নামক গ্রন্থের কিছু অংশ তুলে ধরছি তাতেই

19. উল্লেখ্য যে, سفر يشوع (জিহুশোর বই) এটি মূলত ইবরানী ভাষায় রচিত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক ধর্মাযোদ্ধার দিকে সম্পর্কিত গ্রন্থ। যার নাম ছিল يشوع بن نون মূসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর তিনি তার ৮৪ বছর বয়সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং ১১০ বছর পযর্ন্ত জীবিত ছিলেন। এ পুরো সময়টুকুই সে বিকৃত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় সম্প্রসারণ যুদ্ধে ও সেই লক্ষ্যে

ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের অন্যদের সাথে আচরণ পদ্ধতি কিরূপ ছিল তার একটি রূপরেখা প্রকাশ পাবে:

“জিহুশোয় এবং ইসরাঈলি সৈন্যরা নাখীশ থেকে উজলুনের দিকে রওয়ানা করে উজলুন নগরীটি অবরোধ করল। তার অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এ দিনই তাদের ওপর জিহুশোয় বাহিনী কর্তৃত্ব গ্রহণ করল এবং নগরবাসীকে ধ্বংসাত্মকভাবে দমন করল। প্রত্যেকে তরবারী দিয়ে দফারফার ফায়সালা গ্রহণ করল। যেমনটা করেছিল পূর্বে লাখীশ নগরীতে। অতঃপর জিহুশোয় তার বাহিনী নিয়ে উজলুন থেকে হিবরুনের দিকে ফিরল এবং সেখানে তার অধিবাসীদের ওপর আক্রমন করে তাদের ওপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করল। হিবরুন ও তার আশেপাশের জনপদ ধ্বংস করার পাশাপাশি হিবরুনের শাসকসহ সকল জনগোষ্টিকে হত্যা করল। এমনকি উজলুনের মতো এখানেও অশ্বগুলোও তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় নি। অতঃপর জিহুশোয় দাবীর নগরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাদের ওপর আক্রমন করে কর্তৃত্ব গ্রহণ করে নিল এবং আশপাশের জনবসতিসহ পুরো এলাকা ধ্বংস করল ও তাদের শাসকসহ সকলকে হত্যা করল। এখানেও অশ্বসমূহও পরিত্রাণ পায় নি। মোটকথা: দাবীর নগরী ও তার শাসকের ওপর সে আচরণই করা হলো যেমনটি করেছিল লুবনা নগরী ও তার শাসকের সাথে।[20]

ইয়াহূদী-খ্রিস্টান কর্তৃক এ ধরণের ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপের উপমা যুগে যুগে অসংখ্য রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে সেগুলোর পরিসংখ্যান টানা সম্ভব নয়। তবু সামান্যতম উপমা পেশ করলাম যাতে ইসলামী শরী‘আতের আযমত

অতিবাহিত করেছেন। এটি ইসরাঈলীদের নিকট একটি পবিত্রতম গ্রন্থ। উইকিপিডিয়া আরবি ভার্সন। (গুগল অনুসন্ধান)

20. سفر يشوع কোনো সংস্করণে سفر يوشع লিখা হয়েছে: ১০ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৯।

(মাহাত্ম্য), অনুগ্রহ, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সহনশীলতার বিষয়টি পাঠকবৃন্দের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কেননা আমরা জানি এ শরী'আত এমন এক সময় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে যখন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এ ধরণের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং লজ্জাষ্কর পদক্ষেপের ঘনঘটা পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

অপরাপর ধর্মাবলী থেকে ইসলামের উদার নীতির তুলনামূলক পার্থক্য ও স্বাতন্ত্রিকতার অর্থ এ নয় যে, ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে নিজের প্রতি আহ্বান করতে আগ্রহী নয়; বরং মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম শত্রু যারা তাদের শত চক্রান্ত ও অপকর্মের পরও তিনি এটাই প্রার্থনা করতেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিত! যার বিশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে আবু জাহল এবং উমার ইবনুল খাত্তাব-এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আ। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের ঘোর শত্রু। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য দো'আ করলেন,

«اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب».

"হে আল্লাহ, উমার এবং আবু জাহল এ দু'জনের মধ্যে আপনার নিকট অধিকতর পছন্দনীয় ব্যক্তি দ্বারা আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন। অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন, যদিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমারই অধিকতর পছন্দনীয় ছিল।"[21]

বাস্তবতা হচ্ছে এ যে, অমুসলিমদের দীর্ঘকাল ধরে আল্লাহর রাস্তা থেকে

---

21. তিরমিযী (كتاب المناقب:باب في مناقب عمر بن الخطاب) হাদীস নং ৩৮৬৩; আহমদ, হাদীস নং ৫৬৯৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৪৪৮৫; মিশকাত, হাদীস নং ৬০৩৬।

বিমুখ হয়ে থাকা এবং দীন ইসলাম নিয়ে তাদের নানা বিভ্রান্তির পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে কখনো প্রতিশোধের স্পৃহা জাগ্রত হয় নি এবং কখনও তিনি তাদের সাথে কোনো প্রকার অপব্যবহার বা কূটচালের বাসনাও পোষণ করেন নি। মূলতঃ তিনি সম্পূর্ণ এর বিপরীতমুখী চিন্তায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এদের মনোজগত অসুস্থ -এদের চিকিৎসা প্রয়োজন। এরা দিকভ্রান্ত -এদের সুস্পষ্ট প্রমানাদিসহ সঠিক পথ দেখানো প্রয়োজন। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহেন দাওয়াতী অভিযান এদের জন্য মুক্তি, সম্মান এবং সঠিক পথ প্রাপ্তির আলোকবর্তিকা রূপে উদিত হয়েছে।

এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব, এটাই ছিল তাঁর পথ ও পদ্ধতি এবং মানুষের সাথে আচরণের পটভূমি ও হৃদয়গ্রাহী তথ্য।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল অমুসলিমের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে ছিলেন প্রবল আগ্রহী। সেজন্যেই তিনি সকল ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। দাওয়াতের ব্যাপারে তিনি সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বনে সদা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। যদি কখনো কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত -তখন তিনি প্রবল বিমূর্ষ হয়ে যেতেন। তাই তিনি যেন এহেন কারণে এতটা বিমূর্ষ ও মর্মপীড়িত না হন সে জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٣﴾ [الشعراء: ٣]

“তারা মুমিন হবে না বলে হয়ত তুমি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ০৩]

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَلَا تَذۡهَبۡ نَفۡسُكَ عَلَيۡهِمۡ حَسَرَٰتٍۚ﴾ [فاطر: ٨]

“অতএব, তাদের জন্য আফসোস করে নিজে ধ্বংস হয়ো না।” [সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ০৮]

কোনো অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণে এহেন তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকার পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম কবূল করার জন্য কারো ওপর বল প্রয়োগকে সমর্থন করেন নি; বরং

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬]

এ আয়াতকে তিনি স্বীয় জীবনে কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এ এক বিস্ময়কর ও অদ্ভুত ভারসাম্যতার বাস্তবায়ন ঘটেছে। তিনি যখন কাউকে স্বীয় রব থেকে নিয়ে আসা সত্যের দিকে আহ্বান করতেন তখন তিনি সর্বস্ব দিয়েই দাওয়াত দিতেন; কিন্তু কখনই কাউকে তিনি বল প্রয়োগ করে নিজের দিকে ধাবিত করতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগত বাণীটি কতইনা চিত্তাকর্ষক এবং এ বাণী দ্বারাই সাধারণত একজন মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিভঙ্গিও ফুটে ওঠে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে,

«إنمَا مَثلِي وَمَثلُ النّاس كمَثل رَجُلٍ اسْتَوْقدَ نارًا فلمّا أضَاءَتْ مَا حَوْلهُ جَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدّوَابُّ التِي تقعُ فِي النّارِ يَقعْنَ فِيهَا فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقتَحِمْنَ فِيهَا فَأنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النّارِ وَهُمْ يَقتَحِمُونَ فِيهَا».

“আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো আর যখন তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল, তখন পতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পড়ে, তারা তাতে পড়তে লাগলো। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য টানতে লাগলো; কিন্তু তারা আগুনে পুড়ে মরল। তদ্রূপ আমি তোমাদের কোমরে ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি অথচ তারা তাতেই প্রবেশ করবে।”[22]

এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যত্নশীল এবং দয়াময় দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে কঠোরতা ও স্বেচ্ছাচারীতার লেশমাত্রও ছিল না।

পরিশেষে আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই মহান সত্তার যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ মহান চরিত্রমাধুর্য দ্বারা পরিপূর্ণ ও মহিমান্বিত করেছেন।

[22] সহীহ বুখারী: (باب الانتهاء عن المعاصي:كتاب الرقاق) হাদীস নং ৬১১৮; সহীহ মুসলিম: (باب شفقته صلى الله عليه وسلم على امته:كتاب الفضائل) হাদীস নং ২২৮৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অমুসলিমদের স্বীকৃতি

কিছু প্রতিকূল ধারণাগ্রস্থ ও মুসলিমগণের অন্ধ বিরুদ্ধবাদীরা এ কথা দাবী করে যে, মুসলিমগণ আকীদাহ তথা ধর্ম-বিশ্বাসে ভিন্নমত পোষণকারীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নয়, তাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না এবং তাদের দীনকে দীনই মনে করে না। তারা মনে করে -ইয়াহূদী খ্রিস্টানসহ মুসলিমগণের চারপাশে সহাবস্থানকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকেও মুসলিমরা সহ্য করতে পারে না।

আর আমি বলি বিরুদ্ধবাদীদের এ দাবীগুলো সকল জ্ঞানী মহলে পরিচিত পরিভাষা "এসক্কাত"[23] বৈ কিছুই নয়। এসক্কাত হলো, নিজের মধ্যে বিদ্যমান ত্রুটির দায়ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার নাম। যথা আরবী প্রবাদ বাক্য রয়েছে,

رمتني بدائها وانسلت

"সে তার নিজের দোষ-ত্রুটি আমার দিকে ছুঁড়ে মেরে নিজে কেটে পড়লো।"

কে কাকে স্বীকৃতি দেয় না?

সূচনালগ্ন থেকে ইসলামের ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে কে কাকে স্বীকৃতি দেয় না এবং কে কাকে অস্বীকার করে।

আমি অত্র গ্রন্থের আগত পৃষ্ঠাসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চরিত্রের একটি সমীক্ষা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ। যেন উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান সহায়ক হয়ে যায়। আমার সমীক্ষাটি দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হবে।

---

[23] 'এসকাত' হলো এমন একটি প্রতিরক্ষামূলক কৌশলের নাম, যার দ্বারা ব্যক্তি তার স্বভাবজাত বিদ্বেষমূলক অন্যায় ইচ্ছা বা ত্রুটি অন্যের ওপর আরোপিত করে নিজেকে দায়মুক্ত করা অপচেষ্টা করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীকৃতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অমুসলিমরা কি মুসলিমগণের ব্যাপারে জানে বা স্বীকার করে?

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অমুসলিমদের স্বীকৃতি

এ শাশ্বত মহান দাওয়াতে ইসলামিয়ার প্রাথমিক দিনগুলো থেকেই কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হচ্ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হচ্ছিল। আর কুরআন মাজীদ কোনো মন্তব্য ছাড়া শুধুমাত্র পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনাবলী বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং সর্বদা অন্যান্য নবীগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করেছে এবং সে ক্ষেত্রে কোনো একজন নবীর ব্যাপারেও ভিন্নতা করে নি।

আর পূর্ববর্তী নবীগণের ব্যাপারে গৃহীত এ পন্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবন থেকে শুরু করে মাদানী জীবনেও অব্যাহত ছিল। এমনকি ইয়াহূদী কিংবা খ্রিস্টানদের সাথে সংঘটিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরও কুরআন মাজীদ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের নবী ঈসা ও মূসা আলাইহিমাস সালাম-এর মাহাত্ম্য বর্ণনায় বিরত থাকে নি। যেমন, মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسۡتَوَىٰٓ ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [القصص: ١٤]

“আর মূসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।” [সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ১৪]

অন্যত্র এসেছে:

﴿قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّي ٱصۡطَفَيۡتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي فَخُذۡ مَآ ءَاتَيۡتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ١٤٤﴾ [الاعراف: ١٤٤]

“তিনি বললেন, হে মূসা, আমি আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা তোমাকে মানুষের ওপর পছন্দ করে নিয়েছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে প্রদান করলাম তা গ্রহণ কর এবং শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৪৪]

পবিত্র কুরআনে অনুরূপ উদাহরণ অনেক রয়েছে।

ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও পবিত্র কুরআনে অনুরূপ আলোচনা এসেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে:

﴿قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّٗا ٣٠ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا ٣١ وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَتِي وَلَمۡ يَجۡعَلۡنِي جَبَّارٗا شَقِيّٗا ٣٢ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوۡمَ وُلِدتُّ وَيَوۡمَ أَمُوتُ وَيَوۡمَ أُبۡعَثُ حَيّٗا ٣٣﴾ [مريم: ٣٠، ٣٣]

“তিনি বলেন, আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে এবং জননীর অনুগত থাকতে। আর আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩০-৩৩]

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحۡيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلۡيَاسَۖ كُلّٞ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٨٥﴾ [الانعام: ٨٥]

“আর (স্মরণ করুন) যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে। প্রত্যেকেই

নেককারদের অর্ন্তভুক্ত।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮৫]

শুধু তাই নয় পূর্ববর্তী নবীগণের এ শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মানসূচক আলোচনা মদীনায় ইয়াহূদী-খ্রিস্টান কর্তৃক সৃষ্ট বৈরী পরিস্থিতিতেও চলমান ছিল। যখন মদীনায় ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও বিরোধ চলছিল এবং ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে অনবরত মিথ্যারোপ করা হচ্ছিল তখনও পূর্ববর্তী নবীগণের গুণাগুণ বিরতিহীনভাবে চলছিল।

মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালাম -এ দু’জনকে আল্লাহ তা‘আলা প্রবল দৃঢ়চেতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ ۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٧﴾ [الاحزاب: ٧]

“আর স্মরণ কর (সে সময়ের কথা), যখন আমরা অঙ্গীকার নিয়েছিলাম নবীদের থেকে এবং তোমার থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ঈসা থেকে। আর আমরা তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ০৭]

আমরা যদি হিসাব কষি তাহলে দেখতে পাব যে, উক্ত আয়াতটি সূরা আল-আহযাব-এর অন্তর্ভুক্ত, যা বনু কুরাইযা কর্তৃক মুসলিমদের সাথে কৃত বিশ্বাসঘাতকতা ও মুসলিমদেরকে মদীনা থেকে পুরোপুরি উচ্ছেদের অপচেষ্টার পর অবতীর্ণ হয়েছে। তথাপি আমরা উপলব্ধি করেছি যে, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের নবী মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের সম্মাননা ও গুণাগুণ তখনও চলছিল। আমাদের আরও অনুভূত হয়েছে যে, মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের স্ব স্ব অনুসারী ও সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতার পরও কুরআনে তাঁদের (মুসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালাম-এর) প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে ব্যাপকহারে এবং কুরআনে বর্ণিত সেসব প্রশংসাবলী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইনসাফপূর্ণ চরিত্রগুণে নিজ উম্মত ও

ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের নিকট পৌঁছেও দিয়েছিলেন।

কুরআনে কারীমে এ মহান নবীদ্বয়ের সম্মাননা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ কোনো দৈবক্রম বা গতানুগতিক ঘটনা ছিল না; বরং যথোপযুক্ত বিবেচনায়ই বারবার বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে 'মুহাম্মাদ' শব্দটি শুধুমাত্র চারবার এবং 'আহমাদ' শব্দটি শুধুমাত্র পাঁচবার উল্লেখ হওয়া সত্বেও আমরা দেখেতে পাই যে, 'ঈসা' শব্দটি পচিশ বার, 'মসীহ' শব্দটি এগার বারসহ মোট ছত্রিশ বার ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নাম উল্লেখ হয়েছে। আর মূসা আলাইহিস সালাম তো সেসব নবীদের তালিকাভুক্ত হয়েছেন পবিত্র কুরআনে যাদের নামোল্লেখ করণের ষোলকলা পূর্ণ করা হয়েছে। যেহেতু মূসা আলাইহিস সালাম-এর নাম একশত চল্লিশ বার উল্লেখ হয়েছে।

বস্তুত পূর্ববর্তী নবীগণের নাম পবিত্র কুরআনে যতবার উল্লেখ হয়েছে তার সংখ্যার দিকে তাকালে এটাই অনুভূত হয় যে, এটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানষপটে পূর্ববর্তী নবীগণের জন্য এক বিনম্র শ্রদ্ধা ও সাদর অভ্যর্থনার বীজ বপন করে। অথচ বাস্তবতা হলো আমি যখন পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত নবীগণের নাম গণনার কাজে হাত দিয়েছি, তখন বিস্মিত হয়েছি। কারণ তখন বেশ কিছু চমৎকার সংখ্যাতত্ত্ব বা সূক্ষ্ম নিদর্শন আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাম উল্লেখ হয়ে মূসা আলাইহিস সালামের, অতঃপর পর্যায়ক্রমে ইবরাহীম, নূহ ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সকলের ওপর সর্বোত্তম শান্তি ও দুরূদ বর্ষিত হোক এবং তারা সকলেই দৃঢ়চেতা রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, ঐ সমস্ত রাসূলগণের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব যথোপযুক্ত এবং নির্ধারিত ছিল। কিন্তু যেমনটা আমি পূর্বেই আভাস দিয়েছিলাম যে, পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মাত্র পাঁচবার উল্লেখ হয়েছে -এ

সংখ্যাতত্ত্বের বিশ্লেষণে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, পবিত্র কুরআনে সতের জন নবীর নাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক বার উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা এ কথা নির্দ্বিধায় ও সুস্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, নিশ্চয় ইসলাম সকল নবী ও রাসূলগণকে যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দেয়।

আর এ সংখ্যাতত্ত্ব এ কথাও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, নিশ্চয় এ কুরআন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সংকলন করেন নি।

অনেক বিকৃত মস্তিষ্কধারী পাশ্চাত্যবাদীদের দাবী অনুযায়ী কুরআন যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংকলন হতো তাহলে অন্যদের নয়; বরং নিজের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করাই তাঁর মূল চেষ্টা হতো। বস্তুত এটি সম্পূর্ণ তাদের ভ্রান্ত চিন্তা বৈ কিছুই নয়।

এমতাবস্থায় আমরা সমন্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন রাখতে চাই যে, ইসলামের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনে পূর্ববর্তী নবীগণের এত সম্মান ও নানা প্রেক্ষিতে তাঁদের স্মরণ করার পরও একথা কী করে বলা সম্ভব যে, ইসলাম অন্যদের ব্যাপারে জ্ঞাত নয় ও স্বীকৃতি দেয় না?

এ ভূপৃষ্ঠে এমন কারা আছে যারা আমাদের ব্যাপারে জানে এবং স্বীকার করে, যেমনভাবে আমরা অন্যদের সম্পর্কে জানি ও স্বীকার করি:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সমস্ত সৃষ্ট জগতের সর্দার -এ কথায় আমাদের দৃঢ়শ্বিাস থাকার পরও আল-কুরআন আমাদেরকে কোনো পার্থক্যকরণ ছাড়া সকল নবীগণের ওপর ঈমান আনার নির্দেশ প্রদান করে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঈমানের স্বরূপ বর্ণনায় সে বিষয়গুলোই বলেন যেগুলোতে সহমত প্রদর্শন উম্মতে মুসলিমাহ-এর জন্য আবশ্যক। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦﴾ [البقرة: ١٣٦]

“তোমরা বল, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের ওপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের ওপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৬]

রাসূলগণ ও তাদের রিসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে পাওয়া সকল ধর্মের একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া এবং সকল রাসূলের রিসালাতের কেন্দ্রবিন্দু এক আল্লাহ হওয়ার ওপর ঈমান আনাসহ এ সকল কিছুকেই ইসলাম ব্যাপৃত করে নেয়। উপরোক্ত আয়াতে ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গিরই বর্ণনা রয়েছে।[24]

আল্লামা ইবন কাসীর রহ. উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপকার্থবোধক অংশ বিশেষ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ এর মন্তব্যে বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, “আমরা তাঁদের সকলের ওপরেই বিশ্বাস পোষণ করি।” কাজেই এ উম্মতের সকল মুসলিমগণ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল রাসূলগণকে, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল কিতাবসমূহকেই বিশ্বাস করেন। এসবের কোনোটিকেই তারা অস্বীকার করেন না; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা-ই অবতীর্ণ হয়েছে তাই এ উম্মতের মুমিনরা বিশ্বাস করে এবং যে সকল নবীকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন সকলকেই মুমিনরা স্বীকার করেন।[25] শুধু

---

24. সায়্যিদ কুতুব: যিলালিল কুরআন ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৩।

25. ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনুল কারীম: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৩।

তাই নয় বরং নবীগণের মধ্যে যে তারতম্য সৃষ্টি করে তার ব্যাপারে আল-কুরআন অতীব কঠোরতা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٥١﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١]

“নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফুরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, ‘আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফুরী করি’ এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমরা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর ‘আযাব।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫০-১৫১]

পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের ব্যাপারে কথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহেন মৌলিক বিষয়টি চিন্তায় রেখেই কথা বলতেন। আমাদেরকেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা নবীগণের মধ্যে একজনকে অন্যের ওপর প্রাধান্য না দেই। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»

“তোমরা নবীগণের একজনকে অন্যের ওপর প্রধান্য দিও না (তারতম্য করো না)।”[26]

বিশেষত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে অপরাপর

26. সহীহ সহীহ বুখারী: (كتاب الخصومات و:باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهوديّ) হাদীস নং ২২৮১; সহীহ মুসলিম (كتاب الفضائل: باب من فضائل موسى عليه السلام) হাদীস নং ২৩৭৪।

নবীগণের ওপর অগ্রাধিকার দিতে নিষেধ করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تُخَيِّرُوْنِيْ مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ»

“তোমরা আমাকে অপরাপর নবীগণের ওপর প্রধান্য দিও না।”[27]

এছাড়াও নবীদের মধ্যে একজনকে অন্যের ওপর প্রধান্য দেওয়ার বিষয় নিয়ে যখন এক মুসলিম ও ইয়াহূদীর মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীর পক্ষপাত গ্রহণ করে রাগান্বিত হলেন।

(ইয়াহূদীর দাবী অনুযায়ী মূসা আলাইহিস সালামকে অগ্রাধিকার দিলেন)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلَانٍ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى»

“একবার এক ইয়াহূদী তার কিছু দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির জন্য পেশ করছিল, তার বিনিময়ে তাঁকে এমন কিছু দেওয়া হলো যা সে পছন্দ করল না। তখন সে বললো, না! সেই সত্তার কসম, যিনি মূসা আলাইহিস সালামকে মানব

27. সহীহ বুখারী (كتاب الديات: باب اذا لطم يهوديا عند الغضب) হাদীস নং ৬৫১৯।

জাতির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথাটি একজন আনসারী (মুসলিম) শুনলেন, তুমি বলছো, সেই সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানব জাতির ওপর মর্যাদা দান করেছেন অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তখন সে ইয়াহূদী লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেল এবং বলল, হে আবুল কাসিম। নিশ্চয় আমার জন্য নিরাপত্তা এবং আহাদ রয়েছে অর্থাৎ আমি একজন যিম্মি। অতএব, অমুক ব্যাক্তির কী হলো, কী কারণে সে আমার মুখে চড় মারলো? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মারলে? আনসারী ব্যাক্তি ঘটনাটি বর্ণনা করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলেন। এমনকি তার চেহারায় সেটা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর নবীগণের মধ্যে কাউকে কারো ওপর (অন্যকে হেয় করে) মর্যাদা দান করো না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ যাকে চাইবেন সে ব্যতীত আসমান ও জমিনের বাকী সবাই বেহুশ হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয়বার তাতে ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। তখনই আমি দেখতে পাব মূসা আলাইহিস সালাম 'আরশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, তূর পর্বতের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুশ হয়েছিলেন এটা কি তারই বিনিময়, না আমারই আগে তাঁকে উঠানো হয়েছে? আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোনো ব্যাক্তি ইউনুস ইবন মাত্তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।”[28]

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের বাস্তবিক ঘটনাবলি উল্লেখ করা থেকে কখনই বিরত থাকতেন না। বিশেষ করে ঐ সকল ক্ষেত্রে যেখানে ইয়াহূদী ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্

[28] সহীহ বুখারী (كتاب الأنبياء:باب قوله تعالى و يونس لمن المرسلين) হাদীস নং ৩২৩৩; তিরমিযী, হাদীস নং ৩২৪৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২৭৪।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় নববী ভাই মূসা ইবন ইমরানের নামোল্লেখসহ তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাদীসে বর্ণিত বিরোধের ঘটনাকে সমূলে সমাহিত করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে এবং পূর্ববর্তী সকল নবীগণকে একই ধারাবাহিকতায় বৃত্তায়ণ ও একই ভবনের অনেকগুলো ইটতুল্য মূল্যায়ণ করতেন। পরস্পরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রতিযোগিতা কিংবা বিরোধের তো কোনো সুযোগই ছিল না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ»

"আমার দৃষ্টান্ত এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে একটি আট্টালিকা তৈরি করল এবং তা উত্তম ও সুন্দর করল। তবে তার কোণগুলোর কোনো এক কোণায় একটি ইটের জায়গা ছাড়া। লোকেরা তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আর তা দেখে বিস্মিত হতে লাগল এবং পরস্পর বলতে লাগল, ঐ ইটখানি স্থাপন করা হলো না কেন? (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি-ই সে ইট আর আমি নবীগণের মোহর ও শেষ নবী।"[29]

ইতিহাসে দীর্ঘ পরিক্রমার পথ চলায় পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের ব্যাপারে এটাই ছিল আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্পর্ক; সেতো একটি বৃহদায়তন বিশাল ভবনের ইটসমূহের মতো। আর ইটের উপমা দ্বারা মুখোমুখি সংঘর্ষ বা অবস্থান উদ্দেশ্য নয়; বরং একটি ভবন যেমন

[29] সহীহ বুখারী, (باب خاتم النبيين:كتاب المناقب) হাদীস নং ৩৩৪২; সহীহ মুসলিম (باب ذكر كونه صلعم تم النبيين:كتاب الفضائل) হাদীস নং ২২৮৬।

অনেকগুলো ইটের দ্বারা পূর্ণতা পায় এবং একটি ইট অন্যটির সহযোগিতায় উপরে উঠে, ঠিক তেমনি আম্বিয়ায়ে কেরামও এক মহান দায়িত্ব পালনে যুগে যুগে একে অপরকে সহযোগিতা করে গেছেন, একজন আরেকজনকে পূর্ণতা অর্জনে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। আর সেই মহান দায়িত্বটি হলো মহান রবের একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা।

অতএব, এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার পথে যারা আমাদের পূর্ববর্তী হয়েছেন তাদেরকে আমরা সম্পূর্ণরূপে চিনি ও জানি এবং আমরা যখন এ কথা বলি যে, 'আমরা পূর্ববর্তী নবীগণকে তাদের অনুসারীদের থেকে বেশী ভালোবাসি এবং তাদের সম্প্রদায় থেকে বেশী মর্যাদা দিই' তখনো আমরা অতিরঞ্জিত করি না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাদীসের মধ্যেই এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যেমন, একজন ইয়াহূদীকে আশুরার দিনে সাওম পালন করতে দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিজ্ঞাসা, জবাব ও তার প্রতি উত্তর। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ»

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করে দেখতে পান যে, ইয়াহূদীরা আশুরার দিনে সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন?) তারা উত্তর দিল, এ অতি উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে মুক্তি দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা আলাইহিস সালাম সাওম পালন করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন

এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন।”[30]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে নিজেকে বনী ইসরাঈলদের থেকেও বেশি হকদার মনে করছেন। কেননা বনী ইসরাঈলের ফির‘আউন থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি তাকে এত আনন্দিত করেছে যে, এ নি‘আমতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে তিনি নিজে ঐ দিন সাওম পালন করেছেন এবং তার উম্মতকেও সাওম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এতগুলো বিষয় ও ঘটনাবলী কি মূসা আলাইহিস সালাম এবং বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের অবগতি এবং তাদেরকে আমাদের স্বীকৃতি দান বলে গণ্য হবে না?

ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أنا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ»

“ইহ ও পরজগতে আমি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী। লোকেরা বলল, কীভাবে হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, নবীগণ একই পিতার সন্তানের মতো[31]। তাদের মা বিভিন্ন। তাঁদের দীন একটিই।”[32]

[30] সহীহ বুখারী, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত (كتاب الصوم: باب صيام عاشوراء) হাদীস নং ১৯০০; সহীহ মুসলিম (كتاب الصيام: باب صوم يوم عاشوراء) হাদীস নং ১১৩০।

[31] ভিন্ন ভিন্ন মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া একই পিতার সন্তান।

[32] সহীহ বুখারী, (كتاب الأنبياء: باب واذكر فى الكتب مريم ....مانا شرقياً) হাদীস নং ৩২৫৯; সহীহ মুসলিম (كتاب الفضائل: باب فضل عيسى عليه السلام) হাদীস নং

এ সাবলীল উদার বক্তব্যটি কি ঈসা আলাইহিস সালাম এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের অবগতি এবং তাদেরকে আমাদের স্বীকৃতি দান বলে গণ্য হবে না?

আমরা আরো দেখতে পাই যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পর ইসলামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান দুই ব্যক্তিত্ব আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের সাথে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এ সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য সাধন নবী ও রাসূলদের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা ও সম্মানের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ এবং প্রশংসার দাবীদার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام»

"হে আবু বকর, নিশ্চয় তোমার উপমা হচ্ছে ইবরাহীম আলাহিস সালামের মতো।" যে ইবরাহীম বলেন,

﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّيۖ وَمَنۡ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٦﴾ [ابراهيم: ٣٦]

"সুতরাং যে আমার অনুসরণ করেছে, নিশ্চয় সে আমার দলভুক্ত আর যে আমার অবাধ্য হয়েছে, তবে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«ومثلك يا أبابكر كمثل عيسى عليه السلام»

"হে আবু বকর! তোমার উপমা হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালামের মতো।" যে ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন,

﴿إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١١٨﴾ [المائ

২৩৬৫।

دة: ١١٨]

“যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা আপনারই বান্দা, আর তাদেরকে যদি ক্ষমা করেন তবে নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১১৮]

উক্ত দু’টি আয়াতে ইবরাহীম ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের যে রকম বিনম্র চিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকেও সেই বিশেষ গুণে বিশেষায়িত করা হয়েছে।

উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وان مثلك ياعمر كمثل نوح عليه السلام»

“হে উমার, নিশ্চয় তোমার উপমা হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালামের মতো।” যেই নূহ বলেন,

﴿رَّبِّ لَا تَذَرۡ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦]

“হে আমার রব! জমিনের উপর কোনো কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না।” [সূরা নূহ, আয়াত: ২৬]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, (উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وان مثلك ياعمر كمثل موسى عليه السلام»

“হে উমার তোমার উপমা হচ্ছে মূসা আলাইহিস সালামের মতো।”[33] যেই মূসা আলাইহিস সালাম বলেছেন,

﴿وَٱشۡدُدۡ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ﴾ [يونس: ٨٨]

---

33. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৩২৩২; বায়হাকী, হাদীস নং ১৬৬২৩।

“তাদের অন্তরসমূহকে কঠোর করে দিন। ফলে তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না যন্ত্রনাদায়ক ‘আযাব দেখে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৮]

এমনটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের মহান মর্যাদা।

এমনকি কোনো নবী থেকে প্রকাশিত কোনো কাজের ভিন্নরূপ যদি কোথাও তিনি আশা করতেন তাহলে প্রথমে সেই নবীর জন্য আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দো‘আ-প্রার্থনার দ্বারা স্বীয় বাসনা প্রকাশ করতেন। যেমন, মূসা ও খিদিরের সফরে যখন তিনি মূসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আফসোস করলেন যে, যদি তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন... সে ক্ষেত্রে তিনি বললেন,

«يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا»

“আল্লাহ তা‘আলা মূসার ওপর রহম করুন। আমাদের কতই না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতো যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো।”[34]

অনুরূপভাবে লূত আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত ঘটনা:

﴿قَالَ لَوۡ أَنَّ لِي بِكُمۡ قُوَّةً أَوۡ ءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكۡنٖ شَدِيدٖ ٨٠﴾ [هود: ٨٠]

“সে বলল, ‘তোমাদের প্রতিরোধে যদি আমার কোনো শক্তি থাকত অথবা আমি কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতে পারতাম।” [সূরা হুদ, আয়াত: ৮০]

এখানে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে, লূত আলাইহিস সালাম যে কথাটি বলেছেন তার থেকে উত্তম কথা রয়েছে তখন তিনি আফসোস করে বললেন,

[34] সহীহ বুখারী (كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله) হাদীস নং ১২২; সহীহ মুসলিম (كتاب الفضائل: باب من فضائل خضر) হাদীস নং ২৩৮০।

«يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ»

“লূত আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রহম করুন, তিনি শক্ত-কঠিন স্তম্ভের[35] আশ্রয় চাইতেন।”[36]

এছাড়াও বিভিন্ন সুনানে নববীয়্যাহ গ্রন্থসমূহ পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই যে, পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের অনুসারীদের মধ্যে যারা ধার্মিকতায় যথেষ্ট অগ্রগামী হয়েছে ও দীনের পথে অটল থেকেছে, তাদের ব্যাপারে যতটুকু গুণাগুণ বা প্রশংসা করেছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব ব্যক্তিদের প্রশংসায় তাদের নবীদেরকে অতিক্রম করে গেছেন। যেমন, পবিত্র করআনের সূরা বুরূজে বর্ণিত ‘আসহাবে উখদূদ’[37]-এর ঘটনা বর্ণনার সময় খ্রিস্টান ধর্মসাধকের প্রশংসা, আল্লাহর নি‘আমতের শুকরিয়া আদায়কারী বনী ইসরাঈলের “অন্ধ আবেদ”[38]-এর প্রশংসা, বনী ইসরাঈলে আবেদ জুরাইয এবং শিশু বাচ্চার দোলনায় কথা বলার ঘটনা, যা সাহাবীগণের জন্যে তিনি উল্লেখ করতেন সেই জুরাইয[39] নামীয় আবেদ এর প্রশংসা। অনুরূপ ঘটনার

---

[35] এখানে স্তম্ভ বলে বংশীয় দিক থেকে শক্তিশালী হওয়া বুঝিয়েছেন। [সম্পাদক]

[36] সহীহ বুখারী, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে (كتاب الانبياء: باب قوله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم) হাদীস নং ৩১৯৩, সহীহ মুসলিম (كتاب الفضائل: باب من فضائل إبراهيم الخليل) হাদীস নং ১৫১।

[37] সুহাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে ইমাম মুসলিম রহ. আসহাবে উখদুদের হাদীটি বর্ণনা করেছেন। (كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام) হাদীস নং ৩০০৫; আহমদ হাদীস নং ২৩৯৭৬।

[38] অন্ধ, কুষ্ঠরোগী ও বধীর-এর ঘটনা, যা ইমাম সহীহ বুখারী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন (كتاب الانبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل) হাদসি নং ২৩৭৭, ইমাম মুসলিম (كتاب الزهد والرقائق) হাদীস নং ২৯৬৪।

[39] বনী ইসরাঈলের জুরাইজ নামীয় আবেদ ও শিশু বাচ্চার দোলনায় কথা বলার ঘটনা, যা ইমাম সহীহ বুখারী আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন (كتاب أبواب العمل في الصلاة: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) হাদীস নং ১১৪৪; ইমাম

বিবরণ বিভিন্ন সুনানে নববীয়্যাহ গ্রন্থমালায় এত বেশি বর্ণিত হয়েছে যে, এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে এগুলোর পরিসংখ্যান আনয়ন খুবই কঠিন।

এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী দীনসমূহের আবেদগণকে হিদায়াতের পথে আদর্শ এবং আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

প্রিয় পাঠক! আগত হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করুন, দেখুন অন্য দীনের অনুসরণের কিরূপ উপমা উপস্থাপিত হয়েছে। খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ».

“আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি কা‘বা ঘরের ছায়ায় তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম, (আমাদের জন্য কি) সাহায্য কামনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দো‘আ করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল যাকে ধরে নিয়ে তার জন্য জমিনে গর্ত করত। তারপর করাত এনে মাথায় আঘাত হেনে দুই টুকরা করে ফেলা হতো। লোহার শলাকা দিয়ে তার গোশত ও হাড্ডি খসানো

মুসলিম (باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة:كتاب البر والصلة والأداب) হাদীস নং ২৫৫০।

হত। এতদসত্ত্বেও তাকে তার দীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। আল্লাহর কসম! এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে, সান‘আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না এবং নিজের মেষপালের জন্য শুধু বাঘের ভয় থাকবে; কিন্তু তোমরা তো তাড়াহুড়া করছ।”[40]

অগ্রজ আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারীবৃন্দের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিন্তা-চেতনা এমনই সম্মানসূচক ছিল এবং এ চেতনা তিনি স্বীয় জীবনাচারের প্রতিটি ধাপে অটুট রেখেছেন।

শুধু তাই নয় বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রথমবার যখন অহী নাযিল হলো এবং তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে, এটা কী? তখন তিনি খ্রিস্টান পাদ্রী ওয়ারাকা ইবন নাওফল[41]-এর কাছে গেলেন এবং তার কাছে এ ঘটনাবলী[42] বললেন। সব শুনে ওয়ারাকা ঘোষণা করল যে, সে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ দিনগুলোতে

---

40 সহীহ বুখারী (باب من اختار لبضرب والقتل والهوان على الكفر :كتاب الإكراه) হাদীস নং ৬৫৪৪, আহমদ, হাদীস নং ২১১০৬।

41. ওয়ারাকা ইবন নাওফল ইবন আব্দুল আসাদ ইবন আব্দুল-উযযা ইবন কুসাই। জাহেলী যুগেও তিনি নাসরানী ধর্ম পালন করতেন। অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর হেরা গুহায় অহী নাযিল হলো তখন তখন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে নিজ চাচাত ভাই ওয়ারাকার কাছে গেলেন। ওয়ারাকা সব শুনে বললেন, এ তো ঐ (নামুস) অহী যা মূসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল হয়েছিল। অধিকতর জানতে পড়ুন: আল্লামা ইবনুল আসীরের উসদুল গাবাহ ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠ ৪৬৩-৪৬৫ এবং আল্লামা ইবন হাজার আসকালানীর আল-ইসাবাহ ৬ষ্ট খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৭।

42. সহীহ বুখারী (باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله :كتاب بدء الوحي عليه وسلم) সহীহ মুসলিম (باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى :كتاب الإيمان الله عليه وسلم) হাদীস নং ১৬০।

(রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর স্বগোত্রীয়দের থেকে আগত বিতাড়ন ও বিপদাপদ) জীবিত থাকে (কারণ ওয়ারাকা খুব বৃদ্ধ ছিল) তাহলে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্য সাহায্য করবে; কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। কারণ দ্বিতীয়বার অহী শুরু হওয়ার আগেই ওয়ারাকা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন, তথাপি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভুলেন নি; বরং তার ঈমানের প্রশংসা করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন যে, ওয়ারাকা জান্নাতবাসীদের একজন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَسبُّوا وَرَقَةَ؛ فَأَنِّي رَأيتُ له جَنَّة أَوْ جَنَّتَيْنِ»

“তোমরা ওয়ারাকাকে গালি দিও না। কেননা আমি তার জন্য এক জান্নাত কিংবা দু জান্নাত দেখেছি।”[43]

ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ ধরণের অনুভূতি অসংখ্য রয়েছে। এ অনুভূতিগুলো বিরোধীদের সাথে আপস বা সংবেদনশীলতা নয়; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পদক্ষেপগুলো সম্পূর্ণ ইতিবাচক মানসিকতায় ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও জানতেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের অস্তিত্ব থাকবেই। এটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এজন্য তিনি বিভিন্ন হাদীসে সে দিকে ইঙ্গিতও করেছেন[44]। আর যাদের বিদ্যমানতা অনস্বীকার্য

---

43. মুসতাদরাকে হাকিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, হাদীস নং ৪২১১ এবং হাকিম বলেন যে, এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কিন্তু তারা এটি তাখরীজ করেন নি। ইমাম যাহাবীও (রহ.) তালখীস গ্রন্থে এ কথা বলেছেন। নাসীরুদ্দীন আলবানীও এটিকে সহীহ বলেছেন। অধিকতর জানতে দেখুন: সহীহ আল-জামিউ হাদীস নং ৭৩২০।

44. যেমন দেখুন: সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৭৬৮, ২১০৯; সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২৯৪৪,

তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের সাথে সহাবস্থানকে মেনে নেওয়াই স্বাভাবিক এবং তাদের সাথে চলা-ফেরা, লেন-দেন ও আচার-আচরণের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পথ খুঁজে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অমুসলিমদেরকে স্বীকার করে নেওয়া কিংবা তাদের কারো প্রশংসা করা শুধুমাত্র খামখেয়ালি চিন্তাধারা বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য নয়, যা ইসলাম ও মুসলিমদের বাস্তবিক জীবনেতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে আপনি দেখতে পাবেন; বরং ইসলামী জীবন-বিধানে এ সকল চিন্তাধারা ও বক্তব্যের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছে। ফলে তা বহু ইতিবাচক ফলাফল বয়ে এনেছে। একই সমাজে ভিন্ন মতাবলম্বী অনেকগুলো সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে স্বীকার করা ও তাদের সাথে সদাচরণের এ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিটি অনেক ফলপ্রসু ও কার্যকরী। যা পারস্পরিক সহাবস্থানকে সহজ, স্বাভাবিক ও নিরাপদ করে তোলে।

আর এজন্যই মদীনায় আগমন করেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানকার ইয়াহূদীদের সাথে সহাবস্থানকে স্বতস্ফূর্তভাবে মেনে নিলেন এবং তাদের সাথে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় এসকল চুক্তিকে অটুট রাখতে চাইতেন। যত বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তিভঙ্গের অঘটন ঘটেছিল সব ইয়াহূদীদের পক্ষ থেকেই হয়েছে। যতক্ষণ প্রতিপক্ষ থেকে কোনো অন্যায় বা সীমালঙ্ঘন প্রকাশ পায় নি ততক্ষণ তিনি মজবুতভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখেছেন। বরং মদীনাতে স্থায়ী শান্তি বিরাজমান রাখার স্বার্থে অনেক সময় তিনি প্রতিপক্ষের অনেক অন্যায় বাড়াবাড়িকেও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এ আচরণ-বিধির প্রতি লক্ষ্য

১৫৫।

রেখেছেন। এমনকি তাঁর কিছু কিছু কাজে অনেকেই হয়রান হয়ে যেত। যেমন, তিনি নিজের লৌহবর্ম বন্দক রেখে বাকীতে কিছু খাবার ক্রয় করেছেন এক ইয়াহূদীর নিকট থেকে!![45] আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মদীনাতে সাহাবী দের মধ্যে অনেকেই ধনী ছিলেন। যাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে প্রিয় কেউ ছিল না। হতে পারতো যে, তাদের কাউকে জানালে তারা হাদিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রয়োজন পূর্ণ করে দিত কিংবা কমপক্ষে এটাতো হতে পারতো যে, তিনি কোনো ধনী সাহাবীর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন এবং সে সাহাবীর নিকটই লৌহবর্ম বন্ধক রাখতেন। কিন্তু পরিস্থিতি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি মুসলিমদের জন্য এ ধরণের কাজের বৈধতা দেওয়ার জন্য এমন করেছেন এবং এতে তিনি এ দিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রতিবেশী অমুসলিমগণ যদি মুসলিমদের কোনো প্রকার সম্মানহানি না করে তাহলে তাদের সাথে এ ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করা স্বাভাবিক। সেটি লৌহবর্ম বন্ধক রাখা পর্যায় পর্যন্ত গড়ালেও। লৌহবর্ম অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি যুদ্ধ-সরঞ্জাম। এরপরও প্রতিবেশী ইয়াহূদীর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ করার জন্যই তিনি তার নিকট সেটি বন্ধক রেখেছেন।

ইয়াহূদীদের মতো খৃস্টানদের সাথেও তিনি একই ধরণের আচরণ করতেন, তাদের সাথেও একাধিকবার অনেকগুলো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন এবং তাদেরকে সামাজিক স্বীকৃতিও দিয়েছেন। অথচ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের এমন কিছু সুক্ষ্ম আক্বীদা-বিশ্বাস রয়েছে যা স্পষ্টত শির্ক। তথাপিও

45. সহীহ বুখারী, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, (باب من رهن درعه ،كتاب الرهن) হাদীস নং ২৩৭৪; সহীহ মুসলিম (باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر ،كتاب المساقاة) হাদীস নং ১৬০৩।

তাদের শির্কের প্রতি ধাবমানতা দেখেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ধর্ম পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন না । আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন:

﴿أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]

“তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন হয়?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র উত্তম পন্থায় দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং যথাযথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ খুলে খুলে বর্ণনা করে দেওয়া। অতঃপর প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সত্যকে গ্রহণ করা কিংবা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ﴾ [الكهف: ٢٩]

“অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ২৯]

এখান থেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা মেনে নিয়েছেন যে, ইয়াহূদীদের অনেকে ইয়াহুদিয়্যাতের ওপর এবং খৃস্টানদের অনেকে নাসরানিয়্যাতের ওপর থেকে যাবেই এবং তিনি এটাও গ্রহণ করে নিয়েছেন যে, বিরোধী সকল সম্প্রদায়ের সাথেই শান্তিপূর্ণ সদাচরণ চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে সাধারণ মূলনীতি তো হচ্ছে,

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬]

কেননা, যে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করে না তার এ ইসলাম না তার নিজের কোনো উপকারে আসে এবং না এর দ্বারা সমাজের কোনো ফায়দা

হয়। সুতরাং মনে কুফুর লুকিয়ে রেখে এবং ভেতরে ভেতরে ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে চাপে পড়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কোনো মানে হয় না; বরং এমন ব্যক্তি অমুসলিমদের মাঝে থেকে শান্তি ও সস্তির জীবন বেচে নিক এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা মেনে নিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[الجاثية: ١٧] ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

"তারা যে সব বিষয়ে মতোবিরোধ করত তোমার রব কিয়ামতের দিনে সে সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন।" [সূরা আল-জাছিয়াহ, আয়াত: ১৭]

শুধু ইয়াহূদী-খ্রিস্টান তথা আহলে কিতাবীদের সাথেই নয়; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবনের দীর্ঘ একটি সময় কাফির-মুশরিকদের সাথেও সহাবস্থান ও সদাচরণকে গ্রহণ ও বরণ করে এসেছেন। দেখুন, মক্কী জীবনে এ ধরণের বহু আয়াত নাযিল হয়েছে,

[الكافرون: ٦] ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦﴾

"তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।" [সূরা আল -কাফিরূন, আয়াত: ৬]

[الاعراف: ١٩٩] ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ١٩٩﴾

"তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৯৯]

[الانعام: ١٠٦] ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٦﴾

"এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১০৬]

এটি ছিল মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ-বিধি। মক্কায় কাফির-মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

বিরোধিতা করেছে, তার ওপর যুলুম-নির্যাতন করেছে, তাঁর সাহাবীদেরকে দেশান্তরিত করেছে এবং তাঁর জন্য যাবতীয় পথই সংকীর্ণ করে ফেলেছে তবুও মোকাবেলায় ফিরে দাঁড়নোর সুযোগ ছিল না।

ইসলাম বিরোধী সকল সম্প্রদায়কে স্বীকৃতিদান, ইসলামের সাথে আক্বীদাগত দিক থেকে চরম অসামাঞ্জস্য হওয়া সত্বেও সকল দল-মতকে মেনে নেওয়া এবং এ জাতীয় অসাধারণ ধৈর্য, সহ্য ও বিনম্র আচরণের পরও ইসলাম বিদ্বেষীরা কি তাঁকে সামাজিক স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দিয়েছে?!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
অমুসলিমরা কি মুসলিমদের স্বীকৃতি দেয়?

উপরের অধ্যায়ে আলোচ্য সকল শ্রেণির অমুসলিমদের প্রতি রাসূলের স্বীকৃতি দান ও সদাচরণের এতগুলো দৃষ্টান্তের পর এবং সকল আকীদাগত মতপার্থক্য অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদেরকে বরণ ও গ্রহণ করে নেওয়ার ব্যাপক প্রমানাদি উপস্থাপনের পর এখন আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যে, অমুসলিমরা কি রাসূল কিংবা মুসলিমদেরকে স্বীকার করে?!

মুসলিমদেরকে স্বীকৃতি প্রদানে ইয়াহূদীদের অবস্থান:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের অবস্থান কিরূপ ছিল এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর আবির্ভাবের সুচনা লগ্ন থেকেই মিথ্যাচার, বিরুদ্ধাচরণ ও অস্বীকারই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইয়াহূদীদের মূল চেতনা। অথচ সকল প্রকার প্রামাণ্যচিত্র ও তথ্যাবলি এ কথারই দাবী রাখে যে, ইয়াহূদীরা রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রচারিত দীন

সম্পর্কে তাঁর মক্কী জীবনেই সম্যক অবগত ছিল।

ইয়াহূদীদের এ মানসিকতার পরিচ্ছন্ন ধারনা লাভের জন্য তাদের স্বজাতীয় গবেষক "ইসরাঈল ওয়ালফানসুন" এর সংকলনটি খুবই অগ্রগণ্য বিবেচনা করা হয়: (যদিও আমরা তার অনেক মতের সাথে সহমত পোষণ করি না তথাপি তার এ সংকলনটির শুদ্ধতায় কারো ভিন্নমতো নেই)

"ইসরাঈল ওয়ালফানসুন"[46] তার গবেষনায় উল্লেখ করেন "আমি এ ধারণা পোষণ করি যে, নিশ্চয় ইয়াহূদীরা ইসলামের উত্থান সম্পর্কে কখনই উদাসীন এবং অজ্ঞ ছিল না। কেননা এটি তাদের ঐক্য, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। বিশেষতঃ রাসূলের মক্কী জীবনের শেষ দিনগুলোতে দাওয়াতে ইসলামীয়ার মহান ডাক মদীনা অভিমুখে ধেয়ে আসা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বিদ্যমান এতো তীব্র বিদ্বেষ- যে অত্র গোত্রের অপর দুই শাখা বুনু নাযীর ও বনু কুরাইজার দলপতিগণকে মুসলিমদের কর্মকাণ্ডের ওপর পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হলো- থাকা সত্যেও খাযরাজ গোত্রের নেতৃবৃন্দগণের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করা, মদীনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গোপনীয়তা অবলম্বন না করা, (যেমন, মাস'আব ইবন উমাইর[47] সকলের গোত্রের মধ্যমণীত অবস্থান করেও প্রকাশ্যে লোকদরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি আহ্বান করতেন) এবং হজের মৌসুমে ইয়াহূদী বনীকগণের মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে বাণিজ্য সম্পাদন করার পরও এ দাবী খুবই অযৌক্তিক যে, ইয়াহূদীরা মুসলিম

46. "ইসরাঈল ওয়ালফানসুন" মিশরের ডক্টর ত্বহা হোসাইনের তত্বাবধানে 'আরব বিশ্বে ইয়াহূদী' বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনকারী একজন ইয়াহুদী আলোচক।

47. মাস'আব ইবনু উমাইর: তিনি বদর ও ওহুদ যদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মদীনায় দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলন।

সম্পদায় সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না।”[48]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতেও ইয়াহূদী গবেষক ‘ওয়ালফানসুনের’ এ বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। কারণ, আয়াতে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের ‘আলেমগণ রাসূলের সত্যতা সম্পর্কে খুব ভালোরূপে অবগত ছিল। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনে বলেন,

﴿أَوَ لَمۡ يَكُن لَّهُمۡ ءَايَةً أَن يَعۡلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُاْ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ١٩٧﴾ [الشعراء: ١٩٧]

“এটা কি তাদের জন্য একটা নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতগণ তা জানে?” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ১৯৭]

কাজেই মক্কার মুশরিকদের জন্য এটি একটি নিদর্শন ছিল। কেননা তারা ইয়াহূদী ‘আলেমদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে তার ব্যাপারে জানতে চাইলে ইয়াহূদী ‘আলেমগণ তাদের কিতাবে হুবহু বর্ণনাটিই খুঁজে পেল। অতএব, এ কথায় আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইয়াহূদীরা খুব ভালো করেই চিনতে পেরেছিল যে, এ সেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ব্যাপারে নিজেদের কিতাবে পড়ে তার আগমনের জন্য অপেক্ষ্যমান ছিল।

বিখ্যাত তাবে‘ঈ ইবন ইসহাক[49] এ ব্যাপারে যে বর্ণনাটি পেশ করেছেন তাতে

---

48. ওয়ালফানসুন প্রণীত গ্রন্থ “জাহেলী যুগ ও ইসলামের আবির্ভাবকালীন আরব বিশ্বে ইয়াহুদীদের ইতিহাস” পৃষ্ঠা নং ১০৬-১০৮।

49. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াসার, তিনি আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাক্ষাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং বিখ্যাত তাবেয়ী, মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ আত্বা ইবন আবি রাব্বাহ ও ইবন শিহাব যুহরী রহ. থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১৫১ হিজরীতে মারা যান। অধিকতর জানতে দেখুন- ইমাম যাহাবী রচিত গ্রন্থ আল-কাশেফ: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬।

বিষয়ের সত্যতা আরো তরান্বিত হয়। তিনি বর্ণনা করেন যে, কুরাইশরা নযর ইবন হারেছ এবং উকবাহ ইবন আবী মু‘ঈতকে মদীনার ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছে প্রেরণ করল, যেন তারা নিজেদের (কুরাইশ) মধ্যে প্রেরিত এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য কিছু প্রশ্ন জেনে যায়। তখন ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ ঐ দু’জনকে তাওরাত কিতাবে বর্ণিত এমন কয়েকটি বিষয় শিখিয়ে দিলেন, যেগুলো কোনো নবী ছাড়া অন্য কেউ জানবে না। অতঃপর ঐ দুই কুরাইশী ব্যক্তি ইয়াহূদী পণ্ডিত থেকে শিখে আসা প্রশ্নসমূহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উত্থাপন করল। তখন তিনি তাওরাত কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলেন।

এ ঘটনাটিই ছিল সূরা কাহাফ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট[50]। আর এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়ার সত্যতাও সকলের সামনে পরিস্কার হয়ে যায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

“যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবন কাসীর[51] রহ. অনেকগুলো বর্ণনা

---

50. ইবন হিশাম রচিত গ্রন্থ আস-সীরাতুন্নববীয়্যাহ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১০-২১১ ও আল্লামা ইবনু কাসীরের ‘তাফসীরুল কুরআনিল কারীম’ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮।

51. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু উমার ইবনু কাসীর আল-করাইশী আদ-দামেশকী আল-শাফেঈ। তিনি ছিলেন একাধারে একজন ইমাম, হাফিজুল হাদীস ও বিখ্যাত ইতিহাসবিদ। ৭০০ হিজরীতে দামেশকের আল মুজদিল এলাকায় জন্ম গ্রহন করেন।

উপস্থাপন করেছেন, যেগুলোর দ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনেই তাঁর সত্যতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল।

এ সকল প্রামাণিক বিষয়াদি এ কথারই গুরুত্বারোপ করে যে, ইয়াহূদীরা তাদের কিতাব তাওরাতের বিবরণ মতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে বিদ্যমান গুণাবলী সম্পর্কে মোটেও অনবহিত ছিল না; বরং তারা তো সেই যমানায় রাসুলের আবির্ভাবের অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিল। অতঃপর কালের আবর্তে দিনাতিপাত হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন। মদীনায় হিজরতের সূচনালগ্ন থেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাসাধ্য ইয়াহূদীদের নৈকট্য অর্জন বা নৈকট্যে আনয়নে সচেষ্ট ছিলেন। কারণ তারাও আসমানী কিতাবধারী। এ কারণে ইয়াহূদীদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়েও তিনি প্রত্যাশী ছিলেন।

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইয়াহূদীদের নৈকট্য কামনা শুধু জাগতিক প্রয়োজনের কিছু চুক্তি সম্পাদনের জন্য নয়; বরং এ নৈকট্য কামনা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর‘ঈ বিধানের বাস্তায়ন চেষ্টা। বিশেষতঃ ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু’টি বিধান ‘সালাত’ ও ‘সাওম’ পালনে মুসলিমদের সাথে তাদের সাদৃশ্যতা ছিল।

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদানী জীবনের প্রাথমিক দিনগুলো পর্যন্ত মুসলিমদের কিবলা ছিল ফিলিস্তিনে অবস্থিত ‘বাতুল মুক্কাদ্দাস’ যা হিজরতের পর একটানা ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত

‘তাফসীরুল কুরআনিল কারীম’, ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ তার রচিত অমর গ্রন্থ। অধিকতর জানতে দেখুন: ইবন তুগরী বুরদী রচিত আন-নুজুমুজ যাহেরাহ।

বিদ্যমান ছিল অথচ পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়াসহ ইয়াহূদীদেরও কিবলা ছিল এ ‘বাতুল মুক্কাদ্দাস’। আর ‘সিয়াম’ পালনে ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া বলতে আশুরা দিনের সাওম উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, এ দিনে ইয়াহূদী ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় সাওম পালন করে।

ইয়াহূদীরা এ বিষয়ে সম্যক অবগত ছিল যে, চলমান সময়ই হচ্ছে আখেরী যামানার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনের পূর্ব ঘোষিত সময় এবং তারা এ কথাও খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিল যে, এ মুহাম্মাদই হচ্ছেন সেই শেষ রাসূল যার সম্পর্কে তারা তাওরাতে জানতে পেরেছিল। কেননা শেষ রাসূল সম্পর্কে তাদের কিতাবে বর্ণিত সকল নিদর্শন ও সু-সংবাদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে সমন্বিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে খুব বিনম্র ও হৃদয়গ্রাহী আচরণ করতেন। এতো কিছুর পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ইয়াহূদীরা তাঁকে প্রত্যাখ্যানের কী কারণ থাকতে পারে?!

বাস্তবিক অবস্থা ছিল ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে মাত্র কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীকার করেছিল। বাকী বৃহৎ অংশ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁকে অস্বীকার করার ব্যাপারে একেবারে লজ্জাস্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের এহেন হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে ইয়াহূদীদের পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবন সালামের ইসলাম গ্রহণের সময় তাদের উদ্ভট আচরণ। যেমন,

ইয়াহূদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবন সালাম[52] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

52. আব্দুল্লাহ ইবন সালাম ইবন হারেস আল আনসারী। নবী ইউসুফ ইবন ইয়াকুব

ওয়াসাল্লামের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুদৃঢ় ধারনা লাভের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল,

«إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلا ثٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ» قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكَ عَدُوُّ اليَهُودِ مِنَ المَلا ئِكَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الوَلَدِ: فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ المَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا " قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلا مِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ اليَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ البَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلا مٍ» قَالُوا أَعْلَمُنَا، وَابْنُ أَعْلَمِنَا، وَأَخْيَرُنَا، وَابْنُ أَخْيَرِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ» قَالُوا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالُوا: شَرُّنَا، وَابْنُ شَرِّنَا، وَوَقَعُوا فِيهِ».

“আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই যার উত্তর নবী ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কী? আর সর্বপ্রথম খাবার কী, যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কী কারণে সন্তান তার পিতার সাদৃশ্য লাভ করে? আর কিসের কারণে (কোনো কোনো সময়) তার মামাদের সাদৃশ্য হয়? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

আলাইহিস সালাম-এর সন্তানদের একজন। তিনি আনসারগণের খুব ভালো মিত্র ছিলেন। জাহেলী যুগে তার নাম ছিল হুসাইন। অতঃপর তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। ৪৩ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। অধিকতর জানতে দেখুন: আল্লামা ইবন হাজার আসকালানীর আল এসাবাহ (৪৭২৫), আবু আসীরের আসাদুল গাবাহ (৩/১৭৬), আল ইসতি‘আব: (২/৩৮২)

ওয়াসাল্লাম বললেন, এইমাত্র জিবরীল আলাইহিস সালাম আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) তখন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, সে তো ফিরিশতাগণের মধ্যে ইয়াহূদীদের শত্রু। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো আগুন, যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হওয়ার রহস্য হলো পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্যের পূর্বে স্খলিত হয় তখন সন্তান তার সাদৃশ্যতা লাভ করে। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহূদীরা অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারী সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জেনে ফেলে, তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা রটনা করবে। তারপর ইয়াহূদীরা এলো এবং আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ঘরে প্রবেশ করলেন (লুকিয়ে গেলেন)। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন সালাম কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যাক্তির পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যাক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আব্দুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে, এতে তোমাদের অভিমত কী হবে? তারা বলল, এর থেকে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন। এমন সময় আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল, সে

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাক্তির সন্তান এবং তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয়ে গেল।”[53]

মূলত ইয়াহূদীদের এ ধরনের উদ্ভট আচরণের আসল কারণ ছিল কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই সরাসরি মহা সত্য থেকে প্রত্যাবর্তন করা। শুধুমাত্র মহা সত্যকে অস্বীকার করার জন্যই তাদের এ অস্বীকার।

প্রিয় পাঠক ইয়াহূদীদের এরূপ ঘটনার বিবরণ আমরা আরো দেখতে পাই যখন তাদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও জ্ঞানের গভীরতা যাচাই কার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করল এবং জবাব শোনার পর এগুলো যুক্তিহীন, তুচ্ছ ও অবান্তর প্রমাণ বলে বাহানা করল যেন রাসূলের সত্যতাকে স্বীকার করে নিতে না হয়। যেমন,

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَّ، عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَنِيهِ، إِذْ قَالُوا: اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، قَالَ: «هَاتُوا» قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ، قَالَ: «تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ» قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ، وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ قَالَ: «يَلْتَقِي الْمَاءَانِ، فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَتْ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ آنَثَتْ» قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: "كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَا، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلَائِمُهُ إِلَّا أَلْبَانَ كَذَا وَكَذَا - قَالَ أَبِي: "قَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي الْإِبِلَ «فَحَرَّمَ لُحُومَهَا»، قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ قَالَ: «مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ بِيَدِهِ - أَوْ فِي يَدِهِ - مِخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ، يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ، يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ» قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ: «صَوْتُهُ» قَالُوا: صَدَقْتَ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ

[53] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩১৫১ এবং কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস নং ৩৭২৩।

مِنْ نَبِيٍّ إِلا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالخَبَرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُكَ؟ قَالَ: «جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ» ، قَالُوا: جِبْرِيلُ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالحَرْبِ وَالقِتَالِ وَالعَذَابِ عَدُوُّنَا، لَوْ قُلْتَ: مِيكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالقَطْرِ، لَكَانَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ} [البقرة: ٩٧]».

“একবার কতক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলল, হে আবুল কাসিম, আমরা আপনাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করব। যদি আপনি সেসব বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করতে পারেন তাহলে আমরা বুঝে নিব যে, আপনি সত্য নবী এবং আমরা আপনার অনুসারী হয়ে যাব।

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে এমন অঙ্গীকার নিলেন যেমনটি নিয়ে ছিলেন ইসরাঈল (ইয়াকূব আলাইহিস সালাম) তার সন্তানদের থেকে। যখন বনী ইসরাঈল (ইয়াকূব পুত্রগণ) বলল: আমরা যা বলছি তার ওপর আল্লাহই সাক্ষী।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: প্রশ্ন করো।

তারা বলল: আমাদেরকে সত্য নবীর নিদর্শন সম্পর্কে বলুন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তার দু’চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।

তারা বলল: একজন মহিলা কীভাবে কন্যা ও পুত্র সন্তান জন্ম দেয়?

তিনি বললেন: স্বামী-স্ত্রীর পানি যখন এক সাথে মিলিত হয় আর যখন পুরুষের পানি স্ত্রীর পানির পূর্বে স্খলিত হয় তখন পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। আর যদি স্ত্রীর পানি পুরুষের পানির পূর্বে স্খলিত হয় তখন কন্য সন্তান জন্ম দেয়।

তারা বলল: আমাদেরকে বলুন যে, ইয়াকূব আলাইহিস সালাম নিজের জন্য

কী হারাম করেছিলেন?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তিনি عرق النسا (এক প্রকার বাথ) রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং এ জন্য তিনি অমুক প্রাণীর দুধ ছাড়া আর কিছুকে তিনি দোষতেন না। (আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ বলেন, আমার বাবা বলেছেন, তাদের অনেকে বলেন, অমুক বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটকে বুঝিয়েছেন।) তাই তিনি উটের গোশত নিজের জন্য হারাম করেছিলেন।

তারা বলল: আপনি সত্য বলেছেন।

অতঃপর তারা বলল: আমাদেরকে বলুন যে, الرعد (বজ্রপাত) কী? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর একজন ফিরিশতা যিনি মেঘমালা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তার হাতে আগুনের একটি ছড়ি থাকে, যা দিয়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশে মেঘমালোকে বিভিন্ন স্থানে তাড়িয়ে নিয়ে যান।

তারা বলল: যে শব্দটি শোনা যায় –তা কিসের শব্দ? তিনি বললেন সেই ছড়ির শব্দ।

তারা বলল: আপনি সত্য বলেছেন। আর একটি মাত্র প্রশ্ন বাকী আছে, এর উত্তর দিতে পারলেই আমরা আপনার হাতের বাই'আত হব আর তা হচ্ছে প্রত্যেক নবীর কাছেই বার্তাবাহক একজন ফিরিশতা আসেন, আপনার কাছে কোন ফিরিশতা আসেন?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: জিবরীল আলাইহিস সালাম।

তারা বলল: জিবরীল!!?? সে তো ঐ ফিরিশতা, যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শাস্তি নিয়ে আগমন করে। সে আমাদের শত্রু!! যদি আপনি বলতেন মিকাঈল যিনি রহমত, উদ্ভিদ ও বৃষ্টি অবতরণ করেন তাহলে ভালো হতো। তখন আল্লাহ

তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন:

﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبۡرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٧]

“যে জিবরীলের শত্রু” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৯৭][54]

ইয়াহূদ সম্প্রদায়ের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন পরিস্থিতির অবতারণার আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন সাফওয়ান ইবন আসসাল[55] রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। তিনি বলেন,

«قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فقال صاحبه لاتقل نبي إنه لو سمعك كان له أربعة أعين!!

فأتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألاه عن تسع آيات بينات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ لا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت.

قال: فقبلا يده ورجله، فقالا نشهد أنك نبي!!

قال: فما يمنعكم أن تتبعوني ؟

قالا : إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود».

“এক ইয়াহূদী তার এক সঙ্গীকে বলল, আমাকে এ নবীর কাছে নিয়ে চল। সঙ্গীটি বলল: নবী বলবে না। তিনি যদি তা শুনতে পান তবে তো তার চক্ষু (খুশীতে) আটখানা হয়ে পড়বে। তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো এবং তাঁকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

54. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৪৮৩; আল্লামা হাইশামী “মাজমা‘আয যাওয়ায়েদ” গ্রন্থেও এ হাদীসটি বর্ণনা করছেন, হাদীস নং ১৩৯০২।

55. সাফওয়ান ইবন আসসাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন।

করল। তিনি তাদের বললেন, আল্লাহর সঙ্গে কিছুর শরীক করবে না। চুরি করবে না, যিনা করবে না, যে প্রাণ হত্যা করা অল্লাহ্ হারাম করেছেন কোনো হক ব্যতিরেকে সে প্রাণকে হত্যা করবে না, হত্যার উদ্দেশ্যে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষতাসীনের কাছে নিয়ে যাবে না, যাদু টোনা করবে না, সুদ খাবে না, নিষ্পাপ মহিলাকে অপবাদ দিবে না, যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ ফিরায়ে পলায়ন করবে না। আর হে ইয়াহূদীগণ! বিশেষ করে তোমাদের জন্য কথা হলো, তোমরা শনিবারের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে না।

সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু’হাত ও দু’পায়ে চুম্বন করে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যই নবী। তিনি বললেন, তাহলে আমার অনুসরণ করতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে?

তারা বলল, নবী দাউদ আলাইহিস সালাম স্বীয় রবের কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, যেন তার বংশধরদের মাঝে নবী আসতে থাকে। মূলত আমরা ভয় পাচ্ছি যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি তাহলে ইয়াহূদী নেতৃবর্গ আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে।”[56]

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঐ দুই ইয়াহূদী নিজেদের জীবননাশের ভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করল। বস্তুত তখন সাধারণ ইয়াহূদীদের অবস্থাটা ছিল নিম্নরূপ:

কিছুসংখ্যক তীব্র বিদ্বেষের কারণে আর কথক নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য, বাকীরা স্বগোত্রীয় কর্তাদের দ্বারা নিজেদের প্রাণনাশের ভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের প্রতি

---

56. তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৩৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৭০৫।

মিথ্যারোপ করতো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সূচনা থেকে রাসূলের ব্যাপারে এমনটাই হলো ইয়াহূদীদের চিরাচরিত অবস্থান।

এ ক্ষেত্রে হুয়াই ইবন আখতাব কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণের ঘটনাটিকেও আমরা ভুলে যেতে পারি না। যার বিবরণ পেশ করতে গিয়ে সূফিয়া বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমার পিতা ও চাচার সন্তানদের মাঝে তাদের নিকট আমার চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র আর কেউই ছিল না। আমার বাবা-চাচাদের সাথে যখনই আমার সাক্ষাত হত এবং এতে আমি হর্ষোৎফুল্ল হতাম তখনই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাদ দিয়ে শুধু আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতো। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আমর ইবন আউফ-এর মহল্লা কুবাতে আসলেন তখন তারা দু'জনও (আমার বাবা-চাচা, আবু ইয়াইসর ইবন হুয়াই) অন্ধকারে চুপিসারে সালূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলো। আল্লাহর কসম! আমার বাপ-চাচারা কখনো সূর্য ডুবার আগে কখনো আমাদের কাছে আসতো না। সে দিনও তারা উদাসীন ও অলসভাবে ধীরপদে আমাদের কাছে আসল। আমি তাদের উপস্থিতি দেখে উৎফুল্ল হলাম যেমনটা আমি সব সময়ই হতাম। অতঃপর আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তাদের দু'জনের কেহই আমাকে এখনো দেখে নি। এমন্থাবস্থায় আমি শুনতে পেলাম যে, আমার চাচা আবু ইয়াসির আমার পিতাকে বলছে, এ মুহাম্মাদই কি সেই ব্যক্তি?! (যার সম্পের্ক তাওরাতে বিবরণ রয়েছে)

পিতা জবাবে বললেন, আল্লাহর শপথ! এ মুহাম্মদই সেই ব্যক্তি!!

চাচা বললেন, আপনি কি তার গুণাবলী এবং নিদর্শনসমূহ দ্বারা তাকে চিনেছেন?

পিতা বললেন, আল্লাহর শপথ! হ্যাঁ!!

চাচা বললেন, তাঁর ব্যাপারে আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত কী?

পিতা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তার শত্রুতা ও বিরোধিতাই আমার সিদ্ধান্ত।”[57]

এধরনের একরোখা ও বিদ্বেষমূলক পরিস্থিতির বদলা নেওয়ার মানসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?! নিজেকে স্বীকৃতি প্রদান বা স্বীয় দীনের ওপর ঈমান আনয়নের জন্য কি কারো ওপর জোড়জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করেছেন?

বরং বাস্তবচিত্র তো হলো ইসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়সমূহ স্বচ্ছ ও নির্মলভাবে সকলের সামনে প্রকাশিত হওয়ার পরও, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও বিশ্বস্থতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত -এ কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও অপরাপর সকলে জানা সত্বেও তিনি তাদের কোনো একজনকেও নিজের ওপর ঈমান আনতে ও তাঁকে সত্যায়ণ করতে বাধ্য করেন নি। অথচ তাঁর বল-প্রয়োগ করার মতো যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় ছিল এবং মুসলিমদের তরবারীসমূহ তাঁর একটি ইশারার অপেক্ষায় ছিল।

বস্তুত রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সেই মহান নীতির ওপর অটল ছিলেন, যে নীতির কোনো পরিবর্তন নেই। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত:

57. আল্লামা ইবন কাসীর প্রণিত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: (৩/২৩৭)

২৫৬]

ইয়াহূদী সম্প্রদায় শুধু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীকার না করা বা মেনে না নেওয়াতেই কি সীমাবদ্ধ থেকেছে?! না, রবং বাস্তবিক প্রেক্ষাপট ছিল সম্পর্ণ তার ব্যতিক্রম। কেননা তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ও শত্রুতামূলক অবস্থান গ্রহণ করে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও তাঁর ওপর অবতীর্ণ কুরআনের ওপর নানা রকম উদ্ভট সন্দেহমূলক মন্তব্য চড়াতে থাকে এবং সাধারণ মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর জন্যে বিভিন্ন রকম চক্রান্ত ও কটকৌশল শুরু করে।

শুধু তাই নয়, এর চেয়েও কৌতুহলোদ্দীপক কথা হচ্ছে এ যে, ইয়াহূদীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মদীনার অলিতে-গলিতে বিচরণ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে সাধারণ মানুষের মাঝে এ মর্মে সাবধান বাণী প্রচার করতে লাগল যে, এ ব্যক্তি সেই রাসূল নয়, যার বিবরণ তাদের তাওরাত গ্রন্থে রয়েছে। অথচ ইতোপূর্বে এরাই লোকদেরকে এ রাসূলের আগমনের সু-সংবাদ প্রদান করতো। এমনকি বিখ্যাত সাহাবী মা‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তো একবার ইয়াহূদীদের সম্বোধন করে বললেন, ‘হে ইয়াহূদী যুবকগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর’ কেননা আমরা শির্ক-এ নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় তোমরা যখন ইয়াহূদী পণ্ডিতগণকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পের্ক জিজ্ঞাসা করতে তখন তারা আমাদেরকে এ মর্মে অবহিত করতো যে, তিনি অতিসত্বর প্রেরিত হবেন এবং আমাদের সামনে প্রেরিতব্য রাসূলের সেই নিদর্শন ও গুণাবলী উপস্থাপন করতো, যেগুলো এ (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে!! তখন ইয়াহূদী পণ্ডিত সালাম ইবন মাশকাম তার জবাবে বললো, এ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে কোনো কিছু নিয়ে প্রেরিত হয় নি, আমরা তাকে চিনি, মূলত সে ঐ রাসূলই নয়, যার ব্যাপারে আমরা তোমাদেরক অবহিত করতাম।

অতঃপর এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন,[58]

﴿وَلَمَّا جَآءَهُمۡ كِتَٰبٌ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمۡ وَكَانُواْ مِن قَبۡلُ يَسۡتَفۡتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦۚ فَلَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٨٩﴾ [البقرة: ٨٩]

“আর যখন তাদের কাছে, তাদের সাথে যা আছে, আল্লাহরপক্ষ থেকে তার সত্যায়নকারী কিতাব এলো আর তারা (এর মাধ্যমে) পূর্বে কাফিরদের ওপর বিজয় কামনা করত। সুতরাং যখন তাদের নিকট এলো যা তারা চিনত, তখন তারা তা অস্বীকার করল। অতএব, কাফিরদের ওপর আল্লাহর লা‘নত।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮৯]

অনুরূপভাবে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণের পথ হিসেবে আরো নানান প্রকার ঘৃন্যতম পরিকল্পনা গ্রহণ করল যেগুলোর নেতৃত্বে থাকতো আব্দুল্লাহ ইবন ছাঈফ, আদী ইবন যায়েদ ও হারিস ইবন আওফ-এর মতো শীর্ষ পর্যায়ের ইয়াহূদী ব্যক্তিবর্গ। তারা বলত, চল আমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর সকালে ঈমান আনি অতঃপর সন্ধ্যায় তা অস্বীকার করি, যাতে তাদের দীনের ওপর আমরা একটি আবরণী এঁকে দিতে পারি। তাহলে আশা করি (তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছে) তারাও বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের মতো কাজ করবে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দীন থেকে ফিরে

58. আল্লামা ইবন হিশামের আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ (২/৯১), তাফসীরে ইবন কাসীর (১/১৮৫), আল্লামা সুয়ুতী রহ.-এর আদ-দুররুল মানছুর (১/২১৭)।

আসবে। তাদের এহেন অপকৌশলের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন,[59]

﴿وَقَالَت طَّآئِفَةٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجۡهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٧٢ وَلَا تُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمۡ قُلۡ إِنَّ ٱلۡهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤۡتَىٰٓ أَحَدٞ مِّثۡلَ مَآ أُوتِيتُمۡ أَوۡ يُحَآجُّوكُمۡ عِندَ رَبِّكُمۡۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٧٣﴾ [ال عمران: ٧٢، ٧٣]

"আর কিতাবীদের একদল বলে, মুনিদের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার প্রতি দিনের প্রথমভাগে ঈমান আন আর শেষ ভাগে তা অস্বীকার কর, যাতে তারা ফিরে আসে।

আর তোমরা কেবল তাদেরকে বিশ্বাস কর, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে। বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত। এটা এ জন্য যে, কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হবে যেরূপ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। অথবা তারা তোমাদের রবের নিকট তোমাদের সাথে বিতর্ক করব'। বল, নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে চান, তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭২-৭৩]

ইয়াহূদীদের অপতৎপরতার আরেকটি উদারহরণ হচ্ছে মদীনায় আনসারদের মাঝে পরস্পরে কলহ-বিবাদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে তারা বিভিন্ন চক্রান্তের অপচেষ্টা চালাত। কট্টর মুসলিম বিরোধী ইয়াহূদী শাশ ইবন কায়েস[60] তো

---

[59]. আল্লামা ইবন হিশামের আস-সীরাতুন্নবিয়্যাহ (২/৯১), তাফসীরে ইবন কাসীর (১/৪৯৬), আল্লামা কুরতুবী রহ.-এর 'আল-জামেঈ লি আহকামিল কুরআন (৪/১১০)।

[60] শাশ ইবন কায়েস। সে ছিল হিংসুটে ও চরম মুসলিম বিদ্বেষী এক ইয়াহুদী। সে মদীনার আনসার থেকে আওস ও খাযরাজ গোত্রে কলহ-বিবাদ সৃষ্টিতে সদা ব্যস্ত থাকত। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন,

﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ تَبۡغُونَهَا عِوَجٗا ﴾ [ال عمران: ٩٩]

"বল, 'হে আহলে কিতাব, তোমরা কেন আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিচ্ছ তাদেরকে, যারা

সদা আওস এবং খাযরাজ গোত্রের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছড়াতেই ব্যস্ত থাকত। এ ঘটনাটি আল্লামা ইবন হিশাম তার সীরাত গ্রন্থে ইবন ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[61]

অতঃপর ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করতে করতে পূর্বোক্ত সকল অপকৌশলের সীমা অতিক্রম করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ওপর জঘন্য ও লজ্জাষ্কর মন্তব্যারোপ করা শুরু করল। তারা বলতে লাগল, 'আল্লাহ হত-দরিদ্র অথচ আমরা ধনবান'। তাদের এহেন ঘৃন্য মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে বললেন,

﴿لَّقَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٞ وَنَحۡنُ أَغۡنِيَآءُۘ سَنَكۡتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتۡلَهُمُ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّٖ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ ١٨١﴾ [ال عمران: ١٨١]

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী'। অচিরেই আমি লিখে রাখব তারা যা বলেছে এবং নবীদেরকে তাদের অন্যায়ভাবে হত্যার বিষয়টিও এবং আমি বলব, 'তোমরা উত্তপ্ত 'আযাব আস্বাদন কর।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮১]

এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আবু ইসহাকের সূত্রে ইবন হিশামের সীরাত গ্রন্থে[62] আলোচিত হয়েছে। অনুরূপ অন্য গ্রন্থেও[63] এর বিবরণ রয়েছে।

প্রিয় পাঠক! ইয়াহূদীদের জিজ্ঞাসা সুলভ মানসিকতার এখানেই শেষ নয়; বরং আরো একধাপ এগিয়ে (যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা-র

ঈমান এনেছে? তোমরা তাতে বক্রতা অনুসন্ধান কর।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৯]

61. আল্লামা ইবন হিশামের 'আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ' (২/৯৫)।

62. আল্লামা ইবন হিশামের 'আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ' (২/৯৮)।

63. যেমন, আল্লামা ইবন কাসীর রহ.-এর 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম' (১/৫৭৫)।

ভিত্তিতে[64]) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকৃতি ও তাঁর ওপর মিথ্যারোপ করাকে আরো তরান্বিত করতে নবী সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের-এর নবুয়তকেও জোরপূর্বক মিথ্যারোপ করে বসল। (কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নবী বলে মানেন) অথচ সুলইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাদশাহী ও নবুওয়াতী একত্রে প্রাপ্ত হওয়ার কারণে ইয়াহূদীদের মতেও শ্রেষ্ঠতম নবী হিসেবে গণ্য হতেন। তারা দাবী করে বসল যে, সুলাইমান তো নবী নন; বরং একজন যাদুকর ছিল। যেমন কথক ইয়াহূদী পণ্ডিত বলে, "তোমরা কি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ ধারনার ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর না যে, সে মনে করে সুলাইমান একজন নবী ছিল। আল্লাহর শপথ সুলাইমান তো যাদুকর বৈ কিছুই ছিল না।"[65]

তাদের এ জঘন্য মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ﴾ [البقرة: ١٠٢]

"আর সুলাইমান কুফুরী করে নি; বরং শয়তানরা কুফুরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২]

রাসূলের বিরোধিতায় এমন ধরনের নৃশংসতায়ও ইয়াহূদীদের মনের ঝাল মিঠে নি; বরং আরো ঘৃণ্যতম অপকর্মে তারা জড়িত হয়েছে। তারা মুশরিক এবং মূর্তিপূজকদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী মুসলিমগণের ওপর মর্যাদায় অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন,

---

64. অনুবাদক।

65. আল্লামা ইবন হিশামের 'আস-সীরাতুননববিয়্যাহ' (৩/৮০)।

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَٰٓؤُلَآءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ٥١﴾ [النساء: ٥١]

"তুমি কি তাদেরকে দেখ নি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছে? তারা জিবত[66] ও তাগুতের প্রতি ঈমান আনে এবং কাফিরদেরকে বলে, এরা মুমিনদের তুলনায় অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫১]

ইয়াহূদীদের এতসব অপতৎপরতা ও চক্রান্ত বিস্তারের পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসকি হেসে তাদের সাথে সামাজিক আচার সম্পাদক করতেন। তাদের অস্থিত্বকেও তিনি অস্বীকার করতেন না। তারা আহলে কিতাব হওয়া এবং তাদের স্বীকৃতিতেও তিনি নেতিবাচক মানসিকতা পোষন করতেন না।

প্রিয় সূধী মহল! এমনটাই হলো অন্যদের ক্ষেত্রে মহান শাশ্বত ধর্ম ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামের ক্ষেত্রে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি। যাতে আপনার নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের মধ্যকার ফাঁকা সদৃশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে!!

মুসলিমদেরকে স্বীকৃতি প্রদানে খ্রিস্টানদের অবস্থান:

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বীকৃতি প্রদান প্রশ্নে খ্রিস্টানদের মানসিকতায়ও ইয়াহূদীদের থেকে ভালো কোনো অবস্থান ছিল না। তবে হ্যাঁ! খৃস্টানদের বিরোদ্ধাচারণে ইয়াহূদীদের মতো এতো জঘন্য কোনো চক্রান্ত ছিল না। ইয়াহূদীদের থেকে যেমন ঘৃণ্যতম ঈর্ষা, প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে খ্রিস্টানদের বেলায় তা এতো জটিল ছিল না। তথাপি সর্বোপরি হতাশাব্যাঞ্জক কথা একটাই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে খ্রিস্টানদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তারা সেভাবে রাসূলকে মেনে নিতে বা স্বীকৃতি দিতে পারে নি।

66. জিবত (الجبت) অর্থ মূর্তি, প্রতিমা, যাদুকর, ভেলকিবাজ, যাদু, ভেলকি ইত্যাদি।

ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখেত পেয়েছি যে, খ্রিস্টান রাজা রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সে জ্ঞাত হলো এবং সে এমন সব বিষয়াদী অবহিত হলো যার দরুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের কোনো অবকাশই থাকে না। শুধু তাই নয় বরং হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পের্ক এক আশচর্যজনক মন্তব্য করল। আবু সুফিয়ান[67] রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে দীর্ঘ কথোপকথনের পর হিরাক্লিয়াস তাকে বলল, 'তুমি ঐ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্বন্ধে যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে অতি সত্বর সে আমার দু'পা রাখার স্থানটুকুরও মালিক হবে অথচ আমি জানতাম যে, শেষ নবী কুরাইশের বাইরে থেকে হবেন এবং আমি এ ধারনাও করতাম না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে হবেন। যদি আমি এ কথা জানেত পারি যে, তাঁর কাছে গেলে মুক্তি পাব, তাহলে তাঁর সাক্ষাতপ্রাপ্ত হবার জন্য সকল কষ্ট সহ্য করে নিতাম এবং তার দর্শন পেলে আমি তার পা ধুয়ে দিতাম'। (উত্তম সেবা করতাম)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ব্যাপারে এমন সু-উচ্চ ধারনা এবং মহান মর্যাদা দানের পরও হিরাক্লিয়াসের অবস্থান কী ছিল?!

---

67. আবু সুফিয়ান সখর ইবন হারব ইবন উমাইয়াহ আল-কুরাইশী আল-উমওয়ী। তিন মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করনে। হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মালে গনিমত থেকে অংশ দিয়েছেন। তিনি তায়েফের যুদ্ধেও অংশগ্রহন করেছেন তখন তীরের আঘাতে তার এক চোখে হারান, তারপর ইয়ামুকের যুদ্ধেও অংশ করলে অপর চোখটিও হারান। অধিকতর জানতে দেখুন: ইবন আব্দুল বার-এর আল ইসতিয়াব (২/২৭০), ইবনুল আসীরের 'আসাদুল গাবাহ' (২/৪০৭), ইবন হাজারের 'আল-ইসাবাহ' (৪০৪৫)

সে কি পেরেছিল ইসলামকে মেনে নিতে?!

বাস্তবতা হচ্ছে, এ রোম সম্রাটই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর বিরুদ্ধে ও পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। মুতা ও তাবুকে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রোমান সৈন্য প্রেরণ করেছে। আরব উপ-দ্বীপের খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলোকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর ধারাবাহিকভাবে কয়েক বছর একটানা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে।

আরেক খ্রিস্টান -মিসরের কিবতী সম্প্রদায়ের নেতা মুক্বাওক্বিসের অবস্থানও হিরাক্লিয়াস থেকে খুব ভিন্নতর কিছু ছিল না। কেননা সে এমন এক ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এমন সব কথা বলত, যাতে রাসূলকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছে বলে অনুমিত হতো। শুধু তাই নয় বরং সে হাতিব ইবন আবী বালতা'আহ[68]এর মাধ্যেম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করেছে। এত কিছুর পরও যখন ইসলামী সৈন্য মিসরের সীমানায় প্রবেশ করল তখন সে রোমানদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলিমদেরকে প্রতিরোধ ও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অবস্থান গ্রহণ করলো। অথচ এ মুক্বাওকিসই মিসরের দখলদারিত্ব থেকে রোমানদেরকে উৎখাত করেছে। যা পরবর্তী ছয়শত বছর

---

68. হাতিব ইবন আবী বালতা'আহ আল-লাখমী, বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশ নিয়েছেন। মাত্র ৩০বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ কুরআনের আয়াত দ্বারা তার ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ﴾ [الممتحنة: ١]

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না" হারান। অধিকতর জানতে দেখুন: ইবন্ আব্দুল বার এর আল ইসতিয়াব (১/৩৮৪), ইবনুল আসীরের 'আসাদুল গাবাহ' (১/৪৯১)।

পর্যন্ত কার্যকর ছিল!!

নাজরানের খ্রিস্টানদের অবস্থা তো সর্বজনবিধিত বরং; তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থানের সাক্ষী। কেননা তারা খুব ভালো করেই জানত যে, তিনিই প্রেরিত শেষ নবী। খ্রিস্টান দলপতিগণ যখন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অভিসম্পাতের আহ্বান করত, তখন তারা এ ভয়ে তা করা থেকে বিরত থাকত যে, এমনটি করলে আল্লাহর 'আযাব বর্ষিত হবে। তথাপী তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও তাঁর দীনকে মেনে নেয় নি!!

মুশিরকদের অবস্থান:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্বীকৃতি প্রদানে মুশরিকদের ভূমিকার ব্যাখ্যা বা বর্ণনায় মূলত নতুন করে বলার কিছু নেই। কেননা দীর্ঘসময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে নিরাপদ সহাবস্থানের পরও তারা তাঁকে স্বীকার করে নিতে পুরোপুরী অস্বীকার করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি মুশরিকদের বিরূপ আচরণের প্রভাব নিয়ে শত-সহস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এমনকি যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করলেন তখনো তিনি মদীনার মুশরিকদের সাথে অতীব বিনম্র আচরণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কারো ওপর কোনো ধরনের বল-প্রয়োগ করেন নি; বরং তিনি বিনম্র ব্যবহার করে তাদরকে কাছে টানতে চাইতেন। অথচ মুশরিকরা সর্বদা তাঁর বিরোধিতা করে গিয়েছে।

এ বিষয়ের প্রামাণিকতার জন্যে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ ঘটনার চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাই না যে ঘটনায় তিনি এমন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে মুসলিম, মুশরিক, মূর্তিপূজক ও ইয়াহূদীরা সম্মিলিত হয়েছে.................ইমাম বুখারী উসামা

ইবন যায়েদ[69]-এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

“একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি গাধার উপর সাওয়ার হলেন, যার জিনের নিচে ফাদাকের তৈরি একখানি চাদর ছিল। তিনি উসামা ইবন যায়দকে নিজের পেছনে বসিয়ে ছিলেন। তখন তিনি হারিস ইবন খাযরাজ গোত্রের সা‘দ ইবন উবাদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

69. উসামা ইবন যায়েদ ইবন হারেস, মাত্র আট বছর বয়সে মুসলিম সৈন্যদের সাথী হয়েছে। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাতে খুব আদর করতেন এমনকি কোনো বস্তু প্রদানে নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ থেকেও উসামাকে প্রাধান্য দিতেন। খলীফা উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর হত্যার পর যখন ফেতনা ছড়িয়ে পরল তখন তিনি তা দমন করেন। ৫৮/৫৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। অধিকতর জানতে দেখুন: ইবন আব্দুল বার-এর ‘আল-ইসতিয়াব’ (১/১৭০), ইবনুল আসীরের ‘আসাদুল গাবাহ’ (১/৯১), ইবন হাজারের ‘আল-ইসাবাহ’ (৮৯)।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখাশোনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। তিনি এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে মুসলিম, মুশরিক, ইয়াহূদী ও প্রতিমাপূজক সবাই ছিল। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুলও ছিল। আর এ মজলিসে আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও উপস্থিত ছিলেন। যখন সাওয়ারীর পদাঘাতে উড়ন্ত ধূলাবালী মজলিসকে ঢেকে ফেলছিল তখন আব্দুল্লাহ ইবন উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকল। তারপর বলল, তোমরা আমাদের উপর ধুলাবালু উড়িওনা। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সালাম দিলেন। তারপর এখানে থামলেন ও সাওয়ারী থেকে নেমে তাদের আল্লাহর প্রতি আহ্বান করলেন এবং তাদের কাছে কুরআন পাঠ করলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল বলল, হে আগত ব্যাক্তি! আপনার এ কথার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই? তবে আপনি যা বলছেন, যদিও তা সত্য, তবুও আপনি আমাদের মজলিসে এসব বলে আমাদের বিরক্ত করবেন না। আপনি আপনার নিজ ঠিকানায় ফিরে যান। এরপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ আপনার নিকট গেলে তাকে এসব কথা বলবেন। তখন ইবন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন, আমরা এসব কথা পছন্দ করি। তখন মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহূদীদের মধ্যে পরস্পর গালাগালি শুরু হলো। এমনকি তারা একে অন্যের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি তার সাওয়ারীতে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন এবং সা'দ ইবন উবাদার কাছে পৌঁছলেন। তারপর তিনি বললেন হে সা'দ! আবু তুরাব অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবন উবাই কি বলেছে, তা কি তুমি শুন নি? সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, সে এমন কথাবার্তা বলেছে। তিনি আরো বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) আপনি তাকে মাফ করে দিন। আর তার কথা ছেড়ে দিন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে সব নি'আমত দান করার ছিল তা সবই দান করেছেন। পক্ষান্তরে এ শহরের[70] অধিবাসীরা তো পরামর্শ করে সিধান্ত নিয়েছিল যে, তারা তাকে রাজ মুকুট পরাবে। আর তার মাথায় রাজকীয় পাগড়ী বেধে দিবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে দীনে হক দান করেছেন, তা দিয়ে তিনি তাদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে সে (ক্ষোভানলে) জ্বলছে এজন্যই সে আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তা আপনি নিজেই প্রত্যাক্ষ করেছেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাফ করে দিলেন।"[71]

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের ইতিবাচক অবস্থান ও তার বিরোধীদের এতোসব নেতিবাচক অবস্থানের পরও কি কেহ এ কথা দাবী করেত পারে যে, মুসলিমরা অন্যদের সামাজিক স্বীকৃতি দেয় না?!

ভিন্ন সম্পদায়কে সামাজিক স্বীকৃতি ইসলামী মূলবোধের একটি মৌলিক বিষয়। ইসলাম কখনই কোনো অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত করণে বল-প্রয়োগ করাকে বৈধতা দেয় না। সে জন্যেই বিশ্বময় আমাদের উদাত্ত আহ্বানের অন্যতম একিট হচ্ছে এ যে, এ শাশ্বত বিধানে কোনো অপবাদ দেওয়ার আগে ইসলামকে তার সঠিক ও বিশুদ্ধ উৎসমূল থেকে অধ্যয়ন করুন। তাহলেই আপনার মনের সকল কালিমা দূর হয়ে যাবে।

---

70. মদীনার অধিবাসিরা। ইবন হাজার আসকালানী রহ.-এর 'ফাতহুল বারী' (৮/২৩২)

71. সহীহ বুখারী, (অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, মুসলিম ও মুশরিকের যৌথ মজলিসে সালামের পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৫৮৯৯; সহীহ মুসলিম (ইতিহাস ও জিহাদ অধ্যায়, মুনাফিকদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আ পরিচ্ছেদ) হাদীস নং ১৭৯৮।

উপরের কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করার পর এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ভিন্ন সম্প্রদায় ও তাঁর বিরোধীদেরকে শুধু সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন?! না, বরং তিনি এ সকল স্তর অতিক্রম করে আরো অনেক অনে-ক অনে-ক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন।

সামনের অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদরেকে শুধু স্বীকৃতি দান নয়; বরং অমুসলিমদেরকে সম্মানপ্রদর্শন ও তাদেরকে যথোপযুক্ত মর্যাদার আসনে সমাসীনও করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়:

অমুসলিমদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান প্রদর্শন

কখনো দেখা যায় যে, কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করে ঠিকই কিন্তু তাদেরকে সম্মান ও মূল্যায়ন করে না। যেমন, আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইউরোপীয়দেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের হোটেল-রেস্তোরা কিংবা বাসা-বাড়িতে এ ধরণের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখত – ‘কুকুর ও ইয়াহূদীদের প্রবেশ নিষেধ’। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ইরোপীয় খ্রিস্টানরা ইয়াহূদীদেরেকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকার করে এমনকি তাদের ইনজিলেও ইয়াহূদীদের বিস্তর আলোচনা রয়েছে। তবে তাদেরকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনোভাবেই নূন্যতম সম্মানটুকুও দিতে চায় না এবং তাদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করে বরং তারা প্রাণি হিসেবে কুকুরের সাথে যেসব সহমর্মিতামূলক আচরণ করে ইহুদীদের সাথে তাও করে না। অনুরূপ আচরণ করে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের সাথেও। এমনকি তারাও নিজেদের বাসা-বাড়ির গেইটে লিখে রাখত ‘কুকুর ও নিগ্রোদের প্রবেশ নিষেধ’। এটি মানবতা বিবর্জিত

বিকৃত চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ, যা একজন মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রাপ্য মূল্যায়ন ও অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে রাখে। কিন্তু ইসলাম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করে। ইসলাম যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে শুধু স্বীকৃতিই দেয় না; বরং তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে সমাসীনও করে এ অধ্যায়ে আমরা সে কথাই আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ। এ অধ্যায়কে আমরা চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত করবো:

প্রথম পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদের সাথে কথোপকথনের মাধুর্য্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বানের নববী পদ্ধতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: অমুলিমদের প্রশংসা করা প্রসঙ্গে।

চতুর্থা পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদের দূত ও প্রতিনিধিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নববী প্রটোকল।

প্রথম পরিচ্ছেদ:
অমুসলিমদের সাথে কথোপকথনের মাধুর্য্য

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অমুসলিমদের সাথে আচার-আচরণের আদর্শিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, অমুসলিমদেরকে শুধুমাত্র স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়; বরং তাদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনও করতে হবে। আর এটা তিনি আল্লাহর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ইশারা ছাড়া শুধু ব্যক্তিগত চিন্তা থেকেই করেন নি; বরং তাঁর এ শিক্ষা পবিত্র কুরআনেরই প্রতিধ্বনি। পবিত্র কুরআনে অমুসলিমদের সাথে কথোপকথনের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ قُلِ ٱللَّهُۖ وَإِنَّآ أَوۡ إِيَّاكُمۡ لَعَلَىٰ هُدًى أَوۡ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢٤ قُل لَّا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّآ أَجۡرَمۡنَا وَلَا نُسۡـَٔلُ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٢٥ قُلۡ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفۡتَحُ بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَهُوَ ٱلۡفَتَّاحُ ٱلۡعَلِيمُ ٢٦﴾ [سبا: ٢٤، ٢٦]

“বল, ‘আসমানসমূহ ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেন? বল, ‘আল্লাহ’, আর নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত। বল, ‘আমরা যে অপরাধ করছি সে ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে না’। বল, ‘আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সম্যক পরিজ্ঞাত’।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২৪-২৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই সত্য ও হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন তথাপিও আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে অমুসলিমদের সাথে এভাবে কথা বলতে আদেশ দিয়েছেন যে,

﴿وَإِنَّآ أَوۡ إِيَّاكُمۡ لَعَلَىٰ هُدًى أَوۡ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢٤﴾ [سبا: ٢٤]

“নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২৪]

এটি তো ঐ দুই প্রতিপক্ষের কথোপকথনের পদ্ধতি যাদের মধ্য হতে কোনো এক পক্ষের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সু-নিশ্চিত নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ পদ্ধতিতে কথা বলতে আদেশ করা হয়েছে। এটি ইসলামের উন্নত চরিত্র, চূড়ান্ত সভ্যতা ও কথোপকথনের সর্বোত্তম আদর্শিক পন্থা নির্ধারণ বৈ কিছুই নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা অমুসলমেদেরকে পূর্ণ ভদ্রতা বজায় রেখে সম্বোধন করার আদেশ দিয়ে বলেন,

﴿قُل لَّا تُسۡ لُونَ عَمَّآ أَجۡرَمۡنَا وَلَا نُسۡ لُ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٢٥﴾ [سبا: ٢٥]

“আমরা যে অপরাধ করছি সে ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে না।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২৫]

এ আয়াতে (جرم) তথা ‘অপরাধ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে মুসলিমদের বেলায়। বলা হয়েছে- ‘আমরা যদি অপরাধ করে খাকি তাহলে সেজন্য তোমরা জিজ্ঞেসিত হবেন না’। আর অমুসলিমদের বেলায় ব্যবহৃত হয়েছে (عمل) তথা ‘কাজ’ শব্দটি। বলা হয়েছে- ‘আর তোমরা যে সমস্ত কাজ করছ সেজন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হব না। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিসাব-নিকাসের পূর্ণ দায়িত্ব আল্লাহর দিকে সমর্পিত করে দেওয়ার কথাটি নিজ ভাষায় বলেছেন এভাবে যে, “নিশ্চই আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামত দিবসে আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং সত্যের পক্ষে ফায়সালা দিয়ে দেবেন, তখন আমরা জানতে পারব- কে সঠিক পথে ছিল আর কে ভুল করেছিল”।

এটিই হলো পারস্পারিক কথোপকথনের সর্বোৎকৃষ্ট হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি যেখানে পক্ষপাতমূলক চিন্তা কিংবা রূঢ়তা ও কঠোরতার লেশ মাত্রও নেই। যেখানে রয়েছে প্রতিপক্ষকে যথাযথ মূল্যায়ন ও পূর্ণ ভদ্রতা প্রকাশের বাস্তব প্রতিফলন। এমনিভাবে আহলে কিতাবদের সাথে কথোপকথনের পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ٤٦﴾ [العنكبوت: ٤٦]

"আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া যারা যুলুম করেছে। আর তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তারই সমীপে আত্মসমর্পানকারী।" [সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত: ৪৬]

বাহ! কি চমৎকার পদ্ধতি! আমাদেরকে আহলে কিতাবদের সাথে কেবল সুন্দর ও উত্তম পন্থায় কথোপকথনের জন্যই বলা হয় নি; বরং অতি সুন্দর, অতি উত্তম ও অতি উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে কথা বলার আদেশ দেওয়া হয়েছে। পৃথীবির কোনো দর্শন কিংবা মতোবাদে কী এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে যা এ ধরণের অনুপম চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ধারে-কাছেও যেতে পারে? আরো লক্ষ্য করুন, প্রতিপক্ষের মন নরম করা ও অন্তর গলানোর মতো সম্বোধন দেখুন,

﴿وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ٤٦﴾ [العنكبوت: ٤٦]

"আর তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং

আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তারই সমীপে আত্মসমর্পানকারী।” [সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ৪৬]

এ ধরণের সম্বোধন আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের মনে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ

ভুলে গিয়ে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির মনোভাব জাগিয়ে তোলে। তারা এভাবে চিন্তা করার অবকাশ পায় যে, আমাদের উভয়ের ইলাহ এক ও অদ্বিতীয়। আমাদের ওপরও কিতাব নাযিল হয়েছে তাদের ওপরও কিতাব নাযিল হয়েছে। তারা উভয় কিতাবকে বিশ্বাসও করে। তাহলে আর অনৈক্য বা বিরোধ কিসের?

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পবিত্র কুরআনে এ ধরণের আয়াতের মহা সম্ভার বিদ্যমান রয়েছে। দেখুন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡ‍ٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ٦٤﴾ [ال عمران: ٦٤]

“বলুন, ‘হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি। আর তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ না করি’। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬৪]

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٠٩﴾ [البقرة: ١٠٩]

“আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর

কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারতো! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে হিংসাবশত (তারা এরূপ করে থাকে)। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, যতক্ষন না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০৯]

এ ছোট্ট পরিসরে এ জাতীয় সকল আয়াত উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এ গ্রন্থের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ জাতীয় কতিপয় আয়াতকে এবং এ বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনাবলীকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে প্রক্ষেপন করা, যাতে আমাদের সামনে অমুসলিমদের সাথে তাঁর আচরণ-বিধি ও অমুসলিমদের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাক্যালাপের সৌন্দর্য্যসমূহের মধ্যে আরেকটি হলো প্রতিপক্ষের কথা যত মিথ্যা, অশ্লীল, অবাস্তব ও কষ্টদায়কই হোক না কেন তিনি তা ধৈর্য সহকারে শুনতেন এবং প্রতিপক্ষের কথা বলার সময় পূর্ণ নিরব থাকতেন। নিম্মোক্ত কথোপকথনটি লক্ষ্য করুন। এখানে কুরাইশ নেতা উতবাহ ইবন রবী‘আহ’র[72] সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ আলাপচারিতার বিবরণ রয়েছে।

উতবাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম থেকে সরে

72. উতবাহ ইবন রাবী‘আহ। কুরাইশদের অনেক বড় নেতা ছিল। তার কারণেই ‘হরবুল ফুজ্জার’ বন্ধ হয়েছিল। তবে সে মুসলিম হয় নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং সাহাবায়ে কেরামকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে অনেক প্রহার করেছিল। ফলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর গোত্র ‘বনু তাইম’-এর লোকেরা বলেছিল, আল্লাহর শপথ! যদি আবু বকর এ প্রহারের কারণে মারা যায় তাহলে অবশ্যই আমরা উতবাহ ইবন রবী‘আহকে হত্যা করবো। কাফের অবস্থায় নিজ ছেলে ওয়ালীদসহ বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

আসার জন্য অত্যন্ত মনোযোগসহ বুঝাচ্ছিল, সে বলছে: হে ভাতিজা! আমাদের মাঝে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে তোমার মর্যাদা ও সম্মানের কথা তো তোমার জানা আছে। কিন্তু নিশ্চই তুমি অনেক বড় বিষয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছো। তুমি আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করছো। তোমার অনুসারীদেরকে তুমি জান্নাত-জাহান্নামের মিথ্যা স্বপ্ন দেখাচ্ছ। তুমি আমাদের দেব-দেবি ও ধর্মের নিন্দাবাদ করে বেড়াচ্ছ। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে গাল-মন্দ করছ। আমি তোমার নিকট কয়েকটি বিষয় পেশ করছি, তুমি মনোযোগসহ শুন যাতে তন্মধ্য কোনো একটাকে বেছে নিতে পার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলুন, হে আবুল ওয়ালীদ! আমি শুনছি ওতবা বলল: ভাতিজা! তুমি এটা বলো যে, শেষ পর্যান্ত তুমি চাও কী? তুমি কি মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী হতে চাও? তাহলে আমরা বহু ধন-সম্পদ এনে তোমার সামনে স্তুপ করে দেব। নাকি তুমি সম্মান চাও? তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে এমনভাবে সম্মান প্রদর্শন করবো যে, তোমাকে ছাড়া আমাদের কোনো সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হবে না। নাকি তুমি মক্কার রাজত্ব চাও? তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দেব। নাকি এসব কিছু তুমি স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে করছ না বরং তোমার নিকট যে অদৃশ্য আগন্তুক আসে সে জিন্ন এবং তার হাত থেকে আত্মরক্ষায় তুমি যদি অক্ষম হয়ে থাক তাহলে বলো, আমরা আমাদের টাকা-পয়সা ব্যয় করে চিকিৎসা করে তোমাকে সুস্থ করে তুলব। কেননা, অনেক সময় অনুসঙ্গী তার মূল ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য লাভ করে, ফলে চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়। এতক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উতবার কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। তার কথা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনার বক্তব্য কি শেষ হয়েছে? সে বলল: হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, শুনছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে শুরু কলেন,

﴿حمٓ ١ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٢ كِتَٰبٌ فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥ قُرۡءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوۡمٍ يَعۡلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعۡرَضَ أَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ٤ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقۡرٌ وَمِنۢ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٌ فَٱعۡمَلۡ إِنَّنَا عَٰمِلُونَ ٥﴾ [فصلت: ١، ٥]

“হা-মীম। (এ গ্রন্থ) পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলো জ্ঞানী কওমের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনরূপে, আরবী ভাষায়, সুসংবাদদাতা ও সতর্কাকারী হিসেবে। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতএব, তারা শুনবে না। আর তারা বলে, ‘তুমি আমাদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত, আমাদের কানের মধ্যে রয়েছে বধিরতা আর তোমার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে অন্তরায়। অতএব, তুমি (তোমার) কাজ কর, নিশ্চয় আমরা (আমাদের) কাজ করব।” [সূরা ফুসসিলা ত, আয়াত: ১-৫]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েই যাচ্ছেন। ওতবা শুনতে শুনতে একেবারে নিরব-নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং উভয় হাত পেছনে দিয়ে টেক লাগিয়ে শুনতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদাহর আয়াত পর্যন্ত পড়লেন এবং সাজদাহ আদায় করলেন। অতঃপর উতবাকে লক্ষ্য করে বললেন,

«قد سمعت يا أبا الوليد! ما سمعت فأنت وذاك»

“হে আবুল ওয়ালীদ! তুমি যা শুনার শুনেছ? এটাই আমার পক্ষ থেকে তোমার বক্তব্যের উত্তর।”

এরপর উতবাহ তার গোত্রের নিকট ফিরে গেল। উতবাহকে দেখে তার

গোত্রের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, আল্লাহর শপথ! উতবাহ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছে তার ভিন্ন চেহারা নিয়ে ফিরেছে। উতবাহ যখন তাদের নিকট গিয়ে বসলো তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কী খবর হে আবুল ওয়ালীদ? সে বলল, আজ আমি যা শুনেছি জীবনে কোনো দিন তা শুনি নি। আল্লাহর শপথ! এটা কোনো কবিতা নয় এবং কোনো যাদুকর কিংবা গণকের কথাও নয়। হে কোরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা মেনে তার অনুসরণ কর এবং আমাকে তার অনুসরণ করতে দাও। আমার মতে, তোমরা তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। আল্লাহর শপথ! যা আমি শুনেছি তা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত অহী বৈ অন্য কিছু নয়। সে যদি তার উদ্দেশ্যে অকৃতকার্য হয় তাহলে সে নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি সে সফল হয়ে যায় তাহলে তাতে তোমাদেরই সম্মান। তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব। তার কারণে তোমরা হয়ে যাবে অন্য সকল জাতির চেয়ে সৌভাগ্যবান। উতবাহর এ কথাগুলো শুনে তারা বলতে লাগল, হে আবুল ওয়ালীদ! মুহাম্মাদ তার ভাষা দ্বারা তোমাকেও যাদু করে ফেলেছে। উতবাহ বলল, এটা আমার মতামত, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পার।[73]

এ কথোপকথনের মাঝে লক্ষ্য করার মতো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। উতবাহ তার কথা শুরুই করেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অনেকগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপনের মাধ্যমে। তথাপিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষনাত কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও মনোযোগ সহকারে শুনতে

73. মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হাদীস নং ১৮১৮; সীরাতে ইবন হিশাম (১/২৯৩-২৯৪), দালাইলুল বায়হাকী (১/২৩০-২৩১); দালাইলু আবী নাঈম (১৮২); মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ (১৪/২৯৫-২৯৬); মুনতাখাবে আব্দুর রহমান (১১২৩); মুসতাদরাকে হাকিম (২/২৫৩)।

লাগলেন এবং উতবাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্য প্ররোচনা দিতে শুরু করলেও তিনি পূর্ণ নিরবতা পালন করলেন এবং বেশ শান্তস্বরে বললেন, 'বলুন, হে আবুল ওয়ালীদ! আমি শুনছি' এবং তিনি তাকে উতবাহ নামে সম্বোধন না করে তার সবচেয়ে প্রিয় তার উপনাম তথা 'আবুল ওয়ালীদ' দ্বারা সম্বোধন করলেন। আবার দেখুন, উতবাহ যখন অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে সম্পদ, সম্মান, রাজত্ব ইত্যাদি পার্থিব লোভ-লালসার বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে লাগল তখনও তিনি রাগান্বিত হন নি বরং শেষ পর্যন্ত শুনে গেলেন এবং চূড়ান্ত সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক বললেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনার বক্তব্য কি শেষ হয়েছে? সে বলল: হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এবার আমার কথা শুনুন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বাধীনভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপনের এবং নিজ মতামত পেশ করার পূর্ণ সুযোগ দিলেন। তার বক্তব্যের সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলা শুরু করলেন। এখানে তিনি আমাদের জন্য অন্যদের সাথে এমনকি ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথেও কথোপকথনের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বানের নববী পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম-এর জীবনের যাবতীয় কথা, কাজ ও ইসলামের প্রতি আহ্বানের ক্ষেত্রে ভীতি-প্রদর্শন বা সতর্ক করণের চেয়ে সু-সংবাদদান তথা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অধিকহারে। কাফিরদের শত রূঢ়তা, কঠোরতা ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও তার এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে নি। রবী'আহ ইবন আব্বাদ দাইলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রথম যুগে কাফির ছিলেন, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) 'যুল-মাজায' বাজারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখেছি যে, তিনি লোকদেরকে সম্বোধন করে বলছেন,

«يا أيها الناس! قولوا لآ إله إلا الله تفلحوا»

"হে লোক সকল! তোমরা এটা মেনে নাও যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে।" তিনি বাজারের প্রতিটি অলিতে-গলিতে প্রবেশ করেছেন এবং এ একই কথা বলে বেড়িয়েছেন। আর তার চতুর্পাশে লোকেরা ভিড়াভিড়ি করে জড়ো হয়ে গিয়েছিল। আমি কাউকেই কিছু বলতে শুনি নি, তবে তার পেছনে টেরা, স্বচ্ছ মুখাবয়ব ও মাথায় চুলের দু'টি বেণী বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, সে বলছে, 'এ লোকটি সাবে'ঈ,[74] মিথ্যাবাদী'। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যক্তিটি কে?' লোকেরা বলল, 'মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ, নবুওয়াতের দাবীদার'। আমি বললাম, 'তার পেছেনের লোকটি কে?' লোকেরা বলল, 'তারই চাচা আবু

---

74. সাবেঈ ধর্মাবলম্বী, তারকা পূজারী (কারো মতে ফিরিশতাদের উপাসনাকারী) একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়। এখানে উদ্দেশ্য 'পথভ্রষ্ট'। -অনুবাদক

লাহাব'।[75]

আবু লাহাব ও আবু জাহলদের এহেন স্পষ্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তার পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধন করলেন না; বরং মানুষকে তিনি মুক্তি ও সফলতার প্রতিই আহ্বান করেছেন। শুধু তাই নয়, অনেক সময় তিনি ঈমান গ্রহণ ও শির্ক পরিহারের বিনিময়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী নি'আমতের পূর্বে দুনিয়াতেও সুখ-শান্তি ও রাজত্ব লাভের শুভ-সংবাদও দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণনা করেন, আবু তালিব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কুরাইশের সবাই উপস্থিত হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপস্থিত হলেন। আবু তালিবের ঘরে উপস্থিতি অনেক। সেখানে আবু জাহল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবু তালিব থেকে দুরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আবু তালিবের নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াল এবং বলল; 'হে ভাতিজা! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট চাও কী?' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাদের নিকট চাই শুধু 'একটি বাক্য' যা দ্বারা গোটা আরববাসী তাদের অনুগত হয়ে যাবে এবং অনারবীরাও অধীনতা স্বীকার করে ট্যাক্স দিতে বাধ্য হবে। আবু জাহল বলল, 'শুধু একটি বাক্য?' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, 'শুধু একটি বাক্য'। আর তা হচ্ছে হে চাচা! আপনারা বলুন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" আবু জাহল বলল, শুধুমাত্র এক ইলাহকে মানতে বল?! আমরা তো সর্বশেষ দীনে এমন কথা শুনি নি। এটা

75. মুসনাদে আহমদ (৩৪১, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩); মুসতাদরাকে হাকিম (১/১৫); মু'জামুত তাবরানী (৫/৫৫)। আল্লামা সা'আতী আল-ফাতহুর-রাব্বানী (২০/২১৬) তে বলেছেন, 'এর সনদ উত্তম'। অধিকতর জানতে দেখুন: ইবন হাজারের 'আল-মাতালিবুল আলিয়া' (৪২৭৭)।

তো বানোয়াট কথা ছাড়া আর কিছু নয়। (বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন) সেসময় আবু জাহলের এ কথার প্রেক্ষিতে কাফিরদের ব্যাপারে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে:

﴿صٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذِي ٱلذِّكۡرِ ١ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٖ وَشِقَاقٖ ٢ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنٖ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٖ ٣ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ ٤ أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ٥ وَٱنطَلَقَ ٱلۡمَلَأُ مِنۡهُمۡ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمۡۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٞ يُرَادُ ٦ مَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِي ٱلۡمِلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا ٱخۡتِلَٰقٌ ٧﴾ [ص: ١، ٧]

"সোয়াদ; কসম উপদেশপূর্ণ কুরআনের। বস্তুত কাফিররা আত্মম্ভরিতা ও বিরোধিতায় রয়েছে। তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি; তখন তারা আর্তচিৎকার করেছিল, কিন্তু তখন পলায়নের কোনো সময় ছিল না। আর তারা বিস্মিত হলো যে, তাদের কাছে তাদের মধ্যে থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে এবং কাফিররা বলে, 'এ তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী'। 'সে কি সকল উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো এক আশ্চর্য বিষয়'! আর তাদের প্রধানরা চলে গেল একথা বলে যে, 'যাও এবং তোমাদের উপাস্যগুলোর ওপর অবিচল থাক। নিশ্চয় এ বিষয়টি উদ্দেশ্য প্রণোদিত'। আমরা তো সর্বশেষ দীনে এমন কথা শুনি নি। এটা তো বানোয়াট কথা ছাড়া আর কিছু নয়।" [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ১-৭][76]

এ হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি ভ্রু-কুঞ্চিত করলেন না এবং সভা ভঙ্গ হওয়ার মতো অশালীন কোনো আচরণ কিংবা দাম্ভিকতা বা বিমুখতা প্রদর্শনও করলেন না; বরং তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ নম্রতা দ্বারা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে দুনিয়ার রাজত্ব ও আখিরাতের নি'আমত উভয়েরই সুসংবাদ প্রদান করলেন।

---

[76] তিরমিযী (كتاب تفسير القرآن، باب سورة ص); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২০০৮; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩৬১৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
অমুসলিমদের প্রশংসা করা প্রসঙ্গে

সম্বোধনের ক্ষেত্রে নম্রতা, কোমলতা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশই শুধু নয় বরং আরো আগে বেড়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো অমুসলিমদের প্রশংসা এবং গুণাগুণও করতেন। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

এক. হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে আসা মক্কার প্রতিনিধি কাফির নেতা সুহাইল ইবন আমরের[77] প্রশংসা করতে গিয়ে মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لقد سهل أمركم»

"(প্রতিনিধি হিসেবে সুহাইলের আগমনের ফলে) তোমাদের জন্য ব্যাপারটি অনেক সহজ হয়ে গেছে।"[78]

---

77. সুহাইল ইবন আমর ইবন লুওয়াই ইবন গালিব। জাহেলী যুগে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিদের একজন ছিলেন। অনেক বড় বাগ্মী বক্তা ছিলেন। বদর যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন। যুদ্ধবন্দি থাকাকালে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছিলেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার সামনের দাঁতগুলো ফেলে দেব, ফলে সে আর আপনার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে পারবে না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না তাকে ছেড়ে দাও, হয়ত একদিন সে এমন অবস্থানে গিয়ে দাড়াবে যে, তুমিও তার প্রশংসা করবে'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পরে মক্কার অনেক নতুন মুসলিমরা যখন মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিলেন এবং মুসলিম হয়ে গেলেন। তখন এক বক্তব্যে তিনি বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! এ দীন সূর্যের উদয়স্থল থেকে অস্ত যাওয়ার স্থান পর্যন্ত প্রসার লাভ করবে" এবং রাসূলের ইন্তেকাল পরবর্তী সময়টিতে মদীনায় আবু বকরের ন্যায় মক্কায় তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের ভূমিকা পালন করেছেন।

78. সহীহ বুখারী, (كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب) হাদীস নং ২৫৮১।

কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বভাবগত নম্রতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন।

দুই. সপ্তম হিজরীর ঘটনা। খালেদ ইবন ওয়ালীদ তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি। ইতিঃপূর্বে তিনি উহুদ, খন্দক ও হুদায়বিয়ার ঘটনাসহ বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা পালন করেছেন। তার ভাই ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ তখন ছিলেন মুসলিম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালীদকে লক্ষ্য করে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার ভঙ্গিতে বলছেন, খালেদ কোথায়? (অর্থ্যাৎ সে কেন এখনো ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে না?)। ওয়ালীদ বলল, 'আল্লাহ তাকেও নিয়ে আসবেন'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره»

"তার মতো (বিচক্ষণ) ব্যক্তি তো ইসলামকে না বুঝার কথা নয়। সে যদি তার শক্তি-সামর্থ্যকে ইসলামের পক্ষে কাফিরদের বিরুদ্ধে ব্যয় করতো তাহলে এটা তার জন্য অনেক ভালো হতো এবং আমরা তাকে অন্যান্যদের তুলনায় এগিয়ে দিতাম।"[79]

দেখুন, খালেদ ইবন ওয়ালীদের সাথে সম্পৃক্ত অনেকগুলো কষ্টদায়ক ঘটনা স্মৃতিতে থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করে উহুদ যুদ্ধের যন্ত্রনাদায়ক ভোগান্তির কথাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার প্রশংসা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রতি আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলছেন যে, 'সে কেন এখনো ইসলাম থেকে দূরে? তিনি তাঁর যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা ও সৈনিক হিসেবে অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করতে

79. ইমাম যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ১/২৯৩।

গিয়ে বলছেন যে, 'সে যদি আমাদের পক্ষে চলে আসে তাহলে আমরা তাকে অন্যান্যদের তুলনায় এগিয়ে দেব।' এতদিন যারা জীবন বাজি রেখে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করেছে ঐ সকল অগ্রজ ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের তুলনায় তিনি তাকে এগিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। এটা খালেদ ইবন ওয়ালীদের আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন বৈ কিছুই নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাহলে একজন সেনাপ্রধানের জন্য নিজের ঘোরতর শত্রু এক প্রতিপক্ষ সৈনিকের এহেন অকৃত্রিম প্রশংসা করা কি এত সহজ ব্যাপার?

তিন. আরবের কবি লবীদ ইবন রবী'আহ[80] তখনো কাফির ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবিতার প্রশংসা করে বলেন:

«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد "ألا كل شيء ما خلا الله باطل"»

"কবিরা যেসব কথা বলে, তন্মধ্যে লবীদের কথাটাই সবচেয়ে বেশি সত্য যে, (সে বলেছে) 'শোন! আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই বাতিল।'"[81]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কবিতার চর্চা করতেন না এবং তেমন বেশি শুনতেনও না। তারপরও কবিতায় ভালো বিষয়বস্তু উপস্থাপনের কারণে তিনি একজন মুশরিক কবির প্রশংসা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। অথচ মুসলিমদের মধ্যেও হাসসান ইবন সাবিত, কা'আব ইবন মালিক ও আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা প্রমুখ ভালো ভালো কবি ও সাহিত্যিকগণ বিদ্যমান ছিলেন।

চার. এবার দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি

80. কবি লবীদ ইবন রবী'আহ আমেরী, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অধিকতর জানতে দেখুন: ইবন হাজার-এর 'আল-ইসাবাহ' (৭৫৪০)।

81. সহীহ বুখারী, (باب ما يجوز من الشعر والرجز،كتاب الآداب) হদীস নং ৫৭৯৫; সহীহ মুসলিম (كتاب الشعر)) হাদীস নং ২২৫৬।

মুশরিক সম্প্রদায়ের প্রশংসা করছেন যারা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয় নি, তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি এবং ইসলাম গ্রহণ করতে সরাসরি অপারগতা প্রকাশ করেছিল। এর কারণ হলো, তিনি যখনই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কোনো ইতিবাচক গুণ দেখতে পেলেন তখনই তার প্রশংসাও করে দিলেন অথচ তাদের মধ্যে অনেক নেতিবাচক দিক বা দোষও বিদ্যমান ছিল। এটি ছিল বনু শায়বান গোত্র। এরা ইরাকের নিকটবর্তী আরব উপদ্বীপের উত্তর পূর্ব এলাকায় বসবাস করত এবং ফারস্য সাম্রাজ্যের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের অধীনতা স্বীকার করে থাকত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলে তারা অত্যন্ত সদাচরণ করেছিল এবং কথাবার্তায় বেশ ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছিল; কিন্তু তারা ফারস্য সম্রাটের ভয়ে ইসলাম গ্রহণে স্পষ্ট অসম্মতি জানিয়েছিল। দেখুন, এখানে সভ্যতা ও আভিজাত্য পরিপন্থি তাদের কতগুলো নেতিবাচক দিক বা দোষ ফুটে উঠেছে। যেমন, ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার অভাব হেতু ইসলাম গ্রহণে পিছিয়ে থাকা, ফারস্য সম্রাট কিসরার ভয়ে কাপুরুষতা প্রদর্শন, মযলুম মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা এবং সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দ্বিধা-দন্ধে ভোগা ইত্যাদি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসবের দিকে দৃষ্টি না রেখে শুধুমাত্র তাদের অন্য একটি ইতিবাচক গুণের প্রশংসা করে বললেন,

«ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه أرأيتم أن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه»

“তোমরা স্পষ্ট অপারগতা প্রকাশ করে কোনো মন্দ কাজ করো নি। বস্তুত যেই আল্লাহর দীনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তার ওপরই সব দিক থেকে বিপদাপদ নেমে এসেছে। তোমাদের কী অভিমত, যদি আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে না হয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বাস্তুভিটা, তাদের

জনপদ ও ধন-সম্পদের মালিক বানিয়ে দেন এবং তাদের মহিলাদেরকে তোমাদের অধীন করে দেন তাহলে কি তোমরা এক আল্লাহর তাসবীহ পাঠ ও তার পবিত্রতা বর্ণনা করবে না?”

এ কথার পর তাদের মধ্য থেকে নু‘মান ইবন শারীক বলে উঠল, ‘হে আল্লাহ! যেন তাই হয়’ (আল্লাহ আপনার কথা কবূল করুন)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় তেলাওয়াত করলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ٤٦﴾ [الاحزاب: ٤٥، ٤٦]

“হে নবী, আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদৃপ্ত প্রদীপ হিসেবে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪৫-৪৬]

অতঃপর তিনি উঠে গেলেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাত ধরে বললেন,

«يا أبا بكر أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفها بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض وبها يتحاجزون فيما بينهم»

“হে আবু বকর, জাহেলী যুগে কোন মহান চরিত্রের দ্বারা আল্লাহ তাদের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করতেন এবং তারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাধের সমাধান করত?”[82]

দেখুন, এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে কোনো মন্তব্য করেন নি। বলেন নি যে, তোমাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণের অভাব রয়েছে; বরং তিনি তাদের ইতিবাচক গুণটির

82. দালাইলুন নাবুওয়াহ লিল বায়হাকী (২/৪২২-৪২৭); দালাইলু আবী নাঈম (১/২৩৭-২৪২); ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ (৩/২৬৪-২৬৫)।

প্রশংসা করেছেন। আর তা হলো তাদের সদাচরণ ও স্পষ্টবাদিতা। কেননা, প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে কিছুদিন পর ধর্মত্যাগ করে পূণরায় আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়া সবদিক থেকেই ক্ষতিকর। তাই কোনো ভয়-ভীতি বা উদ্বেগের কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে না পারলে প্রথমেই তা বলে দেওয়া। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য সময় নেওয়া অনেক ভালো এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের অপারগতা প্রকাশের ধরণটিও ছিল বেশ ভদ্রতা ও শিষ্টাচারপূর্ণ।

তারা কোনো প্রকার দাম্ভিকতা ও অহংকার প্রকাশ না করেই বিনয়ের সাথে আরয করল যে, যদি ইসলাম পারস্য সম্রাটের চেয়েও অধিক শক্তিশালী হয়ে যায় তাহলে তারা নিজেদের মতো থেকে ফিরে আসবে এবং অবশ্যই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে।

মুশরিক সম্প্রদায়টির সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত আচরণগত অবস্থানটি ইসলোম ধর্মের কেন্দ্রীয় নীতিমালাসমূহেরই অংশ। যাকে অমুসলিমদের সাথে আলাপচারিতার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার কৃত্তিমতা ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ছাড়াই অন্যের মাঝে বিদ্যমান সৌন্দর্য্য ও গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন। এটা মূলত বাস্তব-সত্যকে স্বীকৃতিদানের প্রবণতা বৈ কিছুই নয়। আবার অমুসলিমদের মন গলানো ও তাদের অন্তরকে ইসলামের প্রতি ধাবিতকরণের জন্যেও এ ধরণের আচরণ অনেক ফল বয়ে আনে।

পাঁচ. অমুসলিমদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান প্রদর্শনের আরেকটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হলো আবিসিনিয়ার খৃস্টান রাজা নাজ্জাসীর অনবরত প্রশংসা করার আগ্রহবোধ। তিনি কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই প্রায় বলতেন:

وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ،فَإِنّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ

“সেখানকার বাদশার নিকট কেউ অত্যাচারিত হয় না। সে দেশ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।”[83]

এখানে তিনি নাজ্জাশীর মাঝে বিদ্যমান একটি গুণের প্রশংসা করেছেন। এ ধরণের দু একটি প্রশংসনীয় গুণ তো মানুষ হিসেবে সব মানুষের মাঝেই আছে; কিন্তু কয়জন আমরা অন্যের সে গুণের অকপটে স্বীকৃতি দান বা প্রশংসা করতে পারি। এমনকি অনেক স্বল্প-জ্ঞানী সংকীর্ণমনা মুসলিমরা পর্যন্ত অমুসলিমদের প্রশংসা করা বা তাদের সাথে সদাচরণ করা থেকে বিরত থাকেন। তারা এ আশংকা বোধ করেন যে, এ ধরণের সদাচরণ তাদের সাথে এমন বন্ধুত্ব-স্থাপনের পর্যায়ে পড়ে কি না, যা আল-কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আমার মনে হয়, এখানে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধকালীন সময়ের বা শত্রু কাফিরদের সাথে আচরণ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সাথে আচরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম হয়েছেন।

এখানে আমরা নবী জীবনের একটি সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা করছি যা সবার আগে আমাদের মুসলিমদের সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা জরুরী এবং এটাও বুঝা জরুরী যে, এটি আমাদের দীন; আমরা যার অনুসারী এবং যাকে নিয়ে আমাদের গর্ব করি। আর এ হচ্ছে আমাদের নবী; আমরা যার অনুকরণ করি এবং যাকে নিয়ে আমরা সম্মানবোধ করি।

আর এটি নিশ্চিত যে, বর্তমান বিশ্বের যে কোনো স্থানের মতো তৎকালীন আবিসিনিয়ার খৃস্টধর্মীয় কিতাবগুলোও বিকৃত ছিল। তথাপি এ বিকৃতিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের গুণ বর্ণনা থেকে বিরত

83. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৮৩০৪; সীরাতে ইবন হিশাম (২/১৬৪)।

রাখতে পারে নি। শুধু তাই নয় বরং আরো আগে বেড়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বিবাহ করার জন্য নাজ্জাশীকে উকিল নিযুক্ত করে তাকে আরো সম্মানিত করেছেন।[84] উম্মে হাবীবাহ রমলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশসহ[85] আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ সেখানে গিয়ে দীন ত্যাগ করে খৃস্টান হয়ে যায়।[86] ফলে উম্মে হাবীবাহ তাকে ছেড়ে দেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করে নেন। আর সে বিয়ের উকিল নিযুক্ত করেন নাজ্জাশীকে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারতেন জা'ফর ইবন আবু তালেবকে[87] উকিল বানাতে। কেননা সে ছিল মুহাজিরদের দলপতি আবার তাঁর আপন চাচাত ভাই কিংবা তিনি পারতেন উম্মে হাবীবার গোত্র তথা বনু উমাইয়্যার মধ্য হতে হিজরতকারীদের কাউকে উকিল বানাতে। কিন্তু তিনি নাজ্জাশী অবস্থানকে তা'যীম করতে এবং তাকে সম্মান

---

84. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (৪/১৬১)।

85. উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশ, মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় স্ত্রী উম্মে হাবীবাহ রমলাহ বিনতে আবু সুফিয়ানসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যান এবং খ্রিস্টান অবস্থায়ই মৃত্যু হয়। অতঃপর উম্মে হাবীবাহকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করে নেন।

86. মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ২৭৪৪৮, মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৬৭৭০।

87. জা'ফর ইবন আবু তালিব ইবন আবদুল মুত্তালিব, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর আপন ভাই। আকৃতি ও চারিত্রিক দিক থেকে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। হাবশায় হিজরত করেছেন এবং খায়বার বিজয়ের দিন সেখান থেকে ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, আমি জানি না যে, কোন কারণে আমি বেশি খুশি; খায়বার বিজয়ের কারণে নাকি জা'ফরের আগমনে? মু'তার যুদ্ধের তিন প্রধানের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন এবং সে যুদ্ধেই শাহাদাত বরণ করেন। অধিকতর জানতে: ইবন হাজার-এর 'আল-ইসাবাহ' (১১৬৭)।

প্রদর্শন করতে চাইলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:

অমুসলিমদের দূত ও প্রতিনিধিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নববী প্রোটোকল

এ বিষয়ে সবচেয়ে অবাক করা মতো ঘটনা হচ্ছে, ফারস্য সম্রাট কিসরার পক্ষ থেকে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করার জন্য প্রেরিত দূতদ্বয়ের সাথে তাঁর আচরণ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করতে লাগলেন তখন পারস্য সম্রাট কিসরা-এর নিকটও একটি পত্র পাঠান। পত্র পড়ে কিসরার মেজাজ বিগড়ে গেল, সে পত্রটাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলল এবং ইয়ামানের গভর্ণর বাযানের কাছে পত্র লিখল যাতে সে তার বাহিনী প্রেরণ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতারপূর্বক তার সামনে হাযির করে। এ অস্বাভাবিক উত্তেজনাকর মুহূর্তেও অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ কেমন ছিল তা জানতে হলে চলুন আমরা ঘটনাটি শুরু থেকে অধ্যয়ন করি।

ইয়াযীদ ইবন হাবীব[88] বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবন হুযাফা আস-সাহমীকে[89] পারস্য সম্রাট কিসরা

---

88. প্রখ্যাত তাবে'ঈ ইয়াযীদ ইবন হাবীব এ বর্ণনাটি উকবাহ ইবন আমের জুহানী থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন সাঈদ বলেন, ইয়াযীদ ইবন হাবীব অধিক হাদীস বর্ণনাকারী, নির্ভরযোগ্য। মৃত্যু ১২৮ হিজরীতে।

89. আব্দুল্লাহ ইবন হুযাফা ইবন কায়স আস-সাহমী আল-কারাশী। প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয় দফা আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে ছিলেন। বদর যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগে রোমীয়দের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তারা তাকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করতে চেয়েছিল; কিন্তু পারে নি। অবশেষে আল্লাহ তাকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তার উসিলায় অন্য বন্দিদেরকেও। অধিকতর জানতে

(আবরুভেজ/খসরু পারভেজ ইবন হরমুজ)-এর নিকট পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। প্রেরিত পত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبدُه ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر مَنْ كان حيًا، ويحقّ القول على الكافرين، فأسْلِمْ تَسْلَمْ، فإن أبَيْتَ فإنّ إثم المجوس عليك»

"এ পত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে পারস্যের মহান সম্রাট কিসরার প্রতি। যারা সত্য-কঠিন পথের অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের প্রতি সালাম। আমি আপনাকে মহান আল্লাহর আহ্বানের দ্বারাই আহ্বান জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমি গোটা মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি। যাতে, যারা জীবিত আছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি এবং কাফিরদের জন্য আল্লাহর বাণী সত্যে পরিণত হবে। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপদে থাকুন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে এ মাজুসীদের (অগ্নি উপাসক) সকল পাপ আপনার ওপর বর্তাবে।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পেয়ে কিসরা পত্রটি ছিড়ে ফেলে এবং বলে যে, 'এ লোক আমার নিকট পত্র লেখে অথচ এ আমার অধীনস্ত!' সাথে সাথে সে ইয়ামেনে তার প্রতিনিধি শাসক বাযানকে লিখল, 'তুমি হিজাযের এ ব্যক্তির (মুহাম্মাদ) নিকট দু'জন এমন সাহসী লোক পাঠাও, যারা তাকে পাকড়াও করে আনতে পারে।' কিসরার এ পত্রের প্রেক্ষিতে 'বাযান' রাসূলুল্লাহর নিকট একটি পত্রসহ দু'জন দূত পাঠায়। একজনের নাম বাবওয়াইহ, অন্যজন খারাখসারাহ। পত্রে সে বাহকদ্বয়ের

দেখুন: ইবন হাজার: 'আল-ইসাবাহ' (৪৬২০); ইবন আব্দুল বার: 'আল-ইসতি'আব' (২/২৬৭); ইবনুল আসীর: 'উসদুল গাবাহ' (৩/১০৬)।

সাথে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট উপস্থিত হবার নির্দেশ দেন এবং পত্রবাহকদ্বয়ের প্রধান বাবওয়াইহকে বলে দেয় যে, 'এ লোকের শহরে যাও, তার সাথে কথা বল এবং আমাকে তার সংবাদ এনে দাও'। পত্রসহ বাহকদ্বয় তায়েফে উপস্থিত হয়। সেখানে তারা মক্কার কুরাইশ বংশের কিছু লোকের দেখা পায় এবং তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে অবগত হয় যে, তিনি মদিনায়। কুরাইশ ব্যক্তিবর্গ লোক দু'টির পরিচয় ও উদ্দেশ্য অবগত হয়ে দারুণ উৎফুল্ল হয়। তাদের একজন আনন্দের আতিশয্যে এমনও বলে যে, তোমাদের জন্য সুসংবাদ! এবার শাহেনশাহ ইরান কিসরা তাকে দেখে নেবেন। লোকটির জন্য তিনিই উপযুক্ত। লোক দু'টি মদিনার পথে রওয়ানা হলো এবং এক সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের পরিচয় দিল এবং বাবওয়াইহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলল, কিসরা বাযানের কাছে পত্র লিখেছেন বাযান যেন আপনার কাছে এমন কাউকে পাঠায় যে আপনাকে কিসরার কাছে নিয়ে যাবে। বাযান আপনাকে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। যদি আপনি আমাদের সাথে যেতে রাজি হন তাহলে বাযান সম্রাট কিসরা –এর নিকট আপনার ব্যাপারে সুপারিশ করবেন। ফলে সম্রাট আপনার কোনো ক্ষতি করবেন না। আর যদি আপনি যেতে না চান তাহলে আপনি তো তাকে চেনেন, তিনি আপনাকে আপনার সম্প্রদায় ও দেশ সব কিছুকেই ধ্বংস করে দিতে পারেন। পত্রবাহক দুইজন দাঁড়ি মুণ্ডিত এবং দীর্ঘ গোঁফধারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চেহারার প্রতি তাকাতে বিরক্তিবোধ করলেন এবং বললেন, তোমাদের নাশ হোক! কে তোমাদের এরূপ (দাঁড়ি মণ্ডিত এবং গোঁফ লম্বা) করতে নির্দেশ দিয়েছে? তারা উত্তর করল, 'আমাদের রব

(কিসরা)’। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর আমার রব আমাকে দাঁড়ি বড় করতে এবং গোঁফ ছাঁটতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বললেন, ‘এখন আপনারা যান, আগামীকাল আমার কাছে আসুন’। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসমান থেকে এ খবর এসে গেল যে, ‘আল্লাহ কিসরা আবরুভেজের ওপর তার পুত্র শিরাওয়ায়হিকে ক্ষমতাবান করেছেন। সে তার পিতাকে হত্যা করেছে’ এবং এ সংবাদও এসেছে যে, কোন শহরে কীভাবে ও কখন এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। পরের দিন লোক দু’টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি তাদেরকে এ সংবাদটি জানালেন। তারা বললো, আমরা কি আপনার পক্ষ থেকে এ সংবাদ আমাদের রাজাকে জানাবো? বললেন, ‘হ্যাঁ, তোমরা আমার পক্ষ থেকে তাকে এ সংবাদ অবহিত করো। তাকে এ কথাও বলো যে, আমার এ দীন, আমার এ রাষ্ট্র কিসরার সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাকে আরো বলবে, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে যেসব অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী আপনার শাসনাধীনে আছে তা সবই ঠিক থাকবে।’ যাওয়ার সময় তিনি খারাখসারাহকে উপঢৌকন স্বরূপ স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত একটি কমরবন্দ (বেল্ট) দিয়েছিলেন। লোক দু’টি ইয়ামেনে ফিরে গেল এবং বাযানের নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কথা খুলে বললো। বাযান সব কথা শুনে বললেন, আল্লাহর কসম! এ কোনো রাজা-বাদশাহর কথা নয়। তিনি যেমন বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি একজন নবী। আমরা তাঁর কথার সত্য-মিথ্যা নিরূপণের জন্য অপেক্ষা করবো। যদি সত্য হয় তাহলে তিনি অবশ্যই একজন নবী। আর সত্য প্রমাণিত না হলে পরবর্তীতে তাঁর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। এ কথা বলার অল্পক্ষণের মধ্যে তার হাতে ‘শিরাওয়ায়হি’-এর একখানা পত্র এসে পৌঁছে, অতঃপর এই যে, আমি কিসরাকে (আবরুভেজ) হত্যা করেছি। আমার এ

পত্র আপনার নিকট পৌঁছার পর আপনি ও আপনার নিকট যারা আছে, আমার আনুগত্য মেনে নিবেন। আর ইতিঃপূর্বে কিসরা যে ব্যক্তির ব্যাপারে (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে লিখেছিলেন, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত তাঁকে কোনো রকম বিরক্ত করবেন না।

শিরাওয়ায়হির এ পত্র পাঠ শেষে বাযান বলে উঠেন, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি এবং তার সাথে ইয়ামেনের মাটিতে পারস্যের যত লোক ছিলেন সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাবওয়াইহ বাযানকে বলে, 'আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর মতো প্রভাবশালী কোনো মানুষের সাথে কখনো কথা বলি নি'। বাযান জানতে চাইল, 'কেন তার সাথে কি পুলিশ ছিল?' সে বলল, 'না, কোনো পুলিশ কিংবা বাহিনী ছিল না'।[90]

এ পয়েন্টে এসে আমরা বিরোধীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নবী চরিত্রের এমন কিছু অবাক করার মতো বিষয় লক্ষ্য করলাম যা প্রকাশ করার সঠিক ভাষা আমাদের জানা নেই। দেখুন, কিসরার এ দূতদ্বয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায়, রাসূলের ভূমিতে, রাসূলের বাড়িতে এসেছে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের আচরণও ছিল সম্রাট কিসরার ন্যায়ই মেজাজ বিগড়ে যাওয়ার মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ!! এতকিছুর পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধীরতা, স্থীরতা ও স্বভাবসুলভ নম্রতার বিচ্যুতি ঘটে নি; বরং তিনি অত্যন্ত নির্ভরতা ও পরম নিশ্চয়তার সাথে তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী সংবাদ প্রদান করলেন এবং বললেন যে, ইয়ামেনের গভর্ণর বাযানকে আমার পক্ষ থেকে বলবে যে, 'যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে যেসব অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী আপনার শাসনাধীনে আছে তা সবই ঠিক থাকবে' এবং যাওয়ার সময় তিনি দূতদ্বয়ের একজন

---

90. তারীখুত-তাবারী (৩/৯০), ইবন কাসীর, আস-সীরাতুন-নববিয়্যাহ (২/১৫৮-১৬১)।

(খারাখসারাহ) কে মূল্যবান উপঢৌকনও দিয়েছিলেন, যা ছিল স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত একটি কমরবন্দ (বেল্ট)।

ধর্ম-বিশ্বাস, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, স্বভাব-প্রকৃতি ও চিন্তা-চেতনা সবদিক থেকেই বিরোধী প্রতিপক্ষের কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সাথে এ ধরণের উন্নত কুটনৈতিক আচরণ সত্যিই মনুষ্য-বিবেক স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো, যা চিন্তার জগৎকে ভাবিয়ে তোলে এবং মানবতাবোধকে জাগ্রত করে। এখানে এমন কোনো সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক নিয়মনীতি ছিল না যা একজন সেনাপ্রধানকে তার প্রাণ-নাশের হুমকিদাতা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনকারী কট্টরবিরোধী প্রতিপক্ষের সাথে এ ধরণের নম্র ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিল; বরং এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে সদা বিদ্যমান সেই প্রবণতা যা তার সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আল্লাহ প্রদত্ত আদেশ ও শর‘ঈ বিধানের আওতায় পরিচালিত করে। আর এ বৈশিষ্ট্য-শ্রেষ্ঠত্ব শুধু ইসলামেই রয়েছে। কেননা, যে তার জীবনের প্রতিটি নড়া-চড়ায় আপন প্রতিপালককে অনুসরণ করে আর যে শুধুই কামনা তাড়িত হয়ে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে উভয় কি সমান হতে পারে? এ তো আসমান জমিনের পার্থক্য।

অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আচরণ গতানুগতিক ধারার কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটা ছিল সকল অমুসলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তার অবশ্য পালনীয় মূলনীতি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রেরিত তাঁর পত্রাবলী থেকে এ কথাটি আরো স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল অমুসলিমদের সাথেই সর্বোত্তম কুটনৈতিক আচরণ করতেন। ইহুদী, খ্রিস্টান, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক, আরব কিংবা অনারব সকল রাজন্যবর্গকেই তিনি সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর সকল রাজা-

বাদশাহদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত অনেকগুলো পত্র প্রেরণ করেছেন। সকলকেই তিনি মহান, প্রধান, সম্রাট ইত্যাদি গুণবাচক বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। কোনো একজন অমুসলিমকেও বিশেষায়িত করতে সংকীর্ণতা বোধ করেন নি।

রোম সম্রাটের প্রতি প্রেরিত চিঠির শুরুতে তিনি লিখেছেন,

«من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم...»

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের মহান সম্রাট 'হিরাক্লিয়াসের প্রতি।" [91]

ফারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি প্রেরিত চিঠির শুরুতে তিনি লিখেছেন,

«من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس...»

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে ফারস্যের মহান সম্রাট কিসরার প্রতি।" [92]

মিসরের অধিপতি মুকাওকিসের নিকট প্রেরিত চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

«من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط...»

"মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে কিবত'র মহান অধিপতি মুকাওকিস সমীপে।"[93]

হাবশা (আবিসিনিয়া)'র প্রধানকে তিনি লিখেছেন,

«هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الاصحم ، عظيم الحبشة...»

---

91. সহীহ বুখারী (باب حديث لأبي سفيان عند هرقل،كتاب بدء الوحي) হাদীস নং ৮, সহীহ মুসলিম (كتاب الجهاد والسير) হাদীস নং ১৭৭৩।

92. তারীখুত-তাবারী (تاريخ الامم والملوك) (৩/৯০,৯১); ইবন কাসীর: আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যাহ (৩/৫০৮-৫১০)।

93. আবু জা'ফর ত্বাহাবী: মুশকিলুল আসার (১১/১৩৬)।

"নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাবশার মহান অধিপতি আসহাম নাজ্জাশী সমীপে।"[94]

এমনই ছিল তাঁর প্রতিটি চিঠির ধরণ এবং অগ্রহণযোগ্য ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বার্তা নিয়ে আসা কিসরার দূতদ্বয়ের মতো মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগত সকল দূতের সাথেই তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই একই ধরণের আচরণ। যদিও দূতদের সাথে সাধারণত তাদের মর্যাদাগত অবস্থান অনুযায়ীই আচরণ করা হয়ে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূতদের অভ্যর্থনা, থাকা-খাওয়া ও উপঢৌকন প্রদানসহ যাবতীয় আরাম-আয়েশের দিকে অত্যন্ত সযত্ন দৃষ্টি রাখতেন। তিনি দূতদেরকে স-সম্মানে অভ্যর্থনা জানাতেন, তাদের সম্মানে বনভোজনের আয়োজন করতেন, বারবার খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাদের সামনে সুন্দর পোষাক পরে আসতেন[95] এবং দূতদের অভ্যর্থনা ও বাসস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ঘর প্রস্তুত করে রাখতেন। যেমন, সালমান[96] গোত্রের

---

94. মুসতাদরাকে হাকিম (২/৬৩৩); বায়হাকী: দালাইলুন-নবুওয়্যাহ (৩/৩০৮)।

95. ফারুক হাম্মাদাহ: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي (৯৫)

96. হাবীব ইবন আমর সালামানী বর্ণনা করেন, আমরা সাতজন সালামান গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে আগমন করলাম এবং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মসজিদের বাইরে একটি জানাযার সামনে সাক্ষাৎ করলাম। আমরা সালাম দিলাম তিনি উত্তর দিয়ে জানতে চাইলেন, তোমরা কারা? বললাম, 'আমরা সালামান গোত্র থেকে সকলের প্রতিনিধি হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছি'। তিনি স্বীয় গোলাম সাওবানকে ডেকে বললেন: "দূত ও প্রতিনিধিরা যেখানে থাকেন এদেরকে সেখানে নিয়ে যাও"। এরপর যোহরের সালাতের পর মিম্বর ও তাঁর ঘরের মাঝখানে আমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমরা তাকে সালাত ও ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান এবং ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলাম। তিনি আমাদের প্রত্যেককে পাঁচ আওকিয়া করে হাদিয়া দিলেন। অতঃপর আমরা আমাদের গোত্রে ফিরে এলাম। এটা ছিল দশম হিজরীর শাওয়াল মাসে। অধিকতর জানতে: ইবন সা'দ: আত-ত্বাবাকাতুল

প্রতিনিধিরা আগমন করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ গোলাম সাওবানকে বললেন,

«أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفود»

“দূত ও প্রতিনিধিরা যেখানে থাকেন এদেরকে সেখানে নিয়ে যাও।” [97]

এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, দূত ও প্রতিনিধিদের জন্য ঘর নির্ধারণ করা ছিল। কোনো কোনো বর্ণনাতে পাওয়া যায় যে, এটি ছিল রমলাহ বিনতে হারেস নাজ্জারীয়্যাহ[98]-এর ঘর। এমনিভাবে কিলাব, মাহারেব, আযরাহ, আবদে কায়েস, তাগলাব ও গাসসান ইত্যাদি গোত্রের প্রতিনিধিদেরকেও একই ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল[99] এবং দূত ও প্রতিনিধিদেরকে হাদিয়া-তোহফা দেওয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল। অধিকাংশ সময় তা হতো রৌপ্য।[100] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে- দূত ও প্রতিনিধিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ্রহ ও আন্তরিকতা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তিনি জীবনের অন্তীম মূহুর্তগুলোতেও সাহাবায়ে কেরামগণকে অসিয়ত করে বলেছেন যে,

«أجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم»

“তোমরা দূত ও প্রতিনিধিদেরকে উপঢৌকন প্রদান করবে, যেমন আমি

কুবরা (১/৩৩২)।

97. ইবন সা‘দ: আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (১/৩৩২)।

98. রমলাহ বিনতে হারেস নাজ্জারীয়্যাহ আনসারী মহিলা ছিলেন। তার ঘরে দূত ও প্রতিনিধিরা অবস্থান করত। অধিকতর জানতে: ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (৬/১১৯)।

99. ইবন সা‘দ: আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (১/৩০০-৩৪৮)

100. প্রাগুক্ত

তাদেরকে উপঢৌকন প্রদান করতাম।”[101]

এ অধ্যায়ের সমাপ্তিলগ্নে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, অমুসলিমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শানের ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, তিনি অমুসলিমদের জন্যে তাদের ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অথচ তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, এটি মূল আসমানী কিতাব নয়। এতে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে এবং নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে অযৌক্তিক ও মনগড়া অনেক কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও তিনি তাদের ধর্মীয় বই সংরক্ষনের দায়িত্ব পালন করেছেন। খায়বার দূর্গ বিজয়ের পর সেখানে কতগুলো ধর্মগ্রন্থ পাওয়া গিয়েছিল। তন্মধ্যে তাওরাতও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলোকে সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখলেন। ইয়াহূদীরা তাদের তাওরাত চাইতে আসলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন।[102]

পৃথিবীর আদি থেকে এ পর্যন্ত মানব জাতির ইতিহাস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত বিরোধীদের সাথে এ ধরণের উন্নত আচরণ-বিধি মেনে চলার মতো কোনো মহা মানবের সন্ধান দিতে পারে নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। যাচাই করতে চাইলে চলুন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাই। দেখে আসি, স্পেন পতনের সময় খ্রিস্টানরা কী করেছিল এবং কী আচরণ করেছিল জেরুযালেম পতনের সময় রোমীয়রা? প্রতিটি বস্তুকে তার বিপরীত বস্তুর মুখোমুখি দাঁড় করালে স্পষ্ট ফুটে উঠে!!

101. সহীহ বুখারী (كتاب الجهاد والسير) হাদীস নং ২৮৮৮।

102. আল-ওয়াকেদী: আল-মাগাযী (১/৬৮১)

চতুর্থ অধ্যায়:

অমুসলিমদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা

এ অধ্যায়টি শুরু করার জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কোনো কথা আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, যা লিখেছে এক খ্রিস্টান গবেষক, যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাচার ও যেসব উৎসমূলগুলোর ওপর শরী'আতের ভিত প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছে। সে হচ্ছে ড. নাযমী লাওকা।[103] তিনি লিখেছেন:

"যে শরী'আত এ কথা বলে,

﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ﴾ [المائدة: ٨]

"কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তামাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৮]

এর চেয়ে উত্তম এমন আর কোনো শরী'আত আমি দেখি না, যা ন্যায়পরায়ণতার দাবী করে এবং এমন শরী'আতও দেখি না যা স্বজনপ্রীতি ও যুলুমকে নিষিদ্ধ করে। তাই এ দর্শন বাদ দিয়ে বা উচ্চতা ও সততার দিক থেকে এর চেয়ে অনুন্নত দীন পালন করে কেউ কি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে...?!"

এটি আমাদের দীনের ব্যাপারে একজন খ্রিস্টান গবেষকের সাক্ষ্য। আমাদের শাশ্বত দীন নিয়ে তার এ ধরণের আরো অনেক মন্তব্য রয়েছ।

---

103. ড. নাযমী লাওকা। একজন মিসরীয় খ্রিস্টান গবেষক। যদিও শিশুকাল থেকেই তার পিতা-মাতা তার অন্তরে খ্রিস্টবাদের বীজ বপন করে রেখেছেন, তবুও ব্যক্তিগত জীবনে সে অনেক মুসলিম শাইখের মজলিসে উপিস্থত থাকত। শুধু তাই নয়; বরং তিনি তার বয়স দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে ফেলে। অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: محمد في حياته الخاصة ও محمد الرسالة والرسول

মোদ্দাকথা হচ্ছে, ন্যায়পরায়তা ও নিরপেক্ষতা এটি এমন একটি বিষয় যাকে আমাদের শরী'আত সামান্যতমও অবহেলা করে না। আমাদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচারে তো এ বিষয়ে অবহেলার কল্পনাই করা যায় না।

আল্লাহ চাহে তো আমি চলমান অধ্যায়ের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টিকে নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদসমূহে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালাব।

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলামী শরী'আতে ন্যায়পরায়ণতা।

দিত্বীয় পরিচ্ছেদ: সম্পদের লেন-দেনে ন্যায়পরায়ণতা।

তৃতিয় পরিচ্ছেদ: বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ব্যক্তিগত অধিকার হরণকারীদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ন্যায়পরায়ণতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা।

ষষ্ট পরিচ্ছেদ: একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: অত্যন্ত বিরাগভাজনদের সাথেও ন্যায়পরায়ণতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ:
ইসলামী শরী‘আতে ন্যায়পরায়ণতা

ইসলামী শরী‘আতের মূলনীতিগুলোর মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এতে কোনো ধরণের তারতম্য বা অবহেলার সুযোগ নেই। এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ও তাঁর সকল উম্মতের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾ [النحل: ٩٠]

“আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯০]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾ [النساء: ٥٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮]

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ‘আদল’ শব্দটির পাশাপাশি ‘আমর’ (আদেশমূলক) শব্দেরও ব্যবহার করেছেন। কেননা ন্যায়পরায়ণতা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় বা শুধু ফযীলতপূর্ণ আমল নয়; বরং এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় আদেশ, যা ছাড়া শরী‘আতের বিধান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোনো মু মিনের জন্য কখনোই ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া কোনো ফয়সালা সম্পাদন করা যথাযথ হতে পারে না।

ন্যায়নিষ্ঠা, ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা ও নিরপেক্ষতার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচারই হলো প্রকৃত বাস্তব নমুনা। কারণ তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে ন্যায়পরায়ণতার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র ফুঠে উঠেছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন,

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ »

“যেদিন আল্লাহর (‘আরশের) ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা‘আলা সাত শ্রেণির মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (তাদের মধ্যে এক প্রকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন) ন্যায়পরায়ণ শাসক।”[104]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ আরেকটি হাদীস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন,

«مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ »

“যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক জমি তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে।”[105]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله

---

104. সহীহ বুখারী (كتاب الصلاة: باب من ينتظر الصلاة وفضل الجماعة) হাদীস নং ৬২৯; (كتاب الرقاق: باب البكاء من خشية الله) হাদীস নং ৬১১৪; (كتاب الزكاة: باب الصدقة باليمين) হাদীস নং ১৩৭৫; (كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة : باب فضل من ترك الفواحش) হাদীস নং ৬৪২১; সহীহ মুসলিম (كتاب الزكاة: باب فضل إخفاء الصدقة) হাদীস নং ১০৩১।

105. সহীহ বুখারী (كتاب المظالم: باب إثم من ظلم شيئا من الارض) হাদীস নং ২৩২১; সহীহ মুসলিম (كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الارض و غيرها) হাদীস নং ১৬১২।

حتى ينزع»

“যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় ঝগড়া বা যুলুমের ব্যাপারে অন্যকে সহযোগিতা করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর লা‘নত বর্ষিত হতে থাকে যতক্ষণ ঐ যুলুমের অবসান না হয়।”[106]

এ ক’টি হাদীসে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে, যা মুসলিম ও অমুসলিম সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই সর্বাবস্থায় যুলুম প্রত্যাখ্যাত এবং যে কোনো প্রেক্ষিতেই যুলুম নিষিদ্ধ। অতএব, ধর্মীয় বিশ্বাস, জাতি, বংশ, এলাকা বা গোত্রীয় সম্পর্কের ভিন্নতায়ও সর্বাবস্থায় যুলুম বা অন্যায় নিষিদ্ধ। ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠায় কোনো তারতম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

এ সকল কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এ কথা বিশ্বাস করার পথ চিরতরে রূদ্ধ করে দিয়েছেন যে, অমুসলিমদের ওপর সামান্যতম হলেও যুলুমের বৈধতা রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি অতি চমৎকার ও অনুপম কয়েকটি কথা বলেছেন, যেগুলো ভূপৃষ্টের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব, যেন সকলেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে। তিনি বলেন,

«ألا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

“যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের ওপর যুলুম করে অথবা তার কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করে অথবা সাধ্যের বাইরে তার ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় অথবা তার সম্মতি ছাড়া তার নিকট থেকে কোনো কিছু নিয়ে

106. ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩২০; আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৯৭; আল্লামা নাসীরুদ্দিন আলবানী এই হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন: সহীহ আল-জামিউ (৬০৩৯)।

নেয় তাহলে কিয়ামত দিবসে আমি সে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব।”[107]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব চমৎকার বাক্যাবলি ও তার মহত্ত্ববোধক অর্থ শুধুমাত্র ক’টি তাত্ত্বিক নীতিই নয় যে, মানব জীবনে এর কোনো কার্যকারিতা নেই; রবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সম্মতি ও কর্মকাণ্ডে এর পরিষ্কার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি নিজ সকল সম্পৃক্ততা ও চুক্তিসম্পাদনে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার চেতনাটিকে আরো বেশি সমোজ্জ্বল করে তুলতেন এবং পূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা বাস্তবায়নে সহায়ক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা গ্রহণে সদা সচেষ্ট থাকতেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইয়াহূদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহে ‘আদল’ এর নমুনা দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরতের সময় কৃত চুক্তিপত্রে তিনি এ বিষয়টিকে স্পষ্টাকারে তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে,

«وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم»

“নিশ্চয় কোনো ব্যক্তিকে তার সাথীর কারণে অপরাধী সাব্যস্থ করা হবে না এবং অবশ্যই মযলুমকে সহযোগিতা করা হবে।”[108]

চুক্তিনামায় সম্পাদিত এ ধারা/নীতিটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ মর্মে প্রকাশ্য বিবৃতি যে, যুলুম সাধারণভাবেই অগ্রহণযোগ্য

---

107. সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০৫২; বায়হাক্বী: আস-সুনানুল কুবরা হাদীস নং ১৮৫১১; আল্লামা নাসীরুদ্দিন আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। সহীহ আল-জামি‘ (২৬৫৫)।

108. ইবন কাসীর: আল-ইবদায়া ওয়ান নিহায়া (৩/২৫১); ইবন সায়্যিদুন নাস: উয়ূনুল আছর (১/৩১৮), ইবন হিশাম: আস-সীরাতুন্নবুবিয়্যাহ (৩/৩১); আকরামুল উমরী: আল-মুজতামিউল মাদানী (১১৯-১২১)

এবং সাহায্য হবে সর্বদা নিপীড়িতের পক্ষে। নিপীড়িত মুসলিম হোক বা ইয়াহূদী হোক। পরবর্তী সময়ে এ ঘোষণার যথাযথ বাস্তবায়ন ন্যায়পরায়ণতার দাবীতে আরো দৃঢ়তা এনে দিয়েছে। শুধু এ একটিই নয়; বস্তুত চুক্তিপত্রের প্রতিটি ধারাই ছিল ন্যায়নিষ্ঠার বাহক।

অনুরূপ ইয়াহূদীদের সাথে কৃত অনেক চুক্তি রয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার দাবীটিকে আরো আলোকময় করেছেন। তদ্রুপ খ্রিস্টানদের সাথে কৃত চুক্তিপত্রেও তিনি ন্যায়পরায়ণতার পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। যেমন, নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামায় তিনি বলেন:

«ولا يوخذ رجل منهم بظلم آخر»

“একের অন্যায়ে অন্যকে পাকড়াও করা হবে না”।[109]

মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক চলমান রাখার স্বার্থে রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যে ব্যক্তি খ্রিস্টান ও মুসলিমগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে উল্লিখিত ঐক্যমতের বিষয়াদির বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করবে এবং ঐ ব্যক্তির সবচেয়ে বড় গুণ হবে বিশ্বস্ততা। বস্তুত বিশ্বস্ততা তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবীরই অত্যাবশ্যকীয় একটি গুণ। তদুপরি তিনি এ ক্ষেত্রে এমন একজনকে বেচে নিলেন যার মধ্যে এ গুণটি চুড়ান্ত মাত্রায় অর্জিত হয়েছিল। এমনকি রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ঐ ব্যক্তির প্রসংশায় বলেন,

«لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين»

109. মুহাম্মাদ ফারুক হাম্মাদ: আল-আলাকাতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়ান নাসরানিয়্যাহ (১১০)।

“আমি তোমাদের মাঝে একজন আমীন (বিশ্বস্ত) লোককে পাঠাবো, তিনি সত্যই আমীন, সত্যই আমীন।”[110]

এমতাবস্থায় সাহাবীগণ প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করছিলেন যে, তিনি হবেন ঐ সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, قُمْ يَا ابَا عُبَيْدَةَ بنَ الجرّاحِ “হে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ! তুমি দাড়াও” অতঃপর আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন দাড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«هَذَا أمِيْنُ هَذه الأُمّةِ»

“এ হচ্ছে এ উম্মতের আমীন (বিশ্বস্ত)।”

ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য আরেকটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে, সেটি হচ্ছে, খায়বার বিজয়ের পর খায়বার উপত্যকার ফলাফল মুসলিম ও ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টন প্রক্রিয়ায় উভয় পক্ষ ঐক্যমত হলো তখন রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একজনকে খায়বার প্রেরণের ইচ্ছা করলেন যিনি যথাযথ উভয়পক্ষের সম্মতি বাস্তবায়ন করবেন। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানে প্রেরণ করলেন, যার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ছিল সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত একটি গুণ। এমনকি কতক ইয়াহূদী যখন তার বণ্টনব্যবস্থায় অহেতুক আপত্তি উত্থাপন করল, তখন তিনি তার ঐ প্রসিদ্ধ উক্তিটি বললেন যে, “হে ইয়াহূদী যুবকরা! আমার দৃষ্টিতে তোমরা হচ্ছ সৃষ্টিকূলের সবচেয়ে ঘৃণিত প্রাণী। কেননা তোমরা আল্লাহর অনেক নবী আলাইহিমুস সালামকে হত্যা করেছ, আল্লাহ তা‘আলার ওপর মিথ্যারোপ করেছ। তারপরও আমার

110. সহীহ বুখারী (كتاب المغازي: باب قصة اهل نجران) হাদীস নং ৪১১২; সহীহ মুসিলম (كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل ابو عبيدة بن الجراح) হাদীস নং ২৪১৯।

ক্রোধ আমাকে উদ্বুদ্ধ করে না যে, আমি তোমাদের ওপর অবিচার করব”।

প্রিয় পাঠক! এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন যে, একদিকে সেই ইয়াহূদীরা যারা তার ভাষ্যে নিকৃষ্টতম প্রাণী। অপরদিকে রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। যে রাসূল তাঁর নিকট দুনিয়ায় সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। এমতাবস্থায়ও তার কাছে যুলুম বৈধতা পায় নি। তিনি রাগান্বিত হয়ে ইয়াহূদীদের ওপর কোনোরূপ অবিচার করেন নি।

মূলত রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ন্যায়পরায়ণতার প্রতি অগাধ গুরুত্বারোপ তো তখন থেকেই সূচনা হয়েছে যখন তিনি বিখ্যাত সাহাবী মা‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান অধ্যুসিত এলাকা ইয়ামানে গভর্ণর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন,

«إنكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ »

“তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে যে, তারা যেন সাক্ষ্য দিয়ে বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ

তাদের ওপর সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে (কেবল) তাদের মাল গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে এবং মযলুমের বদ-দো‘আকে ভয় করবে। কেননা, তার (বদ-দো‘আ) এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।”[111]

এটি মা‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং সাথে সাথে সমগ্র মুসলিম জাতির জন্যও সামষ্টিক অর্থবোধক এমন এক উপদেশ যার কারণে কোনো সম্রাট বা অশুভ শক্তিও তাকে সত্য দর্শন ও নিপীড়িতকে সাহায্য করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। কেননা মযলুম যে কোনো দীনে বিশ্বাসীই হোক মযলুমের দো‘আ এবং আল্লাহ তা‘আলার মাঝে কোনো পর্দা থাকে না। মযলুমের ফরিয়াদ সরাসরি কবুল হয়।

মযলুমের প্রতি সাধারণ বিবেচনায় এমনটিই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রিয় পাঠক! বে-দীন কাফির হওয়ার পরও শুধু মযলুম বিবেচনায় একজন মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরণের উদার নীতি যদি আপনাকে আশ্চর্যান্বিত করে, তাহলে অন্য এক হাদীসে তাঁর আরো চমকপ্রদ কথাটি শুনুন, আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اتقُوا دَعْوَةَ المَظْلُومِ وَإِنْ كانَ كافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ»

---

111. সহীহ বুখারী (كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة من الأغنياء و ترد في الفقراء حيث كانوا) হাদীস নং ১৪২৫; (كتاب الجهاد والسير : باب بعث ابي موسى و معاذبن جبل إلى اليمن قبل حجه) হাদীস নং ৪০৯০; সহীহ মুসলিম (كتاب الإيمان : باب الدعاء إلى الشهادتين و إلى شرائع الإسلام) হাদীস নং ১৯।

"তোমরা মযলুমের আর্তনাদকে ভয় কর, যদিও সে কাফির হয়। মযলুমের দো'আ এবং আল্লাহর মাঝে পর্দা থাকে না।"[112]

ইমাম আহমদ রহ. নিজ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ»

"পাপাচারী হলেও মযলুমের দো'আ কবুল হয়, আর তার পাপাচারের দায়ভার তো তার ওপরই থেকে যায়।"[113]

এসবই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এ কথার প্রকাশ্য বিবৃতি যে, মযলুম এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোনো পর্দা নেই। কাজেই মযলুমের প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কবুল করেন। এজন্যই কোনো সত্যবাদী মুসলিম কখনই যুলুম করতে পারে না। কারণ তার মধ্যে সর্বদা এ অনুভূতিবোধ জাগ্রত থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সব কিছু প্রত্যক্ষ করছেন। মূলত এটি একটি বিশ্বাসগত ব্যাপার, যার কারণে একজন মুসিলম যুলুম করতে পারে না।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে মযলুমকে সাহায্য করবেন, যদি ব্যাপারটা এমনও হয় যে, যালিম মুসলিম আর মাযলুম কাফির। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যালিমের বিরুদ্ধে

---

112. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১২৫৭১, শু'আইব আল-আরনাউত এ হাদীসের সনদকে দুর্বল বক্তব্য করেছেন, আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী তাঁর আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ গ্রন্থে এ হাদীসিটিকে হাসান বলেছেন। দেখুন: আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ (৭৬৭)

113. মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ৮৭৮১, শু'আইব আল-আরনাউত এ হাদীসের সনদকে দুর্বল বক্তব্য করেছেন, আল্লাহা ইবন হাজার তার গ্রন্থ ফতহুল বারীতে এ হাদীনটি হাসান বলেছেন (৩/১৬০), আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী এ হাদীসিটিকে হাসান বলেছেন। দেখুন: সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (৭২২৯), সহীহ আল-জামি' (৩৩৮২)।

মযলুমের পক্ষে অবস্থান নিবেন। এ ক্ষেত্রে তাদের দু পক্ষের ধর্মীয় বিষয় বিবেচিত হবে না।

অতএব, যারা শাশ্বত দীন ইসলামকে আজও চিনতে পারে নি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, দেখ! কতো উদার ও মহৎ আমাদের দীনে ইসলাম, এ তো সেই মহান চরিত্র মাধুর্য্য, যার দ্বারা আমরা সম্মানিত হয়েছি।

দিত্বীয় পরিচ্ছেদ:

সম্পদের লেনদেনে ন্যায়পরায়ণতা

অমুসলিমদের সাথে সম্পদ লেন-দেনের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শন এবং তাদের সাথে কোনো প্রকার যুলুম না করা বিষয়ক এতো বেশি ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, এগুলোর পরিসংখ্যান আনয়ন খুবই কঠিন ব্যাপার। আমি আগত আলোচনায় খুব সহজভাবে অমুসলিমদের সাথে সম্পদের লেন-দেনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ পদ্ধতি উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা চালাবো।

এ বিষয়ে প্রথমেই আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,

«اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ هِبَةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ قَالَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوَى وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ»

“(কোনো এক সফরে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা একশত ত্রিশজন লোক ছিলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন, তোমাদের কারো সাথে কি খাবার আছে? দেখা গেল, এক ব্যাক্তির সঙ্গে এক সা' কিংবা তার কম-বেশি পরিমান খাদ্য (আটা) আছে। সে আটা গোলানো হলো। তারপর দীর্ঘদেহী এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক এক পাল বকরী হাকিয়ে নিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন। বিক্রি করবে, নাকি উপহার দিবে? সে বলল, না বরং বিক্রি করব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন। একশত ত্রিশজনের প্রত্যেককে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বকরীর কলিজার কিছু কিছু করে দিলেন। যে উপস্থিত ছিল, তাকে হাতে দিলেন আর যে অনুপস্থিত ছিলো তার জন্য তুলে রাখলেন। তারপর দু'টি পাত্রে তিনি গোশত ভাগ করে রাখলেন। সবাই তৃপ্তির সাথে খেলেন। উভয় পাত্রে আরো কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম।"[114]

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ চরিত্রমাধুর্য্যের অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। তিনি তো সেই মহানুভব নেতা, যিনি একশত ত্রিশজনের শক্তিশালী সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সকলেই তীব্রভাবে খাদ্যের প্রয়োজনিয়তা অনুভব করছেন, এমতাবস্থায় যখন তার পাশ দিয়ে এক মুশরিক বকরী পাল নিয়ে যাচ্ছে তখনো তিনি কোনোরূপ বল প্রয়োগ ছাড়া তার থেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বকরী কিনে সকলের চাহিদা পূরণ করলন। কিন্তু তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও ঐ সময় বকরী তাদের খুব প্রয়োজন হওয়ার পরও বকরীওয়ালা একজন ভ্রান্ত বিশ্বাসী কাফির হওয়ার পরও তিনি একটি বারের জন্য এ কথা কল্পনা করলেন না যে, মূল্য

---

114. সহীহ বুখারী (كتاب الهبة و فضلها: باب قبول الهبة من المشركين) হাদীস নং ২৪৭৫, (كتاب الاطعمة: باب من أكل حتى شبع) হাদীস নং ৫০৬৭; সহীহ মুসিলম (كتاب الاشربة : باب إكرام الضيف ز فضل إيثاره) হাদীস নং ২০৫৬।

পরিশোধ ব্যতিরেকে জোরপূর্বক অতীব প্রয়োজনীয় বকরী নিয়ে নিবেন। নিশ্চয় এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ন্যায়পরায়ণতা। এ ঘটনাটির যদি আধুনিক কালের ঐ সব উপনৈবেশিক সৈন্য ও সেনাপতিদের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়, যারা কোনো উপত্যকায় অবতরণ করলে তার অধিবাসীগণের সম্ভ্রম ও অধিকার রক্ষা করে না; বরং সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে ও ন্যায়-নিষ্ঠাকে টুটি চেপে হত্যা করে, তাহলে খুব সহজেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরপেক্ষতা ও মহানুভবতার বিষয়টি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে।

আমাদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন এমন এক মহান নেতা, যার সৈনিকদের মধ্যে রাসূলের কাছের কিংবা দূরের কেউই এ কথা কল্পনাও করে না যে, একজন মুশরিকের সম্ভ্রম রক্ষায়ও সীমালঙ্গন করবে। যদিও তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর ছিল।

সম্পদের লেন-দেনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়-নীতির সর্বোত্তম পরাকাষ্ঠার আরো একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে হিজরতের সফর। হিজরতের সফরে তিনি তিনজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে সফর করছিলেন। তারা হচ্ছেন আবু বকর সিদ্দিক ও আমের ইবন ফাহীরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এবং মুশরিক পথ প্রদর্শক আব্দুল্লাহ ইবন উরাইকাহ। চলার পথে তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কারণে যখন একটু দুধের তীব্র প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলেন, তখন একপাল দুগ্ধবতী বকরী নিয়ে পথ চলা এক গোলামের সাক্ষাত পেলেন। কিন্তু তাদের কেহই এ কথা বলেন নি যে, এটি আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মুহুর্ত, কাজেই অনুমতি ছাড়াই কিছু বকরীর ওপর জোরপূর্বক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সেগুলো থেকে দুগ্ধ আহরণ আমাদের জন্য বৈধ হবে; বরং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু গোলামের প্রতি একটু অগ্রসর হয়ে বিনম্রকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মালিক কে? তখন গোলাম কুরাইশের এমন

এক ব্যক্তির নাম বলল, যাকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু চিনলেন...।[115]

প্রিয় পাঠক! এখানে একটু ভেবে দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীবর্গের ন্যায়পরায়ণতা কতো মহৎ ছিল। তারা খুব ভালো করেই জানত যে, এ বকরীগুলো এক মুশরিকের মালিকানাধীন অথচ তখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হন্য হয়ে খুঁজছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা চেষ্টাও আর গোপন বিষয় নয়, তাদের হত্যা মিশন বাস্তবায়নের জন্য তারা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হচ্ছে, তথাপি তারা অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এতোসব প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকার পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীবর্গ অন্যায়ভাবে কোনো মালকে নিজেদের জন্য বৈধ করে নেন নি। অতঃপর আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু 'আনহু গোলামকে জিজ্ঞাস করলেন, তুমি কি আমাদের জন্য কিছু দুধ দোহন করবে? গোলাম বল হ্যাঁ, এবং সেখানে ঐ গোলাম তাঁদের জন্য দুধ দোহন করল আর তাঁরা তা পান করলেন।

পাঠকবৃন্দ! এ ঘটনায় ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুসলিম ফিকহবিদদের আপত্তি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ফকিহদের অনেক মন্তব্য আপনার দৃষ্টিগোচর হবে, যা তারা নিজেদের কিতাবে আলোচনা করেছেন এ মর্মে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ 'আনহু কর্তৃক এমন এক মেষচালক রাখালের কাছে দুধ চাওয়া যে ঐ মেষগুলোর মালিক নয়, এটা বৈধ হয়েছে কি?[116]

আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী ফুকাহাদের এসব প্রশ্নের জবাবে বলেন,

115. সহীহ বুখারী (كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب المهاجرين و فضلهم) হাদীস নং ২৪৭;, সহীহ মুসলিম (كتاب الزهد والرقائق : باب في حديث الهجرة) হাদীস নং ২৪৭৫।

116. ইবন হাজার: ফতহুল বারী (৭/১০)।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ 'আনহু কর্তৃক গোলামকে প্রশ্ন করার অর্থ হলো তোমার প্রতি কি তোমার মালিকের এ সম্মতি রয়েছে যে, মরু-উপত্যকা অতিক্রমকারী তৃষ্ণার্তদেরকে মেহমান হিসেবে দুধ পান করাবে? অথবা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রশ্নের কারণ এও হতে পারে যে, তিনি যখন ঐ গোলামের মালিকের নাম শুনে তাকে চিনতে পারলেন তখন তিনি পূর্ব সম্পর্কের সূত্রে এমনটি উপলব্ধি করলেন যে, ঐ মালিক তার দুধ পান সাদরে মেনে নেবে, কেবল তখনই তিনি গোলামকে দুধ দোহন বিষয়ক প্রশ্নটি করলেন।

সুধী মহল! লক্ষ্য করে দেখুন, এমন এক পেয়ালা দুধ পানের যৌক্তিকতার বিশ্লেষণেও ফুকহাবৃন্দ কতো উৎসুক ছিলেন যে, দুধ পান করেছে এমন ক' জন পরিশ্রান্ত ব্যক্তি যাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজ গৃহ ও মাতৃভূমি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনে এমন অনুপম দৃষ্টান্ত বরংবার চিত্রিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোনো পুরুষ-স্বজনহীন উম্মে মা'বাদ নামীয়া এক অবলা নারীর ঘটনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক। ঘটনার বিবরণ এমন যে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'সাথীসহ উম্মে মা'বাদ আল-খাযাইয়্যাহ[117] এর বাড়িতে প্রবেশ করলেন। সে তখনও মুশরিকা ছিল। সে ছিল একা। তাঁরা ঐ মহিলার নিকট থেকে কিছু খেজুর ও গোশত ক্রয় করতে চাইলেন; কিন্তু ঐ মহিলার কাছে এসবের কিছুই পেলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুর

117. তার পুরো নাম আয়িকাহ বিনতে খালিদ ইবন মুনকিয আল-খাযাইয়্যাহ, আবার কেউ বলেন, আয়িকাহ বিনতে খালিদ ইবন খালীফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথীদ্বয়সহ মদীনায় হিজরতের সময় খাদ্যের সন্ধানে তার তাবুতে গিয়েছিলেন।

এক প্রান্তে একটি বকরী দেখতে পেলেন। এমতাবস্থায় ঐ মহিলা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে যে পরিশীলিত কথোপকথনটি হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: হে উম্মে মা'বাদ! এ বকরীটির কী অবস্থা?

উম্মে মা'বাদ: এটি এমন একটি বকরী যেটিকে ক্লান্তির কারণে অন্য বকরীরা পেছনে রেখে চলে গেছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: এটি থেকে কি কিছু দুধ আসবে?

উম্মে মা'বাদ: এটি ক্লান্তির কারণে দুধ দেওয়া থেকেও অপারগ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম:

«أَ تَأْذَنِيْنَ لِيْ أَنْ أَحْلِبَهَا؟»

"তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, আমি এটিকে দোহন করে দেখব?"[118]

এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরায়ণতা ও খোদাভীতিই লক্ষণীয় বিষয় নয়; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিনম্র চিত্ত ও দয়াদ্র মানসিকতাও অনুধাবন করার মতো বিষয়। মনোযোগ দিয়ে দেখুন, কত নম্রভাবে তিনি অনুমতি চাইলেন। আর এ বিনম্র অনুমতি চাওয়ার কারণেই ঐ মহিলার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

---

118. মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৪২৪৩ এবং তিনি বলেন এ হাদীসের সনদ সহীহ; কিন্তু বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি সংকলন করেন নি। ইমাম যাহাবীও স্বীয় তালখীস গ্রন্থে এ মতটিকে সমর্থন করেছেন। আল্লামা ইবন হাজার তার আল-এসাবাহ (২/১৬৯) গ্রন্থে এ হাদীসটিকে ইমাম বগবী, ইবন শাহীন, ইবন সাকান ও ইবন মানদাহ এর সাথে বর্ণনা সম্পৃক্ত করেছেন। ত্ববরানী আল-কাবীর (৩৬০৫) আবু নাঈম আদ-দালাঈল (পৃষ্ঠা নং ২৮২-২৮৭)।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাওয়াকে ফিরিয়ে দেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তখন মহিলা বলল: আপনার ওপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আপনি যদি একে দোহনযোগ্য মনে করেন তাহলে দোহন করুন।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ঐ মহিলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম চাওয়ায় বকরী ক্লান্তির বাহানায় দুধ না দেওয়ার ঘটনাটা হলো তার ইসলাম গ্রহণের পূর্ব মুহূর্ত। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনম্র স্বভাব, সর্বোত্তম চরিত্রমাধুর্য ও ভাষার কোমলতা দেখল তখন ইসলাম গ্রহণ করলো ও পিতা-মাতাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কুরবান হওযার ঘোষণার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত করল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সম্পদের লেন-দেনে ন্যায়-নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে আরো বড় দৃষ্টান্ত হলো যা তিনি সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ[119] এর সাথে করলেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। তখনও সাফওয়ান মুশরিক ছিল। তখন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুনাইন যুদ্ধের জন্য কিছু যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োজন হলো। আর সাফওয়ান ইবন

119. সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ ইবন খালফ আল-কারশী আল-জামহী। জাহেলী যুগে কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একজন। মুসলিমরা যাদের মন গলানোর চেষ্ঠা করতেন তাদের একজন। তার পিতাকে বদর যুদ্ধে কাফির অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। আর তার চাচা উবাই ইবন খালফকে উহুদ যুদ্ধে কাফির অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যা করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন প্রথম পালিয়ে গেলেও পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে সর্বোত্তম পন্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। আরো অধিক জানতে দেখুন: ইবন আব্দুল বার-এর আল-ইসতি'আব: (২/২৮৪), ইবনুল আসীর এর উসদুল গাবাহ: (২/৪২০), ইবন হাজার-এর আল-ইসাবাহ: (৪০৭২)।

উমাইয়্যাহ ছিল মক্কারই একজন বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী। সে সময় সাফওয়ান বৃহৎ সংখ্যক সমরাস্ত্রের মালিক ছিল। সেই সাথে সে ছিল তখন খুব বিপর্যস্থ ও বশীভূত এবং মক্কায় তার কোনো কাফির সাথীও বিদ্যমান ছিল না। মুসলিমদের সাথে তার অতীত ইতিহাসও ছিল খুব কালিমাযুক্ত। তথাপিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে যুদ্ধাস্ত্রসমূহ ভাড়ায় নিতে চাইলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন হওয়ার পরও তার কাছ থেকে ভাড়ায় যুদ্ধাস্ত্র নিতে চাওয়াতে সে হতভম্ব হয়ে গেল এবং বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য সে প্রশ্ন করল: হে মুহাম্মাদ এটি কি আত্মসাৎ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«لا ، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ»

“না, বরং যামিনের ভিত্তিতে ভাড়া”[120]

তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে ভাড়ায় যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করলেন এবং তিনি নিজে এ কথায় যামিন হলেন যে, যদি কোনো অস্ত্র হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তিনি তার ক্ষতিপূরণ দিবেন।

পাঠকবৃন্দ! এবার আপনারাই বলুন, পৃথিবীর বুকে কোনো কালে কোনো সম্প্রদায়ের ইতিহাসে কি এমন দৃষ্টান্ত খুজে পাওয়া যাবে?!

120. আবু দাঊদ, হাদীস নং ৩৫৬২। আহমাদ, হাদীস নং ১৫৩৩৭। বাইহাকী, হাদীস নং ১১২৫৭। মুতাদরাকে হাকিম,হাদীস নং ২৩০১। হাকিম বলেন, এ হাদীসের সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ; তবে তিনি হাদীসটি সংকলন করেন নি। ইমাম যাহাবীও এ কথাটিকে সমর্থন করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা/নিরপেক্ষতা

অত্র গ্রন্থের বিগত দু'টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরায়ণতা দেখে যদি আমরা আশ্চর্যান্বিত হই। তাহলে এক মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে বিচার ব্যবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়-নিষ্ঠা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আদল একটি সাধারণ বিষয়। যা ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের ভিন্নতায় কোনো স্বার্থ লঙ্ঘন, ভৌগলিক সম্পর্ক কিংবা দুনিয়াবী সূত্রের কারণে তারতম্যের অবকাশ রাখে না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচারে এ ধরনের ঘটনার দৃষ্টান্ত অনেক। তন্মধ্যে একটি হলো,

আনসার গোত্র বনী উবাইরাক ইবন যুফার ইবন হারিস-এর এক মুসলিম ব্যক্তি কতাদাহ ইবন নু'মান নামীয় এক প্রতিবেশীর একটি বর্ম চুরি করল। তার নাম ছিল ত্ব'মা ইবন উবাইরাক, অন্য এক বর্ণনা মতে তার নাম হলো বাশীর ইবন উবাইরাক। আর এ বর্মটি আটা ভরতি একটি খাপে ঢুকানো ছিল। কাজেই চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় খাপের ছিদ্র দিয়ে আটা ছড়াতে ছড়াতে নিজ ঘর পর্যন্ত গেল। তার পর সেটি যায়িদ ইবন সামীন নামীয় এক ইয়াহূদীর কাছে লুকিয়ে রাখল। অতপর ত্ব'মা ইবন উবাইরাকের কাছে বর্মের অনুসন্ধান চাইলে সে বর্ম নেয় নি মর্মে আল্লাহর নামে শপথ করল। তখন বর্মের মালিক বলল, আমি তার ঘরে আটার চিহ্ন দেখেছি। তারপরও যেহেতু সে শপথ করেছে তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং সকলে মিলে আটার চিহ্ন অনুসরণ করে করে ঐ ইয়াহূদীর ঘর পর্যন্ত পৌঁছল এবং সেখানে বর্মটি পেয়ে গেল। তখন চাপের মুখে ইয়াহূদী স্বীকার করল যে, ত্ব'মা ইবন উবাইরাক আমাকে এটি দিয়েছে। ত্ব'মা ইবন উবাইরাকের এলাকাবাসী বনু

যুফারের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাদের সাথীর স্বপক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইয়াহূদীর ঘরে বর্ম পাওয়া গেছে তাকে শাস্তি দেওয়ার মনস্থ করলেন। তখন সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٠٦ وَلَا تُجَٰدِلۡ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمٗا ١٠٧﴾ [النساء: ١٠٥، ١٠٧]

“নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাসঘাতক পাপী হয়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৫-১০৭]

একসাথে নিম্নের আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়:

﴿وَمَن يَكۡسِبۡ خَطِيٓـَٔةً أَوۡ إِثۡمٗا ثُمَّ يَرۡمِ بِهِۦ بَرِيٓـٔٗا فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ١١٢﴾ [النساء: ١٠٤- ١١٢]

“যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোনো নিরপরাধের ওপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গুনাহ।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৫-১১২][121]

121. তিরমিযী: কাতাদাহ ইবন নু'মান থেকে, হাদীস নং ৩০৩৬, ইমাম তিরমিযি বলেছেন, এটি গারীব হাদীস। হাকিম (৪/৩৮৫-৩৮৮) তিনি বলেছেন, এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ; তবে বুখারী মুসলিমের কেউই এটি সংকলন করেন নি। তিনি তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থেও এটিকে ইবনুল মুনযির ও আবুশ- শায়খ ইস্পাহানীর নামে চালিয়ে

আটার নিদর্শন ও ঘরে বর্ম পাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা ছিল যে, ইয়াহূদী লোকটিই চোর। কিন্তু তাঁর ধারণার বিপরীতে অহী নাযিল হলে তিনি তা লুকিয়ে রাখেন নি; বরং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, ইয়াহূদী নিরপরাধ, চোর হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তিটি..!

ব্যাপারটি কিন্তু এতো সহজ নয়..!!

দেখুন, সাফায়ীর ঘোষণা এসেছে ইয়াহূদী ব্যক্তির পক্ষে। যে ইয়াহূদী জাতি ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করা, ষড়যন্ত্র করা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো এবং তাঁর অনুসারীদের মাঝে ফাটল সৃষ্টিতে সদাতৎপর থাকে। এতো কিছুর পরও এসব নেতিবাচক দিক ও প্রেক্ষাপটগুলোও একজন ইয়াহূদীকে অযথা দোষারোপ করার অনুমতি দেয় না। আরো দেখুন, অভিযোগটি দাঁড়িয়েছে এক আনসারী মুসলিম ব্যক্তির বিপক্ষে। আপনি জানেন কি, কারা এ আনসার.?! তার ঐসব লোক যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দূরাবস্থার সময় সাহায্য করেছে, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছে। যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভেতর বাহির সব। যারা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার। যাদের কাঁধের উপর দিয়েই মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভীত রচিত হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুও তাদের একজন চোরের পক্ষাবলম্বন ও সাফায়ী ঘোষণার

দিয়েছেন। অধিকতর জানতে- তাফসীরুত তাবারী (৪০/২৬৫), তাফসীরুল কুরতুবী (৩/৩২৭), তাফসীরে ইবন কাসীর (১৫/৭৩১), শাওকানী: ফতহুল কাদীর (১/৭৭১), তাফসীরুল বাগবী (১/২৮৩), তাফসীরুল বায়যাবী (১/২৪৭), তাফসীরুল জালালাইন (১/১২০), আল্লামা ওয়াহেদী: আল-ওয়াজীয (১/২৮৭), তাফসীরু আবিস-সা'ঊদ (২/২২৯), আল্লামা সুয়ূতী: আদ-দুররুল মানসূর (২/৬৭১), তাফসীরুন নাসাফী (১/২৪৬), আল্লামা আলূসী: রুহুল মা'আনী (৫/১৪০), ইবনুল জাওযী: যাদুল মাসীর (২/১৯০), ইবন 'আশূর: আত-তাহরীর ওয়াত-তানবীর (১/১০২১), মা'আনী আল-কুরআন (২/১৮৫)।

অনুমোদন দেয় নি; যদিও প্রতিপক্ষের লোকটি একজন ইয়াহূদী। উপরন্তু এ ঘটনাটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের জন্য ইয়াহূদীদেরকে নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে দেবে। ইয়াহূদীরা বলে বেড়াবে যে, দেখ, মুসলিমরা হলো চোরের জাতি। তারা নিজেরা অপরাধ করে তার দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। তারা অত্যাচারীর পক্ষ অবলম্বন করে। তারা মিথ্যা কথা বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের চরিত্রে ধারাবাহিক কুৎসা রটনা ও কলঙ্ক লেপনে ইয়াহূদীদের জন্য এক মহা সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

এতকিছুর পরও সত্যের সত্যায়ন ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

এ ঘটনায় আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য শুধু একজনের দায়মুক্তি ও অন্যজনের ওপর অভিযোগ আরোপ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ ঘটনার মাধ্যমে তিনি উম্মতে মুসলিমাকে পৃথিবীর শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যাবতীয় যুলুম-নির্যাতনের মূলোৎপাটনের দীক্ষা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে মূলনীতি ঘোষণা করেছেন যে, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে কোনো স্বার্থ লঙ্ঘন, ভৌগলিক সম্পর্ক কিংবা পার্থিব কোনো ইস্যু দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মানুষের মাঝে সত্য ফয়সালা করতে হবে।[122]

বরাবরের মতো আবারো আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যে, উম্মতে মুসলিমা ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের ইতিহাসে কি এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে..?! সত্য প্রকাশ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সততা ও উদারতা প্রদর্শনে পৃথিবীর কোনো নেতা কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারে কাছেও পৌঁছতে পেরেছে..?!!

এখানে এ কথাও উল্লেখ করে দেওয়া জরুরী যে, পূর্বোক্ত ঘটনায় যে মুসলিম

122. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন (২/৭৫৩)।

ব্যক্তিটি নিজে চুরি করে ইয়াহূদীর ওপর দায় চাপিয়ে দিয়েছিল সে ছিল প্রকৃত অর্থে মুনাফিক। যা এ ঘটনার পরে প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম তিরমিযী বর্ণিত একটি হাদীসে এ ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাদীসটি হচ্ছে:

কাতাদাহ ইবন নু'মান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমাদের আনসারদের মধ্যে বনু উবাইরিক নামীয় একটি পরিবারে তিন ভাই ছিল। বাশার, বশীর ও মুবাশ্শির। বশীর ছিল মুনাফিক। সে কবিতা চর্চা করতো। কবিতায় সে সাহাবীদেরকে কটুক্তি করতো এবং আরবের অন্যান্য কবিদের নামে তা চালিয়ে দিতো। বলতো যে, অমুক কবি এমন বলেছে, অমুক কবি এমন এমন বলেছে। সাহাবীগণ তার কথা শুনে নিজেরা বলাবলি করতো যে, আল্লাহর শপথ এ ধরণের কথা এ ইতর লোকটিই বলেছে। বশীর ইবন উবাইরিকই এগুলো বলেছে। (বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন), জাহেলী যুগে ও ইসলাম পরবর্তী সময়ে এটি ছিল অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার। সে সময় মদীনার মানুষের খাবার ছিল খেজুর ও যব। তবে কারো সামর্থ্য থাকলে সে শামের দিক থেকে আগমনকারী বণিক কাফেলার নিকট থেকে ময়দা ক্রয় করতো যা ক্রয়কারী নিজেই খেতো। পরিবারের অন্যদের খাবার খেজুর ও যবই হতো। একবার শামের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা আসলে আমার চাচা রিফা'আহ ইবন যায়েদ তাদের নিকট থেকে ময়দার একটি পুটলী ক্রয় করে নিজের যে ঘরে বর্ম, তরবারী ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র থাকতো সে ঘরে রাখলেন। একদিন কে যেন ঘরে সিদ কেটে চুরি করে আটা ও অন্যান্য সামানা সব নিয়ে যায়। সকালে আমার চাচা রিফা'আহ আমার নিকট এসে বলল, ভাতিজা! গতরাতে আমার প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আমার ঘরে সিদ কেটে চুরি করে আটা ও অন্যান্য সামানা সব নিয়ে গেছে। অতঃপর আমরা যখন খোজ-খবর নিতে লাগলাম তখন মহল্লার লোকেরা বলল, আজ রাতে আমরা বনু উবাইরিককে আগুন জালাতে দেখেছি। আমাদের তো মনে হয়

তোমাদের খাদ্যের ওপরই আগুন জালানো হয়েছে। বনু উবাইরিককে জিজ্ঞাস করা হলে তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমাদের মনে হয় চোর হচ্ছে তোমাদের মুসলিম ও নেককার ভাই লাবীদ ইবন সাহাল। লাবীদ ইবন সাহাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এটি শোনে তরবারী উত্তোলন করে বললেন, আমি করবো চুরি?! আল্লাহর শপথ! হয়তো তোমরা এ চুরির বাস্তবতা প্রকাশ করবে নয়তো তোমাদের ওপর আমার তরবারীর ধার পরীক্ষা করে নেবো। তারা বলল, তুমি তোমার তরবারী নিয়ে থাক, তুমি চোর নও। অতঃপর আমরা মহল্লায় আরো খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হলাম যে, বনু উবাইরিকই চোর। এরপর আমার চাচা আমাকে বলল, ভাতিজা! তুমি যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘটনাটি জানাতে তাহলে ভালো হতো। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের একটি পরিবার আমার চাচা রিফা 'আহ ইবন যায়েদের ওপর যুলুম করেছে। তার ঘরে সিদ কেটে চুরি করে আটা ও অন্যান্য সামানা সব নিয়ে গেছে। এখান খাদ্য-দ্রব্যের আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা আমাদের যুদ্ধাস্ত্রগুলো ফেরত চাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অতি সত্ত্বর এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। বনু উবাইরিক এটি জানতে পেরে তাদের এক ব্যক্তি আসীর ইবন উরওয়াহ'র নিকট গিয়ে ঘটনা জানাল এবং স্বগোত্রীয় অনেকগুলো লোক একত্র হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরয করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! রিফা'আহ ও তার চাচা আমাদের এক সৎ ও মুসলিম পরিবারের ওপর দলিল প্রমাণ ছাড়া চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি একটি সৎ মুসলিম পরিবারকে প্রমাণ ছাড়া চুরির অপবাদ দিচ্ছ কেন? (কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন), এটি শোনে আমি বেরিয়ে আসলাম

আর মনে মনে বললাম, হায়! যদি আমার কিছু সম্পদ চলে যেত এরপরেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতাম না। এরপর আমার চাচা রিফা‘আহ এসে বলল, ভাতিজা! কী করতে পারলে? আমি তাকে ঘটনা জানালাম। সে বলল, আল্লাহই সাহায্যকারী। এরপর বেশি দেরি হয় নি। ইতোমধ্যে কুরআন আয়াত নাযিল হল:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا١٠٦﴾ [النساء: ١٠٥-١٠٦]

“নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের (বনু উবাইরিকের) পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না। এবং আল্লাহর কাছে (কাতাদাহকে যা বলেছেন সেজন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৫-১০৬]

আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধাস্ত্রগুলো নিয়ে আসা হলে তিনি তা রিফা‘আহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফিরিয়ে দিলেন। (কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন), আমি যুদ্ধাস্ত্রগুলো নিয়ে চাচা রিফা‘আহ’র নিকট আসলাম। সে জাহেলী যুগেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং আমি মনে করতাম তার ঈমানে কিছুটা খটকা আছে। যুদ্ধাস্ত্রগুলো নিয়ে আসা হলে সে বলল, ভাতিজা! আমি এগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম। এতে আমি বুঝলাম যে, তার ইসলাম গ্রহণ খাঁটিই ছিল। আয়াত নাযিলের পর বশীর মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়ে যায় এবং সুলাফাহ বিনত সা‘আদ ইবন সুমাইয়ার নিকট গিয়ে অবস্থান নেয়। এরপর আয়াত নাযিল হয়:

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ١١٦﴾ [النساء: ١١٥، ١١٦]

“যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলিমের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫-১১৬]

বশীর সুলাফাহ’র নিকট গিয়ে অবস্থান করার পর হাসসান ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কয়েকটি কবিতায় সুলাফাহ’র নিন্দাবাদ করেন। ফলে সুলাফাহ বশীরের সামানাপত্র সব মাথায় তুলে বাইরে এনে ফেলে দেয় এবং বলে যে, তুমি কি আমার জন্য হাসসানের কবিতার হাদিয়া নিয়ে এসেছ? তোমার দ্বারা কখনো আমার কোনো উপকার হয় নি।[123] অন্য বর্ণনাতে আছে সে মুরতাদ হয়ে পালিয়ে মক্কা চলে যায় এবং সেখানেই মারা যায়।”[124]

এ ঘটনায় ইয়াহূদীর পক্ষে মুসলিমের বিরুদ্ধে রায়টি সে মুসলিমের ঈমানের দুর্বলতা কিংবা নিফাকের কারণে নয়; বরং তার অপরাধী হওয়ার কারণেই হয়েছে। কেননা, শরী‘আত কারো জন্য একান্ত নয় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ সাহাবী ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি কোনোরূপ স্বজনপ্রীতি করতেন না।

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি এ ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট ধারণা পেতে চান এবং

---

123. তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৩৬, আবু ঈসা বলেছেন, হাদীসটি গারীব। আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী একে হাসান বলেছেন।

124. তাফসীরে ইবন কাসীর (২/৪০৬,৪০৭), ইমাম রাযী: মাফাতীহুল গাইব (৫/৩৬৯)।

এ বাস্তবতাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চান তাহলে সামনের ঘটনাটির প্রতি লক্ষ্য করুন যা ঘটেছিল এক ইয়াহূদী ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত স্নেহভাজন একজন গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত সাহাবীর মধ্যে। তিনি হলেন জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।[125] বাল্যকালে আক্বাবার দ্বিতীয় শপথে পিতা আব্দুল্লাহ ইবন হারাম[126] রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে উপস্থিত ছিলেন। উহুদ থেকে শুরু করে ইসলামের সবগুলো বড় বড় ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।[127]

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদীনায় এক ইয়াহূদী ছিল। সে আমাকে কর্জ দিত! আমার খেজুর পাড়ার মেয়াদ পর্যন্ত। (রাওমা নামক স্থানে পথের ধারে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক খণ্ড জমি ছিল)। একবার আমি কর্জ পরিশোধে এক বছর বিলম্ব করলাম। এরপর খেজুর পাড়ার মৌসুমে ইয়াহূদী আমার কাছে আসলো, আমি তখনো খেজুর পাড়তে পারি নি। আমি তার কাছে আগামী বছর পর্যন্ত অবকাশ চাইলাম। সে অস্বীকার করল। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান হলো। তিনি সাহাবীদের বললেন, চলো জাবিরের জন্য ইয়াহূদী থেকে

---

125. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হারাম। বাল্যকালে আক্বাবার দ্বিতীয় শপথে পিতার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আঠারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্যতম। অধিকতর জানতে- ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (১/৩৫১), ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতি‘আব (১/২৯২), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (১০২২)।

126. আব্দুল্লাহ ইবন হারাম আস-সুলামী আল-আনসারী। আক্বাবার শপথের সময় প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। বদরেও ছিলেন। তিনি ছিলেন উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের প্রথম ব্যক্তি। তাকে এবং আমর ইবনুল জুমূহকে একই কবরে দাফন করা হয়। অধিকতর জানতে- ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতি’আব (৩/৮৪), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (৪৮৩৬)।

127. ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (৩/২৪১)।

অবকাশ নিই। তারপর তারা আমার বাগানে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীর সাথে এ নিয়ে কথাবার্তা বললেন। সে বললো, হে আবুল কাসিম। আমি তাকে আর অবকাশ দেব না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তার এ কথা শুনে উঠলেন এবং বাগানটি প্রদক্ষিণ করে তার কাছে এসে আবার আলাপ করলেন। সে এবারও অস্বীকার করল। এরপর আমি উঠে পিঠে সামান্য কিছু তাজা খেজুর নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখলাম। তিনি কিছু খেলেন। তারপর বললেন, হে জাবির! তোমার ছাপড়াটা কোথায়? আমি তাকে জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, সেখানে আমার জন্য বিছানা দাও। আমি বিছানা বিছিয়ে দিলে তিনি এতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হলে আমি তার কাছে এক মুষ্টি খেজুর নিয়ে আসলাম। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর উঠে আবার ইয়াহূদীর সাথে কথা বললেন। সে অস্বীকার করলো। তখন তিনি দ্বিতীয়বার খেজুর বাগানে গেলেন এবং বললেন, হে জাবির তুমি খেজুর কাটতে থাক এবং কর্জ পরিশোধ কর। এ বলে, তিনি খেজুর পাড়ার স্থানে অবস্থান করলেন, আমি খেজুর পেড়ে ইয়াহূদীর পাওনা শোধ করলাম। এরপর আরও সে পরিমাণ খেজুর উদ্বৃত্ত রইল। আমি বেরিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সুসংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, তুমি স্বাক্ষী থাক যে, আমি আল্লাহর রাসূল।”[128]

এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। যেখানে জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এক ইয়াহূদী থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। ঋণ পরিশোধের সময় এসে গেছে অথচ তার কাছে ঋন পরিশোধের মত কিছু নেই। জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র সাহাবী। তাই তিনি ইয়াহূদীর নিকট এক বছরের সময় চাচ্ছেন। কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধের জন্য

---

128. সহীহ বুখারী: (كتاب الأطعمة، باب الرطب و التمر) হাদীস নং ৫১২৮।

পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অবশেষে জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাপারটি জানালেন এবং তাদের মাঝে মধ্যস্থতা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে সুপারিশ করার জন্য ইয়াহূদীর নিকট গেলেন। কিন্তু ইয়াহূদী কোনো ভাবেই রাজি হল না। সে বার বার একই কথা বলল যে, হে আবুল কাসিম! আমি তাকে আর অবকাশ দেব না।

এ ঘটনা ঘটেছে গোটা মদীনার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত স্নেহভাজন এক সাহাবী এবং মদীনারই আরেক সাধারণ যিম্মী ইয়াহূদী নাগরিকের সাথে। ঋণী ব্যক্তি শুধু সময় চাচ্ছেন। টালবাহানাও করছেন না আবার অস্বীকারও করছেন না। উপরন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করলেন; কিন্তু ইয়াহূদী মানলো না। এতকিছুর পরও আমাদের নেতা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীকে সুপারিশ গ্রহণে বাধ্য করলেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীর দূর্বলতার দিকে তাকালেন না। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসাকেও দৃষ্টির আড়াল করে দিলেন। না তাকালেন ইয়াহূদীর অতীতের দীর্ঘ কালো ইতিহাসের দিকে। এসবের কিছুই তিনি লক্ষ্য করেন নি; বরং তিনি শুধু উত্তমভাবে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।

পাওনাদার একজন ইয়াহুদী। পরিশোধের সময়ও এসে গেছে। সুপারিশও প্রত্যাখ্যাত। তাই পরিশোধ করতেই হলো। রায় ইয়াহূদীর পক্ষেই গেল। যদিও তা ছিল একজন সম্মানিত সাহাবীর ছেলে সাহাবীর বিরুদ্ধে।

এটিই ইসলাম...!

এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত্রিমতা কিংবা সংযম প্রদর্শন কিছুই নয়; বরং এটি ছিল দীনের বিধানের স্বাভাবিক বাস্তবায়ন মাত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥﴾ [النساء: ١٣٥]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৫]

দারিদ্র্যের কারণে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সহানুভুতিও তার পক্ষে ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার অনুমতি দেয় না। ফাতহুল কাদীরে আল্লামা শাওকানী -কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয় -একথার ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, প্রতিপক্ষ যদি ধনী হয় তাহলে তার সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া কিংবা তার ক্ষতি থেকে বাচার জন্য তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না। আবার যদি দরিদ্র হয় তাহলে তার প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন পূর্বক তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া থেকেও বিরত থাকা যাবে না।[129]

---

129. আল্লামা শাওকানী: ফাতহুল কাদীর (১/৭৯০)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:

ব্যক্তিগত অধিকার হরণকারীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরায়ণতা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায়পরায়ণাতার প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এমনকি যদি সেটা নিজের ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়েও হতো। আর এর দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচারে অনেক অ-নে-ক। কিন্তু অত্র গ্রন্থে আমরা শুধুমাত্র অমুসলিমদের সাথে ঘটমান অবস্থাগুলোই তুলে ধরার প্রয়াস চালাব। কাজেই এখানে সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর অনুসারীদের সাথে ঘটমান অনন্য ন্যায়পরায়ণতার ঘটনাবলীর প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করব না; বরং অমুসলিমদের সাথে ঘটমান কিছু অনুপম ঘটনার বিবরণ উপস্থাপনেই সীমাবদ্ধ থাকব।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«دَخَلَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ»

“ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল। অতঃপর তারা বলল, ‘আস-সামু[130] আলাইকুম’ তোমাদের ওপর মৃত্যু আসুক। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি এ কথার অর্থ বুঝলাম এবং বললাম, ‘ওয়া আলাইকুমুস-সামু ওয়ালা‘নাহ’ তোমাদের ওপরও মৃত্যু ও লা‘নত আসুক। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থাম, হে আয়েশা! আল্লাহ সকল কাজে নম্রতা ভালোবাসেন। অন্য এক বর্ণনা মতে হে আয়েশা! তুমি সহিংসতা ও অশ্লীলতা

---

[130] আসসামু অর্থ মৃত্যু, ইবনুল মানযুর: লিসানুল আরব سوم অধ্যায় (১২/৩১৪)

মুক্ত থাক। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অপনি কি শোনেন নি তারা কী বলেছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিও তো বলেছি 'ওয়া আলাইকুম' এবং তোমাদের ওপরও।"[131]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই মহানুভব ও সাম্যের প্রতিক ছিলেন যে, তিনি মদীনায় ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পরও একদল ইয়াহূদী তাঁর কার্যালয়ে প্রবেশ করে সামনাসামনী তাঁর মৃত্যু কামনা করল। ইয়াহূদীরা এ ক্ষেত্রে যে কুটকৌশলের অপচেষ্টা করল তা এ যে, 'সালাম' শব্দের প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ 'সাম' ব্যবহার করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোকা বানিয়ে পাশ কেটে পার পেয়ে যেতে চাইল আর সীদ্ধান্ত নিয়ে রাখল যে, যদি এ জন্যে তিনি তাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেন তাহলে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে দিবে আমরা তো 'আস-সালামু' বলেছি। অথচ বাস্তবতা তো এ যে, তারা যা বলতে চেয়েছে তার সবই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোভাবেই শুনেছেন এবং বুঝেছেন। তা ছাড়া আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনিও সেভাবে শুনেছেন। তারপরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যু কামনার মতো গুরুতর অপরাধের জন্য বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। বললেন না যে, আমি এবং আয়েশাই তোমাদের বিপক্ষের সাক্ষী। পক্ষান্তরে তিনি ভদ্রতাসূচক শব্দ 'ওয়া আলাইকুম' তোমাদের ওপরও বলে তাদের কথার জবাব দিলেন। শুধু তাই নয়; বরং তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সহিংসতা ও কঠোরতা থেকে নিষেধ করে সকল ক্ষেত্রে বিনম্র আচরণের আদেশ দিলেন। এমনকি সেটা

131. সহীহ বুখারী (كتاب الأدب: باب الرفق في الأمر كله) হাদীস নং ৫৬৭৮; সহীহ মুসলিম (كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام و كيف يرد عليهم) হাদীস নং ২১৬৫

যদি নিজের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু কামনাও হয়।

এর চেয়েও চমকপ্রদ ঘটনা হচ্ছে ইয়াহূদী পণ্ডিত যায়েদ ইবন সা'নাহ-এর সাথে সংঘটিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান। যায়েদ ইবন সা'নাহ বলেন, আমি মুহাম্মাদ (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেহারায় দৃষ্টিপাত করে দু'টি ছাড়া নবুওয়তের বাকী সকল নিদর্শন চিনতে পেরেছি। আমি ঐ দু'টি নিদর্শন তাঁর থেকে যাচাই করতে পারি নি।

«يسبق حلمه جهله، ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما»

"তাঁর ধৈর্য ক্রোধ থেকে অগ্রগামী হবে। কারো প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতাও তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারবে না।"

যায়েদ ইবন সা'নাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে কক্ষ থেকে বের হলেন এমতাবস্থায় রাখাল শ্রেণির মতো এক লোক নিজ বাহনে আরোহিত অবস্থায় তাঁর সামনে এলো। অতঃপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক গোত্রের গ্রামবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর ইতোপূর্বে আমি তাদেরকে এ মর্মে অবহিত করেছিলাম যে, যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ রিযিক প্রাপ্ত হবে, অথচ এখন অনাবৃষ্টির কারণে তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। হে আল্লাহর রাসূল, এহেন অবস্থায় আমি ভয় পাচ্ছি যে, ঐ লোকগুলো যেমন আশাবাদী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তেমনি দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার তাগিদে আবার ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় কি না? অতএব, আপনি যদি মুনাসিব মরে করেন তাহলে তাদের নিকট এমন কাউকে প্রেরণ করুন যে তাদেরকে সাহায্য করবে।

যায়েদ ইবন সা'নাহ বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগন্তুকের পাশে এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তিনি

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু। তখন উমার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তির আর কিছু বলার নেই।

যায়েদ ইবন সা'নাহ বলেন, তখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম এবং বললাম: হে মুহাম্মাদ! আপনি কি আমার কাছে অমুক গোত্রের বাগানের নির্ধারিত পরিমাণ খেজুর অমুক মেয়াদে বিক্রি করবেন? তিনি বললেন, হে ইয়াহূদী এমনটি নয়; বরং নির্ধারিত পরিমাণ খেজুর অমুক মেয়াদে বিক্রি করব। তিনি কোনো নির্দিষ্ট বাগানের নাম উল্লেখ করেন নি। আমি বললাম, ঠিক আছে। তখন তিনি আমার কাছে খেজুর বিক্রি করলেন, আমি আমার টাকার থলি[132] বের করলাম এবং নির্ধারিত মেয়াদে নির্ধারিত খেজুরের জন্য তাঁকে আশিটি স্বর্ণ মুদ্রা দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণমুদ্রাগুলো আগন্তুককে দিলেন এবং বললেন খুব দ্রুত ঐ গোত্রে চলে যাও এবং তাদের সাহায্য কর। যায়েদ ইবন সা'নাহ বলেন, চুক্তি অনুযায়ী দুই বা তিন দিন মেয়াদ অবশিষ্ট থাকাবস্থায় একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর, উমার, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ একদল সাহাবীকে নিয়ে এক আনসার ব্যক্তির জানাযায় শরীক হলেন। জানাযা শেষে একটি দেয়ালের কাছে তিনি বসলেন। তখন আমি গিয়ে তাঁর জামার কলার টেনে ধরলাম এবং তাঁর দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকালাম। আর বললাম হে মুহাম্মদ! তুমি আমার অধিকার কেন আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ না? আল্লাহ কসম! হে আব্দুল মোতালিবের সম্প্রদায়, তোমরা তো টালবাহানাকারী গোত্র। তোমাদের টালবাহানার ব্যাপারে আমি পূর্ব থেকেই জ্ঞাত আছি।

যায়েদ ইবন সা'নাহ বলেন, তখন আমি উমার ইবনুল খাত্তাবের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, ক্ষোভে তার চক্ষুদ্বয় ঘুর্ণায়মান নক্ষত্রের মতো

132. খোরপোশের ব্যায় রাখার থলি। যা কোমরে বেধে রাখা হয়। ইবন হাজার আসকালানী: ফাতহুলবারী(৩/৩৯৭), ইবন মানযুর: লিসানুল আরব (مادة: همي) (১৫/৩৬৪।

তার চেহারায় আন্দোলিত হচ্ছে। অতঃপর আমার ওপর রূঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল: হে আল্লাহর দুশমন! তুমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যা করেছ এবং বলেছ আমি তা শুনেছি ও দেখেছি?! আফসোস! শপথ ঐ আল্লাহর যিনি তাঁকে সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি হারানোর ভয়[133] না করতাম তাহলে আমার এ তরবারি দ্বারা তোমার গর্দান কেটে ফেলতাম। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমারের দিকে শান্ত ও ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, অতঃপর বললেন, হে উমার! আমি এবং সে তোমার কাছে এর থেকে ভিন্নতর কিছুর আশা করেছিলাম। আমরা আশাবাদী ছিলাম যে, তুমি আমাকে উত্তমভাবে পরিশোধের অনুরোধ করবে এবং তাকে উত্তম পন্থায় চাওয়ার আদেশ করবে। হে উমার! তুমি একে নিয়ে যাও এবং তার পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা কর। আর তুমি তাকে ধমকানোর কারণে বিশ সা‘ খেজুর বেশি দিয়ে দিবে।

যায়েদ বলেন, উমার আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার পাওয়া আদায় করে দিল, সাথে বিশ সা‘ খেজুর বেশি দিল। তখন আমি তাকে বললাম, অতিরিক্ত কী জন্যে দিচ্ছেন? উত্তরে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তোমাকে ধমকানোর জন্যে এ অতিরিক্তগুলো দিয়ে দিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

(যায়েদ বলেন), আমি বললাম, হে উমার! তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ? উমার বললেন, না, তুমি কে? তখন আমি বললাম, আমি যায়েদ ইবন সা‘নাহ, তিনি বললেন. ইয়াহূদী পণ্ডিত? আমি বললাম হ্যাঁ। আমিই পণ্ডিত।

---

133. রাসূলের পথ ও নির্দেশ অমান্য হওয়া যার কারণে আল্লাহ ও তার রাসুলের সন্তুষ্টি হারানোর ভয়। কেননা সে যে পরিমাণ অপরাধ করেছে, তাতে তাকে হত্যা করা বৈধ হয় না।

উমার বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা বললে এবং যে জঘন্য আচরণ করলে তা করতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? যায়েদ বলেন, আমি বললাম হে উমার, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় দৃষ্টিপাত করে দু'টি ছাড়া নবুওয়তের বাকী সকল নিদর্শন চিনতে পেরেছি। আমি যে দু'টি নিদর্শন তাঁর থেকে যাচাই করতে পারি নি তা হচ্ছে-

এক. তাঁর ধৈর্য তাঁর ক্রোধ থেকে অগ্রগামী হবে।

দুই. কারো প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতাও তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারবে না।

এখন আমি এ দুইটাও যাচাই করে নিয়েছি। অতএব, হে উমার! আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, 'আমি আল্লাহকে আমার রব হিসেবে, ইসলামকে আমার দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে মেনে নিচ্ছি।' আমি আপনাকে এ কথারও সাক্ষ্য রাখছি যে, আমার পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে তা থেকে অর্ধেক উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য দান করে দিলাম। এ কথা শুনে উমার বললেন, উম্মতে মুহাম্মাদীর কিছু লোকের জন্য তুমি দান কর। কেননা সকলের জন্য দান করার সামর্থ্য তোমার নেই। তখন আমি বললাম, কিছু লোকের জন্যই আমার দান। অতঃপর উমার এবং যায়েদ উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এলেন এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন,

«أَشْهَدُ انْ لَا إله إلا اللّٰه و أن محمداً عبده و رسوله»

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"[134]

---

[134]. ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২৮৮; মুসতাদরাক আল-হাকিম, হাদীস নং ৬৫৪৭; বায়হাকী, হাদীস নং ১১০৬৬। হাকিম বলেন এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ যদিও হাদীসটি বুখারী ও

প্রিয় পাঠক! আপনি ঐ ইয়াহূদীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এ মর্মে পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চালিয়েছে যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোধকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে। আর এর দ্বারা সে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতাও যাচাই করে নিতে পারে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অহী ছাড়া অদৃশ্যের ইলম জানতেন না। উক্ত ঘটনায়ও এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যার দ্বারা ইয়াহূদীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ হবে। সে তার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তীব্র ক্রোধান্বিত করে তুলতে পারে এবং এ জন্য সে এমন একাধিক পন্থা অবলম্বন করেছে যার কোনো একটিতেই সাধারণ মানুষ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যেত।

প্রথমত: সে নির্ধারিত সময়ের পুর্বেই তার পাওনা চাইতে এসেছে। যে সময়ে চাওয়ার অধিকারই সে রাখে না।

দ্বিতীয়ত: সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার কলার ও চাদরের সম্মুখভাগ কাছে ভিড়ানোর জন্য টেনে ধরেছে!! প্রিয় পাঠক! আপনি সে দৃশ্যটি একটু কল্পনা করে দেখুন যে, প্রকাশ্য জনসম্মুখে সাহাবাগণের মধ্যখানে এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার কলার ও চাদর টেনে ধরেছে। এটি কত বড় দৃষ্টতা!!

তৃতীয়ত: সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে কপট দৃষ্টিতে তাকিয়েছে।

চতুর্থত: সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো উপাধি বা উপনাম ব্যতিরেকে দৃষ্টতাবশত সরাসরি নাম ধরে ডেকেছে, হে মুহাম্মাদ

মুসলিম তাখরীজ করেন নি। ত্বাবরানী বলেন, এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তুমি কি আমার পাওনা পরিশোধ করবে না?

পঞ্চমত: সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পূর্বসুরীগণ সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে বলেছে যে, আল্লাহর কসম, তোমরা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরেরা টালবাহানাকারী গোত্র।

সূধীবৃন্দ! এ পাঁচটি কারণে যে ধরণের সীমালঙ্ঘণ ও আগ্রাসী চিত্র ফুঠে উঠেছে তার সাথে আপনি এ বিষয়টিও যোগ করে ভেবে দেখুন যে, ঐ ইয়াহূদী এ দৃষ্টতাগুলো প্রদর্শন করছে এমন একজনের সাথে যিনি মদীনার প্রধান নেতা এবং মদীনার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। শুধু তাই নয় সে সময়টাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছিলেন মুহাজির ও আনসারদের দ্বারা অর্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার ষোলকলা বেষ্টনিতে। এ সকল প্রেক্ষাপট নিয়ে যদি আপনি ভাবেন তাহলে আপনিসহ অধিকাংশ মানুষই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, এ ধরণের সীমালঙ্ঘনকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বৈ কিছুই হতে পারে না। শুধু মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিটুকুও তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ শাস্তির প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা ইতিহাস অবলোকন করেছি। আমাদের মনোজগতকে স্তব্ধ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করেছেন?!!

তিনি সকল আক্রমনাত্মক অভিব্যক্তিকে হজম করে নিয়েছেন। আমি একথা বলব না যে, তিনি শুধুমাত্র তাকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা বা বিবেচনাবোধের জন্য এমনটি করেছেন; বরং তিনি স্থির-মানসে মুসকি হেসে হর্ষচিত্তে সব কিছু মেনে নিয়েছেন। যেমনটি যায়েদ ইবন সা'নাহ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমারের দিকে শান্ত ও ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, অতঃপর বললেন, হে উমার! আমি এবং সে তোমার কাছে এর থেকে ভিন্নতর কিছু আশা করেছিলাম।

আমরা আশাবাদী ছিলাম যে, তুমি আমাকে উত্তমভাবে পরিশোধের অনুরোধ করবে এবং তাকে উত্তম পন্থায় চাওয়ার আদেশ করবে!!

এ ধরণের উন্নত চরিত্র মাধূর্যের তাৎপর্য অনুধাবন করা সাধারণ রাজন্যবর্গ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রকারান্তে সকল মানুষের জন্যই অসাধ্য ও অকল্পনীয় ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয় দেখুন! তিনি উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধের নসীহতের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অথচ তখনও ঋণ পরিশোধের সময়ই হয় নি। সেখানে অন্যের উপদেশের প্রয়োজনীয়তার তো প্রশ্নই আসে না। তথাপি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র ইয়াহূদীর মনের প্রশান্তি ও তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখার মানসে এরূপ মন্তব্য করেছেন।

এখানেই শেষ নয়, এতকিছুর পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে বিবৃতি দিয়েছেন যে, ন্যায়পরায়ণতা তো হবে এটাই যে, উমারের ধমকে তার মধ্যে যেই ভীতি সঞ্চার হয়েছে তার বিনিময়ে তাকে কিছু দেওয়া হোক। আর সে জন্য তাকে বিশ সা' খেজুর বেশি দিয়ে দিলেন।

এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক গৃহীত এ সকল সীদ্ধান্ত আবেগতাড়িত হয়ে সাময়িক আপোস চেষ্টা বা পরবর্তীতে সময় সাপেক্ষে চিন্তা-ভাবনা করে যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা নয়; বরং এটিই তার অকৃত্রিম যথাযথ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিক্রীয়া। সকল মানুষের সাথে তাঁর স্বভাবজাত আচরণই এমন। চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক। চাই সে উত্তম উপস্থাপনায় নিজেকে প্রকাশ করুক বা মন্দভাবে উদিত হোক।

বিশ্বের সকল রাজণ্যবর্গ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও ক্ষমতাধরদের কি উচিত নয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অনুপম অবস্থানের

ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করা? যেন নিজেদের পারিপার্শ্বিক কর্মকাণ্ডকে ন্যায়পরায়ণতার মানদণ্ডে যাচাই করে নিতে পারে!

পৃথিবীর সভ্যতার ধারকবাহকদের কি উচিত নয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচার গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা? যেন নিজেদের চারিত্রিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র মাধুর্য্য অনুযায়ী পরিবর্তন করে নিতে পারে!

বাস্তবিকই আজকের বিশ্ব নবী চরিত্রের এ স্বচ্ছ সুধার বড়ই মুখাপেক্ষী। যে দিন বিশ্ববাসী এ অনন্য মহান চরিত্রকে অনুধাবন করতে পারবে সেদিন সন্দেহাতীতভাবে বিশ্ব পরিস্থিতি সমুলে পাল্টে যাবে এবং নানামুখী সংকট ও সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রসস্ত পথ খুলে যাবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:
প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা

অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরায়ণতার অসাধারণ দৃষ্টান্তের আরেকটি দিক হচ্ছে এ যে, তিনি কখনোই কোনো অমুসলিমের বিপক্ষে সুনির্ধারিত প্রমানাধি ছাড়া বিচারকার্য সঞ্চালন করতেন না।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ»

“যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে সে আল্লাহর সমীপে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। আশ‘আস ইবন কায়েস[135] রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! এটা আমার সম্পর্কেই ছিল। আমার ও এক ইয়াহূদী ব্যক্তির সাথে যৌথ মালিকানায় এক খণ্ড জমি ছিল। সে আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসল। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার কোনো সাক্ষী আছে কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি ইয়াহূদীকে বললেন, তুমি কসম কর। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো কসম করবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়ে নেবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা (এ আয়াত) নাযিল করেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]

“যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করে.....”। [সূরা আলে ইমরান: ৭৭][136]

নিশ্চয় এটি এক বিরল দৃষ্টান্ত..!!

---

135. আল-আশ‘আস ইবন কায়েস আল-কিন্দী। দশম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণের জন্য কিন্দা রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাওয়ার পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আবার ইসলামে ফিরে এসেছেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ বোনকে তার সাথে বিবাহ দেন। তিনি কাদিসিয়্যাহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সিফফীনের যুদ্ধেও অংশ নেন। অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত বরণের চল্লিশ দিন পর মারা যান। অধিক জানতে দেখুন: ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (১/৯৭), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (জীবনী নং ২০৫)

136. সহীহ বুখারী: (كتاب الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض) (হাদীস নং ২২৮৫; সহীহ মুসলিম: (كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار) হাদীস নং ১৩৮।

এটি এমন দু’জনের মধ্যকার বিবাদ, যাদের একজন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী অন্যজন ইয়াহুদী। তারা পরস্পরের মধ্যে ফায়সালা করে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু’ জনের মাঝে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত শরী‘আতের বিধান প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা অন্বেষণ করেন নি। আর এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরী‘আত বাদী আশ‘আস ইবন কায়েসকে এ বাধ্যবাধকতা আরোপ করে যে, সে সাক্ষ্য ও প্রমাণ পেশ করবে। যদি সে প্রমাণ ও সাক্ষ্য উপস্থাপনে ব্যর্থ হয় তাহলে বিবাদীকে এ মর্মে শপথ করতে বলা যে, বাদী তার ওপর যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে সে ঐ অভিযুগে অভিযুক্ত নয়। তখন বিবাদীর শপথকে সত্যায়ন করা হবে এবং সে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগত হাদীসের অর্থও তাই। তিনি বলেন,

«البَيِّنَةُ عَلى المُدَّعِي واليَمِيْنُ عَلى مَنْ اَنْكَرَ »

“অভিযোগকারী প্রমাণ পেশ করবে। আর (প্রমাণ পেশ করতে না পারলে) যে অস্বীকার করে সে শপথ করবে”।

ইয়াহূদী যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করবে না রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। কারণ, তারা শুধু মানুষের সাথে কেন বরং স্বয়ং আল্লাহর ওপরই তো মিথ্যারোপ করে অভ্যস্থ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٧٥﴾ [ال عمران: ٧٥]

“আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা বলে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭৫]

আর ইয়াহূদী যখন এ কথা জানলো যে সাহাবীর কাছে নিজ মালিকানার স্বপক্ষে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই তার শপথের ভিত্তিতেই বিষয়টি শুরাহা হবে। তখন তার মধ্যে আরো বেশি নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিল। অপরদিকে সাহাবীও এটি অনুভব করলেন যে, তার আশা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হতে যাচ্ছে। কারণ ইয়াহূদী তো বিনা দ্বিধায় মিথ্যা শপথ করে বসবে। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য কিছুই করতে পারবেন না এবং ইয়াহূদীকে সুযোগ দেওয়া ছাড়া রাসূলের সামনে আর কোনো পথই খোলা থাকবে না।

এটি কি সার্বজনিন ন্যায়পরায়ণতা নয় যার এতো সরল বাস্তবায়ন কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারে না?!

এটাই ইসলাম... ।

এটাই সে আসমানী দীন, যা জমিনে মানব জীবন পরিচালনার জন্য এসেছে...।

ইনিই আমাদের মহান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি সভ্যতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টিকূলের সেরা...।

কোনো ইয়াহূদীর বিপক্ষে সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে মুসলিমের দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মতো ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে শুধু একবার নয়; বরং বারবার ঘটেছে। পৃথিবীতে আরো গুরুতর কলহেরও সৃষ্টি হয়েছে এবং পূর্বোক্ত ঘটনার চেয়ে কঠিনতর পরিস্থিতির অবতারণাও হয়েছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিক্রিয়া ছিল একই রকম। কেননা তাঁর সকল চিন্তা-চেতনার উৎস তো একই। ধর্ম, চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁর মতে এমন বিষয় যা কখনো বিভক্ত হয় না।

সাহল ইবন আবি হাসমাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন,

«أنّ نفرًا مِنْ قَوْمِهِ انطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ»

“তার (সাহল ইবন আবি হাসমাহ-এর) গোত্রের একদল লোক খায়বার গমন করল ও তথায় তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল। (খায়বারে তখন ইয়াহূদীদের আবাস ছিল) যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল তাদেরকে তারা বলল, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আমরা না তাকে হত্যা করেছি, না তার রহত্যাকারী সম্পর্কে জানি। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম আর আমাদের একজনকে তথায় নিহত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি বললেন, বায়োবৃদ্ধকে বলতে দাও। বায়োবৃদ্ধকে বলতে দাও।[137] তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদেরকে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তারা বলল, আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি বললেন, তাহলে ওরা কসম করে নেবে। তারা বলল, ইহুদীদের কসমে তো আমাদের কোনো আস্থা নেই। এ নিহতের রক্ত মূল্যহীন হয়ে যাক তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না । তাই সদকার একশত উট প্রদান করে তার রক্তপণ আদায় করলেন।”[138]

আল্লাহু আকবার! এটি কতো বড় আশ্চর্যজনক ঘটনা!!

137. তোমাদের মধ্যে যিনি সিনিয়র তাকে কথা বলতে দাও। অধিক জানতে দেখুন: ইবন হাজার আসকালানী: আল-ফাতহুল বারী (১২/২৩৩,২৩৪)

138. সহীহ বুখারী: (كتاب الديات: باب القسامة) হাদীস নং ৬৫০২; সহীহ মুসলিম: (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة) হাদীস নং ১৬৬৯।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনা মতে এ ঘটনাটি খায়বার উপত্যকায় ইয়াহূদীরা মুসিলমেদর সাথে পরাজিত হবার পর ইয়াহূদীরা মুসলিমদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হবার পরের ঘটনা। স্বভাবতই তখন ইয়াহূদীরা দুর্বল অবস্থায় এবং মুসলিমগণ শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। মুসলিমগণ চাইলে তাদের এ সামর্থ্য ছিল যে, নিজেদের কোনো মতকে জোরপূর্বক ইয়াহূদীদের ওপর চাপিয়ে দেবেন।

কিন্তু বাস্তবতা পৃথিবী দেখেছে..!

ইমাম মুসলিমের[139] বর্ণনা মতে, ইয়াহূদী অধ্যুসিত এলাকায় আব্দুল্লাহ ইবন সাহল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নামীয় এক আনসার সাহাবীকে হত্যা করা হলো। সেই সাথে মুসলিম শিবিরে প্রকট সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, কোনো ইয়াহূদীই তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু তাদের কাছে এ সন্দেহের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ ছিল না। আর অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে সন্দেহ কখনোই সফল হতে পারে না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ইয়াহূদীকে কোনো ধরণের শাস্তিই প্রদান করেন নি; বরং ইয়াহূদীদের প্রতি শুধুমাত্র এ আহ্বান করলেন যে, তোমরা শপথ করে বল যে, তোমরা এ কাজ কর নি।

এহেন পরিস্থিতিতে আনসারদের মধ্যে হাহাকার রব উঠল। কেননা তারা খুব ভালো করে জানতেন যে, ইয়াহূদীরা মিথ্যা শপথ করতে বিন্দু মাত্র পিছপা হবে না। এ কারণে আনসারদের মধ্যে এ ধারণাও তৈরি হতে চলল যে,

---

139. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, আল-ইমাম আল হাফেজ হুজ্জাতুল ইসলাম আবুল হাসান আন-নিসাবূরী। ২০৫ হিজরীতে তার জন্ম হয়। হাদীসের সেই সহীহ গ্রন্থের (সহীহ মুসলিম) প্রণেতা অধিকাংশ আলেমগণ যাকে সহীহ বুখারীর পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলেছেন। ২৬১ হিজরীতে নাইসাবুরে ইন্তেকাল করেন। অধিক জানতে দেখুন: ইবনুল আসীর: আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া: (১১/৩৩), ইমাম যাহাবী: তাযকিরাতুল হুফফায (২/৫৮৮)।

তারা তাদের রক্তপণের অধিকার হারাতে বসেছেন। আর আনসারদের বিষণ্নতা ও প্রমাণহীন দাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচারে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। তিনি ইয়াহুদীদেরকে জরিমানা করা বা তাদের কাউকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা কিংবা কোনো প্রকারের শাস্তি প্রদানের আবেদন প্রত্যাখান করলেন। তখন আনসারদের মাঝে এ অনুভূতি জাগ্রত হলো যে, তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। কারণ তাদের হত্যাকৃত ব্যক্তির রক্তের বিপরীতে তারা কিছুই পাচ্ছেন না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যা কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারে না...।

তিনি নিজ উদ্যোগে মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে ঐ আনসারীর রক্তপণ আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। যেন আনসারদের মন শান্ত হয়ে যায় এবং ইয়াহূদীদের উপর প্রতিশোধ চিন্তা না করে। কাজেই ইয়াহূদীদের প্রতি শুধু সন্দেহের কারণে দণ্ডারোপ করা সম্ভব না হওয়া অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র সেই রক্তপণের বোঝা বহন করে।

এ হাদীসের মন্তব্যে ইমাম নববী[140] বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রক্তপণ এ জন্যে আদায় করলেন যেন সংঘাতের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধিত হয়।[141] তিনি চেয়েছেন সংঘাতের পথ চিরতরে বন্ধ হোক। যেন আনসাররা রক্তপণ পেয়ে এ বিষয়টি ভুলে যায়

140. মহীউদ্দিন আবু যাকারিয়া আন-নববী আদ-দামেশক্বী আশ-শাফে'ঈ (৬৩১-৬৭৬ হিজরী)। স্বীয় যমানায় বড় ফকীহগণের অন্যতম একজন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে যেগুলো সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন তা থেকে 'শরহে মুসলিম' ও 'আর-রাওজাহ' অন্যতম। আর যে কিতাবগুলো তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি তা থেকে উল্লেখ্য শরহুল মুহাযযাব যা 'আল-মাজমু'উ' নামে নামকরণ করা হয়। এটি তিনি 'কিতাবুর-রিবা' পর্যন্ত লিখতে পেরেছিলেন। দেখুন: ইবনুল আসীর: আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: (১৩/২৮৭)।

141. আন-নববী: আল-মিনহাজু শারহু সহীহ মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ (১১/১৪৭)।

আর ইয়াহূদীরাও প্রতিশোধের আতঙ্ক থেকে নিরাপত্তাবোধ করে।

প্রিয় পাঠক! দেখুন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পদক্ষেপটি কতো মুগ্ধকর ও অভূতপূর্ব!!

নবম হিজরীতে বনু হানীফার প্রতিনিধি দলের সাথে মুসাইলামাহ আল-হানাফী (পরবর্তীতে মুসাইলামাতুল কাযযাব নামে পরিচিতি) যখন মদীনায় আসল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে যে অবস্থান গ্রহণ করেন সেটি এ ঘটনার চেয়েও বেশি চমকপ্রদ।[142]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

«قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ

فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ»

“(ভণ্ড নবী) মুসায়লামা কাযযাব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে মদীনায় আসলো। এসে বলতে লাগলো, মুহাম্মাদ যদি তার (মৃত্যুর) পরে নেতৃত্ব আমাকে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন, তাহলে আমি তার অনুসরণ করব। সে তার কাওমের অনেক লোকজন নিয়ে মদীনায় আসলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তখন নবী

142. ইবন কাসীর: আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: (৫/৪৮)

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ছিল খেজুর শাখার একটি টুকরা। অবশেষে তিনি সহচর বেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়ে থামলেন এবং কথাবার্তার এক পর্যায়ে বললেন তুমি যদি (আমার কাছে এ) নগণ্য খেজুর ডালের টুকরাটিও দাবি কর, তবু আমি তা তোমাকে দেব না এবং আমি কিছুতেই তোমার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করব না। আর যদি তুমি পাশ্চাতে ফিরে যাও (অবাধ্য হও), তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে ঘায়েল করবেন। আর আমি অবশ্যই মনে করি যে, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, তা তোমার ব্যাপারেই দেখানো হয়েছে।

তিনি বলেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, আমি ঘুমন্ত ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ নিয়ে আসা হলো। তখন আমার হাতে দু’ টি সোনার কংকন রেখে দেওয়া হলে সে দু’টি আমার জন্য বড় ভারী মনে হলো এবং এগুলো আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলল। তখন আমার কাছে অহীর মাধ্যমে জানান হলো যে, আমি যেন সে দু’টির ওপরে ফুঁক দেই। তখন আমি ফুঁক দিলে সে দু’টি অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি সে দু’টির ব্যাখ্যা করলাম সে হলো মিথ্যুক (ভণ্ড নবী) যে দু’জনের মাঝে আমি রয়েছি (অর্থাৎ) সান‘আ অধিবাসী আসওয়াদ আল-আনসী এবং ইয়ামামা অধিবাসী মুসায়লামাতুল কাযযাব।”[143]

আল্লাহু আকবার। কতো বড় বিস্ময়কর ঘটনা!!

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে, এক লোক তার শর্ত

143. সহীহ বুখারী: (كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام) হাদীস নং ৩৪২৪; সহীহ মুসলিম: (كتاب الرؤيا: باب رؤيا النبي صلى الله عليه و سلم) হাদীস নং ২২৭৩।

না মানার কারণে ইসলামে দিক্ষীত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করছে। অথচ তার সম্প্রদায়ের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নিয়ে এক স্বপ্নও দেখেছেন। আর নবীদের স্বপ্ন তো সত্যই হয়ে থাকে। তিনি দেখলেন যে, ঐ ব্যক্তি তাঁর অবর্তমানে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করবে। তার এ অপকর্মের ভয়াবহতা ও তার বিভ্রান্তিকর মতবাদের প্রচার প্রসার ও দাওয়াতের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলতার বিষয়েও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। মুসাইলামার এতো সব গুরুতর অপতৎপরতা, সেই সাথে সে সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমরা যথেষ্ট ক্ষমতাবান, অপরদিকে সে সময় বনু হানীফা ও আরবদের দৈন্যদশা থাকার পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহেন পরিস্থিতিতেও তাকে শাস্তি প্রদান বা তাকে প্রতিরোধ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন নি। মদীনায় তার স্বাধীনতাবোধকেও হরণ করেন নি। তার অপচেষ্টার জন্য তাকে কোনো দণ্ডারোপও করেন নি।

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ করার কারণ হলো তিনি চান নি শুধুমাত্র স্বপ্নের ফলাফলের ভিত্তিতে তার ওপর কোনো আদেশ জারি করেন। সে কারণেই তার বিপক্ষে প্রকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, মুসায়লামার দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে কী অপকর্ম প্রকাশ পাবে? কিন্তু শুধুমাত্র উপস্থিত সময়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান না থাকার কারণে তিনি মুসায়লামাকে নিরাপদে ছেড়ে দিলেন।

এমনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্য ন্যায়পরায়ণতা...।

ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান অপরাপর কোনো ধরণের ন্যায়-নিষ্ঠারই যার সাথে তুলনা হতে পারে না...।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ:
একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না

অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়পরায়ণতার একটি দিক এটাও ছিল যে, তিনি এক জনের অপরাধের কারণে সামষ্টিকভাবে সকলকে শাস্তি দিতেন না। প্রত্যেক গোত্রেই ভালো-মন্দ উভয় শ্রেণির লোকই রয়েছে। প্রত্যেক দলেই বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসঘাতক উভয় প্রকৃতির লোক থাকে। অপরাধ যত বড়ই হোক কখনোই তিনি একজনের অপরাধের কারণে অন্যকে অভিযুক্ত করতেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ ٣٨﴾ [المدثر: ٣٨]

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩৮]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ﴾ [الانعام: ١٦٤]

"একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এ বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বীরে মা'ঊনার[144] যুদ্ধের পরে সাহাবী আমর ইবন

144. বীরে মা'ঊনা। বানূ আমের ও বানূ সুলাইমের প্রস্তরময় ভুমির মাঝামাঝি একটি স্থান। বানু সুলাইমের অধিক নিকটবর্তী এবং তাদের মালিকানাধীন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি মক্কা থেকে মদীনার দিকে ওঠার পথে। সেখানেই রাজী'-এর ঘটনা সংঘটিত হয়।

উমাইয়া আদ-দ্বমরী[145] রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সংশ্লীষ্ট ঘটনাটি। পুরো ঘটনাটি আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لَحْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاءَ يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ »

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রি‘ল, যাকওয়ান, ‘উসাইয়া ও বানু লাহইয়ান গোত্রের কিছু লোক এসে বলল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তারা তাঁর নিকট তাদের সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় সাহায্য প্রার্থনা করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তর জন আনসার পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করলেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা তাদের ক্বারী নামে আখ্যায়িত করতাম। তারা দিনের বেলায় লাকড়ী সংগ্রহ করতেন, আর রাত্রিকালে সালাতে মগ্ন থাকতেন। তারা তাঁদের নিয়ে রওয়ারা হয়ে গেল। যখন তাঁরা বীরে মা‘উনা নামক স্থানে পৌঁছালো, তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং তাঁদের হত্যাকরে ফেলল। এ সংবাদ শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রি‘ল, যাকওয়ান ও বানু লাহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে দো‘আ করে একমাস যাবত কুনূতে নাযিলা

দেখুন: ইয়াকূত আল-হামাওয়ী: মু‘জামুল বুলদান (১/৩০২)।

145. আমর ইবন উমাইয়া আয-যামরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন কাজে তাকে নিজ প্রতিনিধি বানাতেন। তিনি ছিলেন বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য আরবের খ্যাতিমান ব্যক্তি। বীরে মা‘উনা হলো তার প্রথম অভিযান। তাকে আটক করে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে নাজ্জাশীর নিকট ইসলামের দাওয়াত পত্র নিয়ে তাকে পাঠানো হয় এবং সে পত্রটি তিনি নিজ হাতে লিখেন। এ প্রেক্ষিতে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। অধিকতর জানতে: ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (৩/৬৮৯), ইবন হাজর: আল-ইসাবাহ (৫৭৬৫)।

পাঠ করেন।”[146]

এটি মুসলিমদের জন্য অনেক বড় দূর্ঘটনা। গাদ্দারীর ফলস্বরূপ সত্তর জন সাহাবীকে জীবন দিতে হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে এ পরিমাণ ব্যথা পেলেন যে, তিনি একমাস যাবৎ সেসব বিশ্বাসঘাতকদের জন্য বদ-দো‘আ করেছেন। এ ধরণের ঘটনা তাঁর জীবনে এ একটিই। ভাবুন তো! কী পরিমাণ ব্যথা পেলে তিনি শত্রুপক্ষকে অভিশাপ দিতে পারেন..!!

এ হত্যাযজ্ঞ থেকে একজন সাহাবী শুধু মুক্তি পেলেন। তিনি হলেন আমর ইবন উমাইয়া আদ-দ্বামরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমের ইবন তোফায়েল[147] তার মায়ের ওপর একটি গোলাম মুক্ত করার যিম্মা ছিল বলে আমর ইবন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুক্তি দিয়ে দিল। আমর ইবন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মদীনায় ফিরে আসলেন। ফেরার পথে তিনি সত্তর জন সাহাবী হত্যায় জড়িত থাকা বানু সুলাইমের একটি শাখা গোত্র বানু আমেরের দুই মুশরিককে পেয়ে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, এদের হত্যা করতে পারলে কিছুটা হলেও সাথীদেরকে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তাই এ দু’ জনকে হত্যা করে ফেললেন। পরক্ষণেই তার মনে পড়লো যে, এরা তো চুক্তিবদ্ধ। এদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপত্তা দিয়েছেন। তাই তিনি দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে পুরো ঘটনা জানালেন।

146. সহীহ বুখারী: (باب العون والمدد،كتاب الجهاد و السير) হাদীস নং ২৮৯৯; আহমদ, হাদীস নং ১৩৭০৭; বায়হাকী, হাদীস নং ২৯১৫।

147. আমের ইবন তোফায়েল। বানু আমের গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল। বীরে মা‘ঊনায় সত্তর জন সাহাবী হত্যায় জড়িত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বদ-দো‘আ করেছেন এবং সে কারণেই সে মারা যায়।

প্রিয় পাঠক! চলুন দেখি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিক্রিয়া কী ছিল..?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহুর্তের মধ্যেই সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেলেন। আবেগ, অনুভূতি ও প্রবৃত্তিকে ঝেড়ে ফেলে বিবেক ও ধর্মীয় বিধান কার্যকরী করতে ব্রতী হয়ে ওঠলেন। তিনি আমর ইবন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তুমি যে দু’জনকে হত্যা করে ফেলেছ আমি তাদের রক্তপণ আদায় করে দেব।[148]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত দু’জনের পরিবারকে রক্তপণ আদায় করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন..!!

তিনি তো এটাও বলতে পারতেন যে, তাদের গোত্রের লোকেরা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের সত্তর জনকে হত্যা করেছে, বিনিময়ে আমরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের দু’জনকে তো মারতেই পারি। কিন্তু না। তিনি একের অপরাধের জন্য অন্যকে শাস্তি দেন নি। কারণ, ‘আমেরী দু’ব্যক্তি তো এমন কোনো আপরাধ করে নি যেজন্য তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। আবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। তাই তাদেরকে হত্যা করা কোনোভাবেই বৈধ হয় নি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সত্তর জন খ্যাতনামা সাহাবীকে হারানোর বেদনা ও রাজনৈতিক সংকটই একমাত্র সংকট ছিল না; বরং এর পরিপ্রেক্ষিতে দু’জন মুশরিক হত্যার জন্য রক্তপণ আদায় করার যে বাধ্য-বাধকতা তৈরি হলো এতে আরেকটি অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতে হলো। কারণ, এ ঘটনা ছিল উহুদ যুদ্ধ পরবর্তী কয়েক মাসের ভেতরে।

148. যাইলা‘ঈ: নাসবুর রায়াহ (৪/৩৯৬), ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (৪/৮৫)।

তখন মদীনায় চরম দারিদ্র্যাবস্থা চলছিল। আবার রক্তপণের এ মোটা অংক জোগাড় করতে তিনি চুক্তিবদ্ধতার দাবি নিয়ে বনু নাদ্বীরের ইয়াহূদীদের সাথে সাক্ষাৎ করে সাহায্য চাইলেন। এতে ইয়াহূদীদের সাথে আরেকটি সংকটের সৃষ্টি হয়েছে এবং এ সাক্ষাতের ঘটনাই পরবর্তীতে বানু নাদ্বীরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।[149]

অতীত কিংবা বর্তমানে এ স্তরের ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার নযীর কি অন্য কোথাও কেউ দেখাতে পারবে..?!

এতকিছুর পরও কি কেউ এ দাবী করতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদেরকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতেন না, সম্মান প্রদর্শন করতেন না বা তাদের প্রতি ইনসাফ করতেন না...?!

আমাদের এসব আলোচনাকে অনেকেই অলিক কল্পনা বা পূর্বকালের রূপকথার বানানো গল্প মনে করতে পারেন, কিন্তু না। ইসলাম এসব কিছুকে এমনভাবে বাস্তবে রূপদান করে দেখিয়েছে যা অন্য কারো দ্বারা স্বপ্নেও কল্পনা করা সম্ভব নয়।

বানু আমের গোত্রের দু'জন মুশরিকের নিহত হওয়া এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদক্ষেপের এ ঘটনাকে বিশাল সমুদ্রের মাঝে এক ফোটা পানির ন্যায়ই মনে হবে। তাঁর ঐ আচরণের সাথে তুলনা করলে যে আচরণ তিনি মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদীনা পানে হিজরত করার সময় মক্কাবাসীর আমানতের মালের ব্যাপারে করেছেন।

---

149. সহীহ বুখারী: (كتاب المغازي، باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم قي دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الل صلى الله عليه وسلم) অধিকতর জানতে: তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়ালমুলূক (২/৮৩), ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (৪/৮৪)।

ঘটনা সবারই জানা। কিন্তু প্রয়োজন গভীর চিন্তা ও অনুধাবনের...।

মক্কাবাসীদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো প্রতিই পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল না। ফলে সকলেই নিজেদের অর্থকড়ি ও বিভিন্ন জিনিষপত্র তাঁর কাছেই আমানত রাখতো। কোনো অতিরঞ্জন নয় বাস্তবেই তিনি ছিলেন মহা বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। এমনকি কুরাইশ কর্তৃক নানাভাবে কঠিন নির্যাতন করা এবং তাঁকে জাদুকর, মিথ্যুক, গণক, কবি ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করার পরও তারা নিয়মিত তাদের ধন-সম্পদের আমানত তাঁর কাছেই রাখতো। আর তিনিও তাদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতা ও শত্রুতা চলাকালীন সময়েও তাদের সম্পদ হিফাযতের গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন।

অতঃপর এসে গেলো মদীনায় পাড়ি জমানোর পালা।

কাজ-কর্ম, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদ সব ত্যাগ করার পালা।

কুরাইশের পক্ষ থেকে যুলুম-নির্যাতন চূড়ান্ত পর্বে এসে দেশত্যাগে বাধ্য করার পালা।

অসভ্যতা ও অমানবিকতার সর্বসীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পালা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহা যন্ত্রনাদায়ক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। তাঁর নিজ মাতৃভূমি, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় ভূখণ্ড 'মক্কা' ত্যাগের বিরহ যন্ত্রণা। যেমন, বিদায়কালে মক্কানগরীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন: "আমি জানি তুমি আল্লাহর সৃষ্ট সবচেয়ে উত্তম ভূমি এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। তোমার অধিবাসীরা যদি বের করে না দিত তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"[150]

150. তিরমিযী: আব্দুল্লাহ ইবন আদী আয-যুহরী থেকে, হাদীস নং ৩৯২৫। আবু ঈসা

এতসব ব্যথা-বেদনার পরেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থায় ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেলেন। তিনি সকল গচ্ছিত সম্পদ আলী ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট রেখে তাকে এ আদেশ দিয়ে গেলেন যে, সবগুলো সম্পদ পাওনাদারদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তিন দিন মক্কায় অবস্থান করে সকল আমানত মালিকদের নিকট পৌঁছে দিয়ে গেলেন।[151]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা এ ধরণের উত্তম চরিত্র ও পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে -এটা আমি বিশ্বাস করি না।

এমন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থানে অন্য যে কেউ হলে আমানতের এ মালগুলো আত্মসাৎ করে ফেলার জন্য কোনো না কোনো একটি অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেলত এবং সেগুলো যথাযথ মালিকদের নিকট আদৌ পৌঁছে দিত না।

কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা দিত যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর-বাড়ি ধন-সম্পদ সব দখল করে নিয়েছে। বিনিময়ে তাদের আমানতের মালগুলো ফেরত না দেওয়া তো অন্যায় হওয়ার কথা না...।

আবার কেউ বলত যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলেছেন, হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। আহমদ, হাদীস নং ১৮৭৩৭। আদ-দারমী, হাদীস নং ২৫১০। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৫২২০। আন-নাসায়ী: আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ৪২৫২। মিশকাত, হাদীস নং ২৭২৫। আলবানী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। দেখুন: সাহীহুল জামে' (৭০৮৯)।

151. ইবন কাসীর: আস-সীরাতুন নাববিয়্যাহ (২/২৭০), ইবন হিশাম: আস-সীরাতুন নাববিয়্যাহ (২/২১), মোবারকপুরী: আর-রাহীকুল মাখতূম (১২১)।

স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করেছিল...।

কেউ বলত, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করেছিল। এমনকি ষড়যন্ত্র প্রায় বাস্তবায়নও হতে চলেছিল। যদি না তিনি শেষ মুহূর্তে মু'জিযার মাধ্যমে তাদের ফাঁদ ভেদ করে বেরিয়ে না যেতেন...।

কেউ বলত যে, এ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ইসলামের প্রচার প্রসারে ব্যয় করা হবে। বিশেষ করে মদীনার প্রাথমিক দিনগুলোতে এর বেশ প্রয়োজনও ছিল...।

হ্যাঁ, আপনি যা ইচ্ছা ব্যাখ্যা করতে পারেন; কিন্তু আপনি যখন ব্যক্তিগত চিন্তা ও নিজস্ব প্রবৃত্তির চাহিদা বাদ দিয়ে নিরপেক্ষভাবে বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে, এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। আমানতের সম্পদগুলো নির্দিষ্ট কিছু লোকের ব্যক্তি-স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত। যারা পূর্ণ হিফাযতে রাখার শর্তে/চুক্তিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমানত রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের সম্পদের চেয়েও যত্ন ও নিরাপত্তার সাথে সেগুলো সংরক্ষণ করতেন। তাই পরিস্থিতি যাই হোক এবং তাদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের মাত্রা যে পর্যায়েই পৌঁছুক তিনি তাদের সম্পদগুলো আত্মসাৎ করে ফেলতে বা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। তাঁর প্রাণনাশের তদবীরকারীদের অপরাধের কারণে যারা তাঁকে বিশ্বাস করে আমানত রেখেছিল তাদেরকে শাস্তি না দেওয়াই হলো ন্যায়পরায়ণতার দাবী।

তারা মগ্ন হয়ে আছে তাঁর প্রাণ নাশের তদবীরে...।

আর তিনি ব্যস্ত হয়ে গেলেন তাদের আমানত রক্ষায়...।

তারা রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে...।

আর তিনি আছেন বিশ্বস্ততার উচ্চ শিখায়...।

তারা হলো মুশরিক...।

আর তিনি হলেন জগৎসমূহের রবের প্রেরিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)...।

তাঁর মাঝে ও তাদের মাঝে আসমান-জমিনের ফারাক....।

আরো সৌন্দর্যের ব্যাপারটি হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব আচরণ কৃত্রিমতা বা অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য করতেন না..।

তিনি সদাচরণ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা এজন্য করতেন না যে, চারিদিকে তার সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক। সকলেই তাকে বাহবা দিক...।

তাঁর কবি ও সাহিত্যিক শিষ্যদেরকে তিনি তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করে সাহিত্য কিংবা কবিতা রচনা করতেও বলেন নি...।

আল্লাহ তাঁকে মহৎ চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে আদেশ করেছেন। এ আদেশই তাঁকে উপরোক্ত সব চিন্তা ভুলিয়ে দিয়েছে। তিনি শুধু আল্লাহর আদেশ পালনার্থে তাঁরই জন্য একান্ত ও একনিষ্ঠভাবে এসব আচরণ করতেন। এজন্য আল্লাহর বান্দাদের নিকট তিনি কোনোরূপ প্রতিদান, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সুনাম-সুখ্যাতি কিছুরই আশা করতেন না।

﴿قُلۡ مَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ ٨٦﴾ [ص: ٨٦]

“বলুন, ‘এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আর আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৮৬]

فصل اللهم عليك و سلم يا إمام العادلين، و سيد النبيين والمرسبين.

সপ্তম পরিচ্ছেদ:
অত্যন্ত বিরাগভাজনদের সাথেও ন্যায়পরায়ণতা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্য ন্যায়পরায়ণতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, অপরাধ যত মারাত্মকই হোক না কেন তিনি কাউকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও ইনসাফের সীমা আতিক্রম করতেন না। তাঁর ও মুসলিমদের অধিকার হরণের ব্যাপারে কেউ যত বড় সীমালঙ্ঘনই করুক না কেন।

উবাই ইবন কা'আব বর্ণনা করেন, "উহুদ যুদ্ধে আনসারদের ৬৪ জন এবং মুহাজিরদের ছয়জন শাহাদাত বরণ করেন। যাদের মধ্যে হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। সবকটি লাশেরই অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিকৃতি সাধন করে ফেলা হয়। আনসাররা বললেন, 'যদি কোনো দিন আমাদের হাতে এমন সুযোগ আসে তাহলে আমরাও দেখিয়ে ছাড়বো'।"

যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন,

﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّٰبِرِينَ ١٢٦﴾ [النحل: ١٢٦]

"আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৬]

এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'আজকের পরে কোনো কুরাইশ থাকবে না'। উবাই ইবন কা ' আব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«كفوا عن القوم إلا أربعة»

"(কুরাইশের) চারজন ব্যতীত আর কাউকে হত্যা করবে না।"[152]

উহুদ যুদ্ধের এ কঠিন মুসীবত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে এত মারাত্মক আঘাত প্রাপ্তির পরেও তিনি শুধু আল্লাহর বিধানই বাস্তবায়ন করলেন। কোনো প্রকার বাড়াবাড়ির অনুমতি দিলেন না। ন্যূনতম সীমালঙ্ঘনকেও মেনে নিলেন না।

আর এ আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিন আপন চাচা হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিকৃত লাশ দেখে বলেছিলেন, 'আমরা অবশ্যই তাদের সত্তরটি লাশের বিকৃতি সাধন করে ছাড়বো'।[153] ফতহুল বারীতে আল্লামা ইবন হাজার এটিকে দুর্বল বলেছেন।[154] এবং পূর্বের যে হাদীসে এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যে, আয়াতটি নাযিল হয়েছে উহুদ যুদ্ধের সময় নয়, মক্কা বিজয়ের দিন; সে হাদীসটিও এ মতের সাথে সাংঘর্ষিক। আর যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবও এমন ছিল না যে, তিনি আবেগতাড়িত হয়ে এ ধরণের মন্তব্য করতে পারেন। আবার এ মতের হাদীসটিকে যদি সহীহও ধরে নেওয়া হয় তাহলেও বলবো যে, সত্তরটি

---

152. তিরমিযী, হাদীস নং ৩১২৯; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৪৮৭; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩৩৬৮; বায়হাকী: শু'আবুল ঈমান, হাদসি নং ৯৭০৪; নাসায়ী: আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ১১২৭৯। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটি গারীব হাদীস। হাকিম বলেছেন, এটি বিশুদ্ধ সনদের হাদীস। দু'জনের কেউই এর তাখরীজ করেন নি। ইমাম যাহবীও ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আলবানী বলেছেন, এটি বিশুদ্ধ সনদের হাদীস।

153. মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৪৮৯৪। ইমাম যাহাবী 'তালখীস' গ্রন্থে, আল্লামা হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী 'আস-সিলসিলাতুয দ্ব'য়ীফাহ' গ্রন্থের ৫৫০ পৃষ্ঠায় এ হাদীসের বর্ণনাকারী সালেহ ইবন বশীরকে দুর্বল বলেছেন।

154. ইবন হাজার: ফতহুল বারী (৭/৩৭১)।

লাশের বিকৃতি সাধন করার মন্তব্যটি ছিল তাঁর সাময়িক চিন্তা থেকে যা কুরআনের আয়াত নাযিলের পর স্থায়িত্ব পায় নি। কারণ, তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনেরই বাস্তব অনুশীলন ক্ষেত্র। আর তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর যদি তার বিপরীতে এর চেয়ে ভালো কিছু দেখতেন তাহলে প্রথম সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতেন এবং যা অধিক সঠিক ও সুন্দর তাই করতেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها،فليأت الذي هوخير، وليكفرعن يمينه»

"যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কসম খায়, পরে তার বিপরীতটিকে তা থেকে উত্তম মনে করে, সে যেন তা করে ফেলে এবং নিজের কসমের কাফফারা দেয়।"[155]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিস্ময়কর ন্যায়পরায়ণতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তিনি যাদেরকে অত্যাধিক অপছন্দ করতেন তাদের প্রতিও কোনো প্রকার আবিচার করা থেকে বিরত থাকতেন। এ ব্যাপারে তিনি কুরআনের এ মৌলিক আয়াতকে লক্ষ্য রাখতেন,

﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْ﴾ [المائدة: ٨]

"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনো ভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করেব না।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৮]

এ আয়াতেরই বাস্তব প্রতিফলন আমরা মুসায়লামা কাযযাবের দূতদ্বয়ের

155. সহীহ মুসলিম: (فرأى غيرها خيرا منها، باب من حلف يمينا،كتاب الأيمان)হাদীস নং ১৬৫০। আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৭৪। তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৫০। নাসায়ী, হাদীস নং ৩৭৮১। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২১০৮। মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৮৭১৯।

সাথে আলাপকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দেখতে পেয়েছি।

দূতদ্বয় স্পষ্ট বলেছে যে, তারা মুসায়লামা কাযযাবকে নবী হিসাবে স্বীকার করে এবং তার মতাদর্শ মেনে চলে। এক কথায় স্বঘোষিত মুরতাদ। যাদের হত্যা করে ফেলার বিধান রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلاه إلا الله و أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»

"যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল তাকে তিন কারণ ব্যতীত হত্যা করা বৈধ নয়।

এক. বিবাহিত যিনাকারী।

দুই. প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।

তিন. ধর্মত্যাগী দল পরিহারকারী।"[156]

এ হলো ধর্মত্যাগী দল পরিহারকারীর শর'ঈ বিধান। এ দূতদ্বয় শুধু স্বধর্ম ত্যাগ ও দল পরিহারই করে নি; বরং মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে এবং মুসায়লামার মতাদর্শের প্রতি অন্যদেরকে দাওয়াতও দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, আরো একধাপ এগিয়ে তারা এসেছে নবুওয়াতকে ভাগাভাগি কিংবা রদবদল করে নেওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দর কষাকষি করতে।

156. সহীহ বুখারী: (أن النفس بالنفس" باب قول الله تعالى،كتاب الديات) হাদীস নং ৬৪৮৪; সহীহ মুসলিম: (باب ما يباح به دم المسلم،كتاب القسامة) হাদীস নং ১৬৭৬ শব্দ মুসলিমের।

কেউ যদি প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করে এবং ন্যায়পরায়ণতা ও শরী'আতের বিধানের প্রতি লক্ষ্য না রেখে শুধু নিজ স্বার্থ চিন্তা করে তাহলে এহেন পরিস্থিতিতে এ দূতদ্বয়কে হত্যা করে ফেলা তার জন্য আবশ্যকীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের অসাধারণ পরিস্থিতিতেও দূতদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা করলেন। কারণ, তারা ছিল দূত বা প্রতিনিধি। সে সময় বিশ্বের কোথাও দূত হত্যার প্রচলন ছিল না। ইসলামী শরী'আতও পৃথিবীর এ প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বহাল রেখেছে। দূতদ্বয়কে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«أما والله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»

"জেনে রেখো, আল্লাহর শপথ! যদি দূত হত্যা না করার প্রচলন না থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের দু'জনের গর্দান উড়িয়ে দিতাম।"[157]

দেখুন, এ দূত-দয়ের স্ব-ধর্ম ত্যাগ করে কাফির হয়ে যাওয়া এবং তাদের এ ধরণের অসভ্য আচরণ কোনো কিছুই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের ওপর অবিচার কিংবা বাড়াবাড়ি করার দিকে নিয়ে যেতে পারে নি; বরং তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন। তাদের সাথে উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করলেন। অনেক শত্রু কাফিররা না মানলেও তিনি দূত হত্যা না করার প্রাচীন রীতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়ে সে রীতির ওপর অটল রইলেন। স্বয়ং মুসায়লামা কাযযাব নিজে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক দূত হাবীব ইবন যায়দ[158] রাদিয়াল্লাহু আনহুকে

---

157. সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২৭৬১; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ২৬৩২; আহমদ, হাদীস নং ১৬০৩২। আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস। দেখুন: সাহীহুল জামি' (১৩৩৯)।

158. হাবীব ইবন যায়দ আল-আনসারী আন-নাজ্জারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

বাগে পেল তখন তাকে মেরে তার লাশ কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল।

বাস্তবতা আর কতো অধিক থেকে অধিকতর স্পষ্ট হওয়ার বাকি আছে..?! ইসলামী বিধি-বিধান ও অন্যান্য রীতি-নীতির বিরাট পার্থক্য সকলেই বুঝুক..! আসমানী আইন ও মানব-রচিত মতাদর্শের মধ্যকার ব্যতিক্রমধর্মী দূরত্ব সবাই অনুধাবন করুক...!!

উপসংহারে আমরা এ গুরত্বপূর্ণ অধ্যায় তথা অমুসলিমদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা বিধানে তাঁর কর্মপন্থা সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাটির অবতারণা করতে চাই। তা হচ্ছে খায়বার বিজয়ের পর ইয়াহূদী সম্প্রদায় কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষ প্রয়োগে হত্যা প্রচেষ্টার ঘটনা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ قَالُوا صَدَقْتَ قَالَ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَئُوا فِيهَا وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا قَالُوا نَعَمْ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ. »

ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামামায় মুসায়লামা কাযযাবের নিকট পাঠালেন। মুসায়লামা যখন তাকে প্রশ্ন করল যে, তুমি কি এটা বিশ্বাস কর যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর প্রশ্ন করল, তুমি কি এটা জান যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, আমি বধির, আমি তোমার কথা শুনি না। এ উত্তর শুনে তাকে শহীদ করে ফেলা হয়। অধিকতর জানতে- ইবন হাজর: আল-ইসাবাহ (১৫৮০), ইবন সা‘দ: আত-তাবাকাতুল কুবরা (১/৩২৮), ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (১/৫০৪)।

“খায়বার যখন বিজয় হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীয়াস্বরূপ একটি (ভুনা) বকরী প্রেরিত হয়। এর মধ্যে ছিল বিষ। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এখানে যত ইয়াহূদী আছে আমার কাছে তাদের জমায়েত কর। তার কাছে সবাইকে জমায়েত করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাদের নিকট একটি বিষয়ে জানতে চাই, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে? তারা বলল: হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের পিতা কে? তারা বলল, আমাদের পিতা অমুক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ; বরং তোমাদের পিতা অমুক। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন ও সঠিক বলেছেন। এরপর তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদের নিকট আর একটি প্রশ্ন করি, তা হলে কি তোমরা সে ব্যাপারে আমাকে সত্য কথা বলবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম! যদি আমরা মিথ্যা বলি তবে তো আপনি আমাদের মিথ্যা জেনে ফেলবেন, যেমনিভাবে জেনেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, জাহান্নামী কারা? তারা বলল, আমরা সেখানে অল্প দিনের জন্যে থাকবো। তারপর আপনারা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরাই সেখানে লাঞ্ছিত হয়ে থাকো। আল্লাহর কসম! আমরা কখনও সেখানে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন, আমি যদি তোমাদের কাছে আর একটি বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে কি তোমরা সে ব্যাপারে আমার কাছে সত্য কথা বলবে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি এ বকরীর মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছ? তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিসে তোমাদের এ উদ্বুদ্ধ করেছে? তারা

বলল: আমরা চেয়েছি, যদি আপনি (নবুওয়াতের দাবীতে) মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা আপনার থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। আর যদি আপনি সত্য নবী হন, তবে এ বিষ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”[159]

এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোরূপ প্রতক্রিয়াশীল আচরণ না করে অত্যন্ত ধীরতার সাথে তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা ইয়াহূদীদের নিকট থেকে আগে ঘটনাটি যাচাই করলেন। তাদের বিরুদ্ধে প্রমান সাব্যস্ত করলেন। এমনকি তারা নিজেরাই স্বীকার করল যে, হত্যা প্রচেষ্টায় তারা জড়িত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও খুজে বের করলেন যে, এসব ইহুদীরা এক ইয়াহূদী মহিলাকে আদেশ করেছে যে, সে যেন একটি ভুনা করা বকরীর মধ্যে বিষ মিশিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যায়। পুরুষরা হলো হুকুমের আসামী। আর যে বাস্তবায়ন করেছে সে হলো একজন নারী।

প্রিয় পাঠক! এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিক্রিয়া জানার আগে এক মূহুর্ত একটু ভাবুন তো এ ধরণের ঘটনা যদি পৃথিবীর অন্য কোনো রাজা-বাদশাহ, নেতা-নেত্রী ও আমীর-উমারাদের বেলায় ঘটতো তাহলে তাদের প্রতিক্রিয়া কী দাড়াত...?! এ ধরণের পরিস্থিতিতে ঘটনার উদ্দোক্তা, পরামর্শদাতা, আদেশদাতা, বাস্তবায়নকারী, অবগত ব্যক্তিসহ এহেন ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকেই হত্যার আদেশ দেওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই কেউ ভাবতে পারতো না। কখনো কখনো এ ধরণের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির গোটা এলাকা জুড়ে গণ -গ্রেফতার চালিয়ে দেওয়া হয়। কোনো অতিরঞ্জন নয়; এটাই বাস্তবতা!! এবার চলুন, দেখি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কী

---

[159] সহীহ বুখারী: (باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم،كتاب الطب) হাদীস নং ২৯৯৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫০৮; আহমদ, হাদীস নং ৯৮২৬।

করেছিলেন?! সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মহিলাটিকে হত্যা করছেন না কেন?! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বারণ করলেন। বললেন, 'এটা তো হত্যা প্রচেষ্টা মাত্র। বাস্তব হত্যা নয়। এর কারণে মহিলাকে হত্যা করা যাবে না'। তিনি মহিলাকে কোনো শাস্তিও দিলেন না। মহিলাকে আদেশ দানকারী ইয়াহূদীদের কাউকেও না। কারণ, তিনি তাদের ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন। বিষ প্রয়োগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তারা বলেছিল যে, আমরা চেয়েছি, যদি আপনি (নবুওয়াতের দাবীতে) মিথ্যাবাদী হন তাহলে আমরা মুক্তি পেলাম। আর যদি সত্য নবী হন তাহলে বিষ আপনার কিছুই করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাখ্যা মেনে নিলেন। অথচ তাদের কেউই তখন মুসলিম ছিল না এবং পরবর্তীতেও ইসলাম গ্রহণ করে নি। এতে বুঝা যায় যে, তারা তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নবুওয়াতের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নয়; বরং হিংসা বশতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্যই তা করেছে।

এতকিছুর পরও তাদের কাউকেই কোনো শাস্তি দেওয়া হয় নি...।

তবে হ্যাঁ, বিশর ইবনুল বারা ইবন মা'রূর[160] নামীয় এক সাহাবীও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উক্ত বিষাক্ত বকরীর গোশত খেয়েছেন। পরবর্তীতে সে বিষের প্রভাবেই তিনি মারা যান। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসাসস্বরূপ ঐ মহিলাকে হত্যা করার আদেশ

160. বিশর ইবনুল বারা ইবন মা'রূর আল-আনসারী আল-খাযরাজী। আকাবার শপথ, বদর, উহুদ ও খনদকে অংশগ্রহণ করেছেন। সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাওয়া বিষের ক্রিয়ায় শাহাদাত বরণ করেন। অধিকতর জানতে- ইবন হাজর: আল-ইসাবাহ (৬৫৪), ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (১/১১৫,১১৬), ইবন আবদিল বার: আল-ইসতি'আব (১/১৫)।

দেন। মহিলা ব্যতীত অন্য কাউকেই হত্যা করা হয় নি। আল্লামা কাজী 'ইয়ায[161] বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষ প্রয়োগের কথা জানতে পেরে সাথে সাথেই মহিলাকে হত্যা করেন নি। তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, না। পরবর্তীতে বিশর ইবনুল বারা যখন সে বিষের ক্রিয়ায়ই মারা গেলেন তখন কিসাস স্বরূপ মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে।"[162]

একটু ভেবে দেখুন তো, পৃথিবীর অতীত কিংবা বর্তমানের কোনো নেতা-নেত্রীদের হত্যা প্রচেষ্টায় তদবীরকারীদের সাথে তাদের আচরণ কীরূপ হয়?! তাদের নিকটতম কোনো সহচরের মৃত্যুতেই বা তাদের প্রতিক্রিয়া কী হয়?!!

গবেষণা দ্বারাই অস্পষ্টতা দূরিভূত হয়..!

তুলনা করলেই পার্থক্য ফুটে ওঠে..!

পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের চরিত্রের সাথে নবী চরিত্রের তুলনা করার দুঃসাহস কে দেখাবে..? সাধারণ মানুষের আখলাক এক জিনিষ আর নববী আখলাক তো সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ...!!

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكۡرَىٰ لِأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [الزمر: ٢١]

"এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২১]

---

161. কাজী 'ইয়ায। আবুল ফযল 'ইয়ায ইবন মূসা ইবন 'ইয়ায আল- হাইসাবী আস-সাবতী। (৪৭৬-৫৪৪ হি. মোতাবেক ১০৮৩-১১৪৯ ইং) তার সময়ে তিনি হাদীস, নাহু, ভাষা ও বিভিন্ন শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। প্রথমে নিজ জন্মস্থান সাবতাহ শহরের ও পরে গারতানাহ শহরের বিচারক ছিলেন। মারাকাশে মারা যান। দেখুন- আয-যারাকলী: আল'লাম (৫/৯৯)।

162. আল্লামা নববী: শরহে সহীহ মুসলিম (১৪/১৭৯)।

পঞ্চম অধ্যায়

অমুসলমিদরে সাথে সদাচরণ

জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই শান্তিতে বসবাস করার স্বপ্ন লালন করে। এ স্বপ্ন ও আশা -আকাঙ্খা নিয়েই বেঁচে থাকে। পারস্পরিক বিভিন্ন পক্ষের মাঝে সম্মান ও ভদ্রতা বজায় রেখে চলে। আকীদা-বিশ্বাসে, চিন্তা-চেতনায় ও জাতি-সত্তায় বিরোধীদের সাথে সমঝোতা করে চলতে চায়। কর্মক্ষেত্রের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যাতে যুলুম-নির্যাতনের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এ শ্রেণির লোকের সংখ্যা খুবই সল্প। একই কর্মক্ষেত্রে হওয়া সত্ত্বেও অনেক কম লোকই আছে যারা হাসি-খুশি, হৃদ্যতা-ভালোবাসা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পরস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে চুড়ান্ত উন্নতি ও অগ্রগতির স্বপ্ন দেখতে পারে।

আর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সদাচরণ করা ও প্রতিপক্ষের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং এটাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মূলনীতি বানিয়ে নেওয়ার কথা তো অনেকে কল্পনাও করতে পারে না!

এটাই ইসলাম...।

জগতের অধিকাংশ মানুষই; বরং অধিকাংশ মুসলিমই যাকে এখনো চিনতেই পারে নি...।

আল্লাহ চাহে তো এ অধ্যায়ে আমরা অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করব। অধ্যায়টি নিম্নোক্ত তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত:

প্রথম পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদের সাথে সদাচরণের ঐশী পদ্ধতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্যাতনকারী অমুসলিমদের সাথে তাঁর সদাচরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ:

অমুসলিমদের সাথে সদাচরণের ঐশী পদ্ধতি

অমুসলিমদের সাথে সদাচরণে ঐশী পদ্ধতির সৌন্দর্যের মূল উৎস তো এটা যে, এ পদ্ধতি কোনো মানুষের বানানো নিয়ম-কানুন নয়, যা করা না করার ব্যাপারে মানুষ সমঝোতা করে নিবে; বরং তা হচ্ছে আসমানী ইলাহী পদ্ধতি। মুসলিমগণ ইবাদত হিসেবেই যার সার্বদায়িক বাস্তবায়ন করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨﴾ [الممتحنة: ٨]

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করে নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।" [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৮]

কতোই না মহান আমাদের আল্লাহ..!

কতোই না অনুগ্রহ আল্লাহ তা'আলার...!

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদেরকে অসিয়ত করেছেন যে, ঐ সকল মানুষদের সাথেও সদাচরণ করতে যারা আল্লাহ তা'আলার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরোধী পথ ও পন্থার অনুসরণ করেছে!!

মুসলিমরা আকীদা-বিশ্বাসে তাদের বিরোধীদের সাথে সদাচরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জন করতে চায়। যতক্ষন না বিরোধীরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় অথবা তাদের প্রতি অত্যাচার করে..!!

﴿أَن تَبَرُّوهُمۡ﴾ উক্ত শব্দের ব্যাখ্যায় ইবন কাসীর রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেন যে, تحسنوا إليهم ‘তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ কর’।[163]

এ بر বা সদাচরণ ন্যায়-ইনসাফ থেকেও উঁচু পর্যায়ের। তাইতো আল্লাহ তা‘আলা সদাচরণ-এর সাথে ন্যায় ও ইনসাফকে সংযোজন করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ

আবার আল্লাহ তা‘আলা উক্ত আয়াতে সদাচরণের জন্য এমন শব্দ بر ব্যবহার করেছেন, যা সাধারণত সর্বোন্নত ও মহৎ আচরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কুরআন ও হাদীসে এ শব্দটিকে সন্তান কর্তৃক মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করল যে, আল্লাহ তা‘আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কী? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, “সময় মতো সালাত আদায় করা। অতঃপর পুনরায় প্রশ্ন করল যে, তারপর কোন আমল? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«ثم بر الوالدين»

“অতঃপর মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করা”[164]

আবার কল্যাণ অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

163. ইবন কাসীর: তাফসীরুল কুরআন (৪/৪৪৭)

164. সহীহ বুখারী كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل الصلاة على و قتها)) হাদীস নং ৫০৪। সহীহ মুসলিম كتاب الإيمان ، باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال)) হাদীস নং ৮৫।

﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ﴾ [ال عمران: ٩٢]

“তোমরা কখনও بر বা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না কর।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯২]

এভাবে কুরআন ও সুন্নাহে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যার প্রত্যেকটিতেই بر বা সদাচরণের মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! যুদ্ধ চলাকালীন সময় ছাড়া অন্য সব সময় অমুসলিমদের সাথে এ بر বা সদাচরণেরই আদেশ আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে করেছেন।

অমুসলিমদের সাথে আচরণের এ ঐশী পদ্ধতি যতটা মহৎ ও সর্বোন্নত ততটাই উন্নত ও মহৎ হবে এ পদ্ধতির চর্চা ও বাস্তবায়ন যে রাসূল করেছেন তাঁর চরিত্রও। যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যকার সম্পর্ক শুধু সাধারণ অর্থে শান্তি ও ঐক্যমতের সম্পর্কই ছিল না; বরং তা ছিল সকল অর্থেই بر বা সদাচরণের সম্পর্ক।

আমরা কখনও এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবো না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আশপাশের অমুসলিমদের সাথে এমন হৃদ্যতামূলক সদাচরণ করতেন যা কোনো মানুষ নিজ পরিবারের একান্ত আপন লোকদের সাথে করে থাকে। যেমন, আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে এ বিষয়ে একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ

عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ»

"এক ইয়াহূদী ছেলে ছিল যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করত। একবার সে অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য আসলেন। অতঃপর তার মাথার কাছে বসে বললেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণ কর' তখন ছেলেটি তার পিতার দিকে তাঁকালে তার পিতা বলল: তুমি আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা মেনে নাও। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন"।[165]

আপনি একটু গভীরভাবে মন ও মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করে দেখুন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ইয়াহূদী ছেলেকে নিজের খেদমতের জন্য রেখেছেন, তাকে এ থেকে বারণ করেন নি। যাতে মদীনা মুনাওয়ারায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা সম্ভব হয়। ছেলেটি অসুস্থ হওয়া পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তার বাড়িতে যান।

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে ছিলেন। তা সত্বেও তিনি অমুসলিম একটি ইয়াহূদী ছেলেকে নিজের খিদমত করতে বারণ করেন নি। আবার কোনো রাষ্ট্র প্রধান তার অসুস্থ চাকর/কর্মচারীকে দেখতে যাওয়া এবং তার সেবা-শুশ্রূষা করার এমন

---

165. সহীহ বুখারী (كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه و هل يعرض على الصبي الإسلام) হাদীস নং ১২৯০; তিরমিযী, হাদীস নং ২২৪৭। নাসায়ী, হাদীস নং ৭৫০০।

কোনো দৃষ্টান্ত কি পৃথিবীর বুকে পাওয়া যাবে?! বিশেষ করে সে চাকর/কর্মচারী যখন অন্য ধর্মাবলম্বী...?!

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরণের অসংখ্য অগণিত ঘটনা আমরা পড়েছি। সুতরাং শুধু জানা ও জানানোর জন্যই নয়; বরং উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো যাতে এ ধরণের ঘটনা-ভাণ্ডারে চিন্তা-গবেষণা করে আমারা প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারি।

আবার দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথাবীতে তাঁর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য তথা দাওয়াতকেও ভুলে যান নি; তাই তিনি ছেলেটিকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং সে ইসলামকে গ্রহণও করেছে। ছেলেটির ইসলাম গ্রহণ তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এতো আনন্দ দিয়েছে যে, যেন তাঁর পরিবারের অত্যন্ত স্নেহভাজন ও নিকটতম কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এটিই হলো উন্নততর بر বা সদাচরণ।

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা[166] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قريش ،إذ عاهدوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يا رسول الله! إن أُمِّي أَقْدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُها ؟ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِيها»

“যখন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ

166. আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে এবং যুবাইর ইবন আওয়াম-এর স্ত্রী। তিনি মক্কাতে ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন তখন তাঁর গর্ভে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর এবং প্রতিমধ্যে ‘বুক্বা’ নামক স্থানে তিনি সন্তান প্রসব করেন। ছেলে আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইরকে হত্যার পর তিহাত্তর হিজরীর জুমাদাল উলাতে মক্কায় মার যান। দেখুন- ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ ৬/১২, ইবন হাজার: আল ইসাবাহ (১০৭৯১)

হলো তখন আমার মা[167] আমার কাছে আসল মুশরিক অবস্থায়। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছে এবং সে মুখাপেক্ষী। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার সাথে সদাচরণ কর।"[168]

সে সময় কুরাইশরা মুসলিমদের সাথে সাময়িকভাবে চুক্তিবদ্ধ থাকলেও তারা ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে সদা তৎপর একটি যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়। এতদসত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তার মুশরিকা মাতার সাথে সদাচরণের আদেশ করেন। তিনি মুশরিকা মহিলাকে মদীনা মুনাওয়ারায় আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তথা যুবাইর ইবন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন নি। যুবাইর ছিলেন মদীনার নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তার কাছে এমন গোপন সংবাদ ছিল যা মুশরিকদের নিকট গোপন রাখা অতিব জরুরী। তারপরেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুশরিকা মহিলাকে তার মুসলিমা মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা দেন নি এবং মুসলিমা মেয়েকে তার মুশরিকা মায়ের সাথেও সদাচরণ করতে বারণ করেন নি। এভাবেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ধরণের দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই সর্বোচ্চ উদারতা প্রদর্শন ও সদাচরণ করতেন। কেননা,

---

167. তিনি হলেন বনু আমের ইবন লুয়াই গোত্রের ক্বুতাইলা বিনতে সা'দ, আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী এবং আব্দুল্লাহ ও আসমার মা। ইবনুল আসীর মহিলা সাহাবীদের অধ্যায়ে তার আলোচনা করেছেন। ইবনুল আসীর বলেন: তিনি বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মদীনায় হিজরত করেন মুশরিক অবস্থায়, দেখুন: ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (৬/২৪২)।

168. সহীহ বুখারী (باب الهدية للمشركين،كتاب الهبة و فضلها) হাদীস নং ২৪৭৭; সহীহ মুসলিম: (كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة و الصدقة على الأقربين) হাদীস নং ১০০)।

সদাচরণের মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মসজিদে নববীর দরজার পাশে এক জোড়া রেশমী পোষাক (বিক্রি হতে) দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি এটি খরিদ করতেন আর জুমু‘আর দিন এবং যখন আপনার কাছে কোনো প্রতিনিধিদল আসে তখন আপনি তা পরিধান করতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি তো সে ব্যক্তিই পরিধান করে, আখিরাতে যার (মঙ্গলের) কোনো অংশ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ধরণের কয়েক জোড়া পোশাক আসে, তখন তিনি তার এক জোড়া উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রদান করেন। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এটি পরিধান করতে দিলেন অথচ আপনি রেশমের পোশাক সম্পর্কে যা বলার তা তো বলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এটি নিজের পরিধানের জন্য প্রদান করি নি। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তখন এটি মক্কায় তাঁর এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দেন।[169]

এখানে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিজের রেশমী কাপড় জোড়া তাঁর এক মুশরিক ভাইকে[170] দিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার

169. সহীহ বুখারী (كتاب الجمعة ، باب يلبس أحسن ما يجد) হাদীস নং ৮৮৬; সহীহ মুসলিম (كتاب اللباس و الزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب الفضة) হাদীস নং ২০৬৮।

170. তিনি হলেন উসমান ইবন আবদ হাকীম, তিনি উমার রাদিয়াল্লাহ আনহুর বৈপিত্রিয় ভাইপ। রবর্তীতে তার ইসলাম গ্রহণ নিয়ে মতানৈক্য আছে। দেখুন- ইবন হাজার:

কোন প্রতিবাদ করেন নি!

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌন সমর্থনও সুন্নাহ-এর অংশ (অনুসরণযোগ্য)।

ইমাম নববী রহ. এ ঘটনার দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, কাফির নিকটতম আত্মীয়-এর সাথেও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা এবং কাফিরদেরকে হাদীয়া দেওয়া জায়েয;[171] বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে এমন আচরণ করেছেন যা দেখে দুনিয়াবাসী অত্যন্ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদেরকে মসজিদে নববীতে তাদের ধর্মীয় রীতিতে সালাত আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন।

ইবন সায়্যিদুন নাস[172] তার 'উয়ূনুল আসর' গ্রন্থে বলেন, যখন তাদের (নাসারদের) সালাতের সময় হলো তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে এসে সালাত আদায় করতে শুরু করল, (সাহাবায়ে কেরাম কিছু বলতে চাইলে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও (কিছু বলো না)। অতঃপর তারা পূর্ব দিকে ফিরে সালাত আদায় করলো।[173]

তারা শুধু মসজিদে নববীতে প্রবেশই করে নি; বরং সেখানে তাদের নিজ ধর্মীয় নিয়মে সালাতও আদায় করেছে। এক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কারো প্রতি সদাচরণ করা থেকে বিরত থাকেন

ফাতহুল বারী ১/৩৩১।

171. ইমাম নববী: আল মিনহাজ: সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ১৪/৩৯।

172. তিনি হলেন ইমাম আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবন আবি আমর আন্দুলূসী, তবে তিনি ইবন সায়্যিদুন নাস নামেই প্রসিদ্ধ (৬৬১-৭৩৪ হি.)।

173. ইবন সায়্যিদুন নাস: উয়ূনুল আসর ১/৩৪৮।

নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্যাতনকারী অমুসলিমদের সাথে তাঁর সদাচরণ

পিছনের ঘটনাবলীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ ও অবাক হলেও তা ছিল আমাদের বোধগম্য এবং বিবেক মেনে নেওয়ার মতো বিষয়। কিন্তু যে বিষয়টি আকলেরও মেনে নিতে কষ্ট হয় তা হচ্ছে ঐসব লোকদের সাথেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ করা যারা তাঁকে নানাবিধ কষ্ট দিয়েছিলো এবং তাঁর ওপর যুলুম-অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে ছিল।

যে কোনো মহৎ চরিত্রের মানুষের নিকট নিজের ওপর যুলুম অত্যাচার ও নির্যাতনকারীদের সাথেও ইনসাফ বজায় রেখে চলার আশা করা যায়। কিন্তু নিজের ওপর যুলুম অত্যাচার ও নির্যাতনকারীদের সাথে ইনসাফ নয় শুধু; বরং অনুগ্রহ, সহানুভুতি ও সদাচরণ দেখানো তো অসাধারণ আশচর্যজনক ব্যাপারই বটে..!!

বহুবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী পড়েছি যে, “তার সাথেও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ যে তোমার সাথে তা বিচ্ছন্ন করে। তাকেও দান কর যে তোমাকে বঞ্চিত করে। ক্ষমা কর তাকেও যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে।”[174]

কিন্তু এর ওপর পরিপূর্ণ আমল করা আমরাদের মুসলিমদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয না। কেননা সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, বঞ্চিতকারীকে দান করা, অত্যাচারীকে ক্ষমা করা (তারা মুসলিম হলেও)

[174]. আহমদ: হাদিস নং ১৭৪৮৮। শুয়াইব আল আরনাউত বলেন, তার সনদ হাসান।

অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। আর যদিও সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী, বঞ্চিতকারী ও অত্যাচারী ব্যক্তি অমুসলিম হয় তাহলে তো এমনটি চিন্তা করাও কঠিন..?!

এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এধরণের ঘটনা অনেক বেশি। যার প্রত্যেকটিই উন্নত চরিত্র ও উত্তম আখলাকের অনুপম নিদর্শন হয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন আচরণ একক ব্যক্তির সাথেও করেছেন এবং দলবদ্ধ লোকদের সাথেও করেছেন। করেছেন বিভিন্ন গোত্র ও শহরবাশীদের সাথেও...।

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নাখল' নামক স্থানে খাসফার যুদ্ধে[175] ছিলেন। এমন সময় মুসলিমদের অসতর্কতায় হঠাৎ গাওরাস ইবনুল হারিস নামক এক ব্যক্তি তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট এসে দাঁড়াল এবং বলল: কে এখন আপনাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ'। (এ উত্তর শোনার সাথে সাথে) তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারিটি উঠিয়ে বললেন, এখন কে তোমাকে আমার থেকে রক্ষা করবে? সে বলল: 'আপনি আমার প্রতি দয়াবান হোন।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই? সে বলল: না, কিন্তু আমি আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আমি আপনার সাথে আর যুদ্ধে লিপ্ত হব না এবং যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে তাদের অন্তর্ভুক্তও হব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে

175. আদনান গোত্রের খাসফা ইবন কায়স ইবন গায়লা।

ছেড়ে দিলেন। বর্ণনাকারী জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, অতঃপর সে তার সাথীদের নিকট[176] গিয়ে বলল, আমি এখন পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি।”[177]

দেখুন, লোকটি তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট এসে তাঁকে হত্যার হুমকি দিল; কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুক্তি দিলেন। সাথে সাথে অবস্থাই পরিবর্তন হয়ে গেল। তরবারি চলে আসলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে প্রতিহিংসার কোনো চিন্তাই আসে নি; বরং তিনি তার নিকট ইসলামকে উপস্থাপন করলেন। লোকটি ইসলামকে গ্রহণ করে নি। শুধু তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করেছে মাত্র। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সরলতার সাথে তার কথাকে গ্রহণ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিয়ে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একক ব্যক্তির সাথেই কেবল ক্ষমা, অনুগ্রহ ও সদাচরণ করেন নি; বরং অনেক গোত্রের ক্ষেত্রেও তাঁর এ ধরণের ক্ষমা ছিল ব্যাপক। অনেক বড় বড় শহরবাসীদের ক্ষেত্রেও তিনি একই ধরণের আচরণ করেছেন বহুবার। যে শহরের শত শত ও হাজার হাজার লোক তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করত এবং তাঁকে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট দিয়েই

176. ইবন হাজার উল্লেখ করেন, তার গোত্রের লোকেরা ইসলাম করেছে। দেখুন- ইবন হাজার: ফাতহুল বারী (৭/৪২৮)

177. সহীহ বুখারী ((كتاب المغازي ، باب غزوة ذات الرقاع)) হাদীস নং ৩৯০৫; সহীহ মুসলিম, ((كتاب الفضائل ، باب توكله على الله تعالى و عصمة الله تعالى له من الناس)) হাদীস নং ৮৪৩।

যেত।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে তিনি এমন দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা পেয়েছেন যা বর্ণনাতীত। তারা তাঁকে ও তার সাহাবীদেরকে প্রকাশ্যে, গোপনে, শারীরিক, মানসিক সর্বদিক থেকেই কষ্ট দিয়েছে। মক্কায় তো কষ্ট দিয়েছে। মদীনাতে যাওয়ার পরও ছাড়ে নি। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন সেখানেও তারা তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করল।

এভাবেই তাদের এ ইসলাম বিরোধী অভিযান দীর্ঘ কয়েক বছর চলতে থাকে। অবশেষে উহুদ যুদ্ধের দিন ঘটে গেল এক করুন ট্রাজেডি। সে দিন কুরাইশরা সত্তরজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে শহীদ করে। তারা আরবের রীতি-নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে শহীদদের লাশের বিশেষ করে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্মমভাবে বিকৃতি সাধন করে। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। তিনি দেখলেন সাহাবায়ে কেরামের শহীদী লাশগুলো উহুদের ময়দানে টুকরা টুকরা হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও শহীদ করার হীন চেষ্টা চালিয়েছে। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে। যার কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিনের যোহরের সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারেন নি; বরং বসে বসে আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে, আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে না। এরই মাঝে কিছু সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহাড়ে ঘেরাও করে ফেলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের কঠিন মূহুর্তগুলোর মধ্য হতে এটিই ছিল সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক মূহুর্ত।

এমন কষ্ট, ফেরেশানী ও বিপর্যস্থ অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা মুবারক থেকে রক্ত মুছতে মুছতে তাদের জন্য বদ-দো'আ না করে বরং দো'আ করে বললেন,

«رب اغفرلقومي فإنهم لا يعلمون»

"হে আল্লাহ! আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, কারণ তারা আমাকে চিনতে পারে নি।"[178]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে ঠিক তেমন সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেছেন যেমনটি দয়াদ্র পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-ক্লেশ পাওয়া সত্যেও করে থাকেন। তইতো রাসূলুল্লা হ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে হাত তুলে তাদের জন্য দো'আ করলেন; কিন্তু বদ-দো'আ করলেন না।

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা বার বার চ্যালেঞ্জ এবং মুসলিমদের সুবিন্যস্ত ঐক্যকে নির্মূল করার জন্য ধারাবাহিক যুদ্ধের পায়তারা করেই যাচ্ছিল। এরই প্রেক্ষিতে আরবের দশ হাজার যোদ্ধা একত্রিত হয়ে ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উমরা করতে বাধা দিয়ে বসল। অতঃপর হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হলো। কিছু দিন না যেতেই কুরাইশ কর্তৃকই পুনরায় চুক্তি ভঙ্গ হলো। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম দীর্ঘ বিশ বছরেরও অধিক সময় বিভিন্ন যুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করার প র বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিজয় বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং মক্কার ঐ সকল

---

178. সহীহ বুখারী: (كتاب استتابة المرتدين المعاندين و قتالهم ، باب إذا عرض الذمي بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله: السام عليكم) হাদীস নং ৬৫৩০; সহীহ মুসলিম:(كتاب الجهاد والسير : باب غزوة أحد) হাদীস নং ১৭৯২।

লোকেরা একত্রিত হলো যারা এতোদিন তাদের মাঝে বসবাস করেছে ঠিকই কিন্তু তারা তাদের প্রাপ্য সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মানটুকুও পায় নি। তাই তারা সকলেই এমন একটি রক্তপাতের দিনের প্রত্যাশা করেছে, যে দিন বিগত বছরগুলোর কষ্টের প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

অহংকারী কুরাইশবাসী লজ্জিত ও অপমানিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে দণ্ডায়মান হলো। অপেক্ষা করতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাদের ব্যাপারে হত্যার আদেশ করেন, নাকি দেশান্তর অথবা গোলামে পরিণত করার আদেশ করেন...। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও বিনয়ের সাথে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

«يا معشر قريش ما ترون أني فاعل منكم ؟!»

“হে কুরাইশবাসীরা, তোমরা কী মনে কর? আমি তোমাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেব?”

তারা সকলেই বলে উঠল: ‘কল্যাণের ফয়সালা করবেন। আপনি অত্যন্ত দয়ালু এবং দয়ালু পিতার সন্তান।’

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তোমরা সকলেই মুক্ত-স্বাধীন।”[179]

এমনই...!

এমনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ..!!

---

179. ইবন হিশাম: السيرة النبوية (২/৪১১), ইবনুল কাইয়ুম: زاد المعاد (৩/৩৫৬), আস সাহীলী: الروض الأنف (৪/১৭০), ইবন কাসীর: السيرة النبوي (৩/৫৭০) এবং দেখুন ইবন হাজার: ফাতহুল বারী (৮/১৮)।

না ছিল কোনো ধরণের নিন্দা ও তিরস্কার..!!

না ছিল কোনো ‘আযাব ও শাস্তি..!!

সত্যিই, ইতিহাসে এমন ঘটনা খুবই বিরল ও বিস্ময়কর..!!

ঘটনাটি শুধু আমাদের দৃষ্টিতেই বিস্ময়কর নয়; বরং সমকালীন সকল সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের দৃষ্টিতেও বিস্ময়কর ছিল..

সা‘দ ইবন উবাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানকে সম্বোধন করে বললেন,

«يا أبا سفيان ، اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الكعبة»

“হে আবু সুফিয়ান, আজ তো রক্তপাতের দিন, আজ তো মক্কায় (রক্তপাত) হালালের দিন।”[180]

সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু শত্রুতাবশতঃ বা বিদ্বেষ করে এ কথা বলেন নি; বরং মক্কা থেকে বিতাড়নের পর দীর্ঘ সফরের প্রত্যাশাই ছিল এটা।

কিন্তু সা‘দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছল, তখন তিনি বললেন,

«كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، و يوم تكسى فيه الكعبة»

“সা‘দ ভুল বলেছে বরং আজ এমন দিন যে দিন আল্লাহ তা‘আলা কা‘বাকে সম্মানিত করবেন এবং আজকের দিনে কা‘বাকে গিলাফে আচ্ছাদিত করা হবে।”[181]

---

180. সহীহ বুখারী: (كتاب المغازي ، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يوم الفتح) হাদীস নং ৪০৩০।

181. সহীহ বুখারী: (كتاب المغازي ، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يوم

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله فيه قريشا»

“আজ তো দয়া ও অনুগ্রহের দিন, আজকের দিনে আল্লাহ তা‘আলা কুরাইশদেরকে সম্মানিত করবেন।”[182]

এ ধরণের অভূতপূর্ব সদাচারণ দেখে আনসারী সাহাবীগণ বিস্মিত হয়ে গেলেন। এমনকি তারা পরস্পরে বলতে লাগলেন: “ব্যক্তিটিকে স্বদেশ-প্রেম ও স্বজনপ্রীতি পেয়ে বসেছে”।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«وَجَاءَ الْوَحْىُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْىُ لاَ يَخْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم- حَتَّى يَنْقَضِىَ الْوَحْىُ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْىُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ». قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِى قَرْيَتِهِ». قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ. قَالَ «كَلاَّ إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ». فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللهِ مَا قُلْنَا الَّذِى قُلْنَا إِلاَّ الضِّنَّ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ».

“এমন সময় অহী নাযিল হলো। বস্তুত অহী যখন নাযিল হতে থাকে তখন আমদের থেকে গোপন থাকে না। (তার অবস্থা দেখেই আমরা বুঝতে পারি) ফলে অহী নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে এবং তা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে চোখ তুলেও তাকাই না। অহী আসার সিলসিলা শেষ হতেই তিনি আনসারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! জবাবে তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো আমরা উপস্থিত আছি। তিনি বললেন, তোমরা মন্তব্য করেছিলে যে,

---

(الفتح) হাদীস নং ৪০৩০; বায়হাকী, হাদীস নং ১৮০৫৮।

182. দেখুন- ইবন হাজার: ফাতহুল বারী (৮/৯)।

“ব্যক্তিটিকে স্বদেশ-প্রেম ও স্বজনপ্রীতিই পেয়ে বসেছে”। তারা বলল, অবশ্যই এমন কথা কেউ বলেছে। তিনি বললেন, তা কখনো না, আমি আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল! আল্লাহ ও তোমাদের দিকেই হিজরত করেছি। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সাথে ও আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সাথে জড়িত। (তাঁর কথা শুনে) তারা (আনসারীরা) ক্রন্দনরত অবস্থায় তার সামনে আসল এবং নিজেদের উদ্ভট উক্তি স্বীকার করে বলল, আল্লাহর কসম, আমরা যা উক্তি করেছি তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি কার্পণ্য ছাড়া কিছুই নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাদের এ স্বীকারোক্তিকে গ্রহণ করে তোমাদের দুর্বলতাটিকে মাফ করে দিয়েছেন”।[183]

আনসারদের চারিত্রিক ও মানসিক মাহাত্ম্য থাকার পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহেন অবস্থান তাদের অনুধাবনেরও উর্দ্ধে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জানতেন যে, তাঁর অবস্থান সাধারণের পক্ষে অনুধাবন কঠিন। এ জন্যেই তিনি সহজভাবে বলে দিলেন:

« إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ »

“আল্লাহ তোমাদের এ স্বীকারোক্তিকে গ্রহণ করে তোমাদের দুর্বলতাটিকে মাফ করে দিয়েছেন”

এ ঐতিহাসিক দিনে তিনি শুধুমাত্র এ একটি পদক্ষেপই গ্রহণ করেন নি; বরং সেথায় তিনি এর থেকেও আরো অনেক চমকপ্রদ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আগামী অধ্যায়গুলোতে যার বিবরণ উপস্থাপন করার প্রয়াস চালাবো ইনশা-আল্লাহ।

183. সহীহ মুসলিম: (كتاب الجهاد: باب فتح مكة) হাদীস নং ১৭৮০; আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০২৪; নাসায়ী, হাদীস নং ১৩৫৬১; ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং ১৭৮৪৫।

আরব উপদ্বীপের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী তায়েফ। যেখানে আরবের কয়েকটি সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত গোত্র বসবাস করে। এ তায়েফবাসীর সাথেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক সেরূপ আচরণ করলেন যেমনটি করলেন মক্কাবাসীর সাথে।

নবুওয়াত প্রাপ্তির দশম বছরে চাচা আবু তালিবের ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ গেলেন। তায়েফবাসীকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। কিন্তু আরব্য অহংকার ও সম্ভ্রান্তির অহমিকা তাদেরকে প্রভাবান্বিত করে রেখেছিল। ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য তাদের কি করে হয়.?! তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠাট্টা ও উপহাসের পাত্র বানিয়ে নিয়েছিল যা তিনি কল্পনাও করেন নি। তাদের কর্তা ব্যক্তিগণ তাঁর সাথে নির্লজ্জতা ও মূর্খতাসুলভ মন্তব্য করতে লাগল। দল নেতাদের এ আচরণে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। কোনো গোত্রের প্রধান বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট থেকে এ ধরণের আচরণ খুব কমই প্রকাশ পায়।

আবদ ইয়ালীল ইবন আমর বলল, “আল্লাহ যদি তাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে সে কা‘বার গিলাফের পশম উপড়ানোয় লেগে যাক।”

মাসঊদ বলল, “আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে খুজে পায় নি..?!”

হাবীব বলল, “আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সাথে কোনো কথাই বলব না। যদি তুমি সত্য নবী হয়ে থাক তাহলে তোমার প্রতিউত্তর করলে তুমি আমার জন্য মহা ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক তাহলে তো তোমার সাথে আমার কথা বলাই উচিত নয়..!!”[184]

এতো কিছুর পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে দশ

---

[184]. সীরাতে ইবন হিশাম (২/২৬৭)।

দিন[185] অবস্থান করে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং প্রতিটি ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিলেন। কিন্তু তায়েফ নগরীর সকলেই একজোট হয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং বলল, তুমি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও।

শুধু তাই নয় বরং তখন তারা তাদের নির্বোধ ও বখাটে বালকদেরকে শহরের বাহিরে প্রেরণ করে রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী যায়েদ ইবন হারিসাকে দুই সারির মাঝখান দিয়ে যেতে বাধ্য করল আর ওরা তাঁকে প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে চলল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে তা পা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে গেল। আর যায়েদ ইবন হারিছার[186] মাথা ফেটে গেল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যায়েদ ইবন হারিছা আত্মরক্ষার্থে দ্রুত শহর থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন। তথাপি ঐ নির্বোধেরা গালি-গালাজ ও প্রস্তর নিক্ষেপ করতে করতে তাদের পিছু নিল। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে তাঁরা রবী'আহ-এর দুই পুত্র উতবাহ ও শাইবাহ-এর বাগানে আশ্রয় নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথাতুর হৃদয়ে অশ্রুপাত করতে করতে এ প্রসিদ্ধ দো'আটি করলেন: তিনি বললেন,

---

185. ইবন সা'আদ: আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা: (১/২১২)।

186. যায়েদ ইবন হারিছা ইবন শারাহিল আল-কালবী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম। গোলামেদর মাঝে সর্ব প্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। যয়নব বিনতে জাহাশকে বিবাহ করেন। অতঃপর তাকে তালাক দিয়ে উম্মে আইমানকে বিবাহ করেন। তার সন্তানদের মাঝে উসামাহ ইবন যায়েদ একজন। তিনি অষ্টম হিজরীতে শাম ভূ-খণ্ডের মুতা যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। দেখুন- ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতিয়াব (২/১১৪), ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (২/১৪০), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (জীবনী নং ২৮৮৫)।

»اللهم إنِّيْ أشْكو إليْكَ ضَعْفَ قُوّتِيْ ، وَ قِلّةَ حِيْلَتِيْ، وَ هَوَنِيْ عَلى النّاس، أنْتَ ارْحَمُ الرّاحِمِيْنَ، إلى مَنْ تكِلُنِي ؟ إلى عدو يتجهمني ؟ إلى قَرِيْبٍ مَلّكْته أمْرِي ؟ إنْ لمْ تكُنْ غَضْبَانَ عَلَيّ فَلا أبَالِي، غَيْرَ أنّ عَافِيَتَكَ أوْسَعُ لِي، أعُوذُ بِوَجْهِكَ الذي أشْرَقَتْ له الظّلُمَاتُ، و صَلحَ عَلَيْهِ أمْرُ الدُنْيَا وَالآخِرَةُ أنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أوْ يَحِلُّ بِي سَخَطُكَ، لَكَ العُتْبَى حَتّى تَرْضَى، وَ لا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاللّه «

“হে আল্লাহ! আপনার কাছেই আমার স্বামথ্যের দুর্বলতা, তদবীরের স্বল্পতা ও মানুষের মাঝে লাঞ্চনার অভিযোগ করছি। আপনিই সর্বোত্তম দয়ালু। আপনি আমাকে কার কাছে সোপর্দ করছেন? এমন শত্রুর কাছে যে আমার প্রতি বিষণ্ন? নাকি এমন নিকটবর্তী কারো কাছে যাকে আপনি আমার ওপর ক্ষমতাশীল বানিয়েছেন? যদি আপনি আমার ওপর রাগান্বিত না হন তাহলে আমার কোনো পরোয়া নেই। তবে আপনার ক্ষমা আমার জন্য অধিক প্রসস্ত। আপনার যে নিয়মের দ্বারা আধার চিরে আলো ওঠে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ন্ত্রণ ঠিক রয়েছে তার অসীলায় আপনার গযব নাযিল হওয়া কিংবা শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনার ওপরই সন্তুষ্ট যতক্ষণ আপনি রাজি থাকেন। আপনার সামর্থ দেওয়া ছাড়া কেউ গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং আপনার তাওফীক ছাড়া কেউ নেক কাজও করতে পারে না।”[187]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিমুখে চললেন আর ভাবছিলেন যে, কীভাবে মক্কা প্রবেশ করবেন? মক্কাবাসীরাও তো তাঁর সাথে একই আচরণ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময়কার তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলছেন,

187. মাজমা'উয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে আল্লামা হাইসামী বলেন, এ হাদীসটি যদিও ত্বাবরানী বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তাতে ইবন ইসহাক নামের একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার গ্রহণযোগ্যতা মুদলিস পর্যায়ের। আর অন্য বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই।

«فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ»

“তখন আমি অত্যন্ত বিষণ্ন অবস্থায় সম্মুখের দিকে চলতে লাগলাম এবং কারনূস ছা‘আলিব নামক স্থানে না পৌছা পর্যন্ত আমি সম্বিৎ ফিরে পাই নি”[188]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তামগ্ন হয়ে কষ্ট সহ্যকরে পথ চলতেছিলেন। যার বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

«فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ»

“কারনূস ছা‘আলিব নামক স্থানে না পৌছা পর্যন্ত আমি সম্বিৎ ফিরে পাইনি” কারনূস ছা‘আলিব তায়েফ থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরের একটি স্থান। নিশ্চই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এটি একটি কঠিনতম মুহুর্ত। এমন কঠিনতম মুহূর্তেও তিনি বললেন,

«فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

“তারপর যখন আমি মাথা উঠালাম তখন দেখি, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়াপাত করছে এবং এর মধ্যে জিবরীল আলাইহিস সালামকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ আপনার

---

188. সহীহ বুখারী: (كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت احداهما الآخرى) হাদীস নং ৩০৫৯; সহীহ মুসলিম: (كتاب الجهادوالسير : باب ما لقى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين) হাদীস নং ১৭৯৫। আল-কারনূস ছা‘আলিব মক্কা থেকে দুই মারহালাহ দূরত্বের একটি স্থান। যা নাজদবাসীর জন্য হজের মীকাত।

প্রতি আপনার সম্প্রদায়ের উক্তি এবং আপনার বিরুদ্ধে তাদের উত্তরও শুনেছেন এখন তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফিরিশতাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজনের ব্যাপারে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ আদেশ তাঁকে করেন। তখন পাহাড়ের ফিরিশতাও আমাকে ডাক দিলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর বললেন, ইয়া মুহাম্মাদ! আপনার রব আপনার কাছে আমাকে এজন্যে পাঠিয়েছেন যেন আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে নির্দেশ দেন। (আপনি বললে) আমি এ পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপা দিয়ে দিব। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বললেন, আমি বরং আশা করছি যে, আল্লাহ তা'আলা হয়তো এদের ঔরস থেকেই এমন বংশধরদের জন্ম দিবেন, যারা তাঁর সঙ্গে কিছু-কে শরীক না করে এক আল্লাহর ইবাদত করবে।"[189]

নিশ্চয় এটি ইতিহাসের এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত!!

আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাগণসহ জিবরীল আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলেন যেন তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করেন এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করেন।

সরাসরি পাহাড়ের ফিরিশতাকে পাঠানোর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাদের ধ্বংস কামনা করতেন তাহলে এতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হতেন না। কিন্তু মুশরিক অবস্থায় কারো নিহত হওয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনন্দ দেয় না। তাঁর তো মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অন্যটি। তিনি তো তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে

189. সহীহ বুখারী: (كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت احداهما الآخرى) হাদীস নং ৩০৫৯।

ফেলার জন্য তায়েফে গমন করেন নি। তিনি তো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে চাচ্ছেন, কিন্তু মানুষ তা বুঝে না। মানুষ জাহান্নামের দিকেই দৌড়াচ্ছে। চিরস্থায়ী ধ্বংস ঠেকানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিজেদের চেয়েও তাদের জীবনের প্রতি অধিক উৎসুক। তাইতো তিনি ফিরিশতাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন "আল্লাহ তা'আলা হয়তো এদের ঔরস থেকেই এমন বংশধরদের জন্ম দিবেন, যারা তাঁর সঙ্গে কিছু-কে শরীক না করে এক আল্লাহর ইবাদত করবে।"

কোনো জাতির কি এমন ইতিহাস আছে.?

মুসলিমরা কি তাদের অতীত ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠার পরতে পরতে এবং নবী জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে যে মহা ধন-ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে সেগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত?

দিন অতিবাহিত হচ্ছে। সময় ফেরিয়ে যাচ্ছে। তায়েফের সাক্বীফ গোত্র এখনো কুফুরীতেই অটল আছে। এর মধ্যে ইসলামের অনেক বিরোধিতা করেছে। আল্লাহর দীনের পথে বহু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এক পর্যায়ে মুসলিমদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য হাওয়াযিন গোত্রের সাথে মিলিত হয়ে হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। পরিশেষে পরাজিত হয়ে পালিয়ে তায়েফে গিয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস পর্যন্ত তায়েফ অবরোধ করে রাখলেন। কিন্তু তায়েফের দূর্গগুলোর মজবুতি ও সৈন্যদের দৃঢ় অবস্থানের কারণে তায়েফ বিজয় করতে পারলেন না এবং সেখান থেকেই অবরোধ উঠিয়ে ফিরে আসলেন। সাহাবীদের ব্যাপারটি মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাকীফের তিরন্দাজ বাহিনী আমাদেরকে অনেক জ্বালিয়েছে। আপনি তাদের জন্য বদ-দো'আ করুন।

তিনি বললেন, হে আল্লাহ আপনি সাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান করুন..!![190]

এত সব দুঃখ-কষ্ট ও যাতনার পরেও তাঁর প্রতি উত্তর ছিল -হে আল্লাহ আপনি সাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান করুন..!!

হ্যাঁ, হে আল্লাহ আপনি সাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং গোটা মানবজাতিকে হিদায়াত দান করুন...!

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাইফ স্টাইল সম্পর্কে জানে। যে তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও টার্গেট সম্পর্কে অবহিত। যে তাঁর চারিত্রিক মাহাত্ম, গুণ-গরিমার শ্রেষ্ঠত্ব, আভ্যন্তরীন পরিচ্ছন্নতা ও ক্বলবের স্বচ্ছতাকে বুঝতে পেরেছে....।

এ সব কিছু যে ব্যক্তি জানে তার কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কাজই অবাক করার মতো মনে হবে না। তাঁর কোনো আচরণেই সে আশ্চর্যান্বিত হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সংক্ষিপ্ততা ও দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়াকে, জান্নাতের মূল্য ও তার মাহাত্মকে এবং জাহান্নামের শাস্তি ও তার কঠোরতাকে ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি পুরো জীবনটাকেই গোটা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিজের কোনো অধিকারের চিন্তা তিনি করেন নি। নিজস্ব স্বার্থ-চিন্তা কিংবা নিজের প্রতি কারো অবিচারের প্রতিশোধ চিন্তা কিছুই করেন নি।

হে আল্লাহ! আপনি তাঁর দলে আমাদের হাশর করুন এবং তাঁর ঝাণ্ডার নিচেই আমাদের একত্রিত করুন।

---

190. তিরমিযী হাদীস নং ৩৯৪২। তিনি বলেন, এটি হাসান, সহীহ, গারীব। আহমদ, হাদীস নং ১৪৭৪৩।

আল্লাহ চাহে তো, আগামী অধ্যায়ে আশ্চর্যজনক ও অভূতপূর্ব সব দৃশ্য চিত্রিত হবে। কতই না পবিত্র সেই সত্ত্বা যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কৃত অনুগ্রহকে বিশেষায়িত করেছেন এভাবে যে,

﴿وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عليكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣]

“আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৩]

ষষ্ঠ অধ্যায়:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিরোধী নেতাদের তাঁর সাথে সদাচরণ

বিগত অধ্যায়ে আমরা অমুসলিমদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহ ও বদান্যতা সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং যারা তাঁর ওপর অধিকহারে নির্যাতন করেছিল তাদের প্রতি তার দূর্লভ সদাচরণ সম্পর্কেও অবহিত হয়েছি। মক্কা, তায়েফ ও অন্য যে সকল সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক কষ্ট দিয়েছিল। তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণের যে বর্ণনা আমরা পেয়েছি তা যদি হয় বিরল, দূর্লভ ও ইতিহাসের পাতায় দুষ্প্রাপ্য; তাহলে এখন আমরা যে অধ্যায়ের অবতারণা করবো মানবেতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া হবে একেবারেই অসম্ভব, অকল্পনীয়।

এ অধ্যায়ে আমরা ঐ সকল শত্রু নেতাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করব যারা বছরের পর বছর তাঁর বিরোধিতা করেছিল ও তাঁর মুকাবেলায় যুদ্ধ করেছিল। যারা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য সব সময় দল পাকাতো এবং অবিরাম চেষ্টায় লেগে থাকতো, যারা শুধু নিজেরা ষড়যন্ত্র ও যুলুম-অত্যাচার করেই ক্ষ্যান্ত হতো না; বরং অন্যদেরকেও সেজন্য উদ্বুদ্ধ করতো, যারা ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর মূল হোতা এবং অপরাধ জগতের গডফাদার। শুধু তাই নয় যারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণনাশের জন্য অভিযানের পর অভিযান পরিচালনা করেছিল। এত কিছুর পরও তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে কোনো ধরণের হিংসা, বিদ্বেষ বা শত্রুতাভাবের উদয় হয় নি এবং তার সু-নির্দিষ্ট সদাচরণ-নীতি বা স্বভাবসুলভ নম্রতারও বিচ্যুতি ঘটে নি।

এ অধ্যায়কে আমরা দু’টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করবো।

প্রথম পরিচ্ছেদ: মক্কার শত্রু-নেতাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অন্যান্য গোত্রের শত্রু-নেতাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ:
মক্কার শত্রু-নেতাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইইহ ওয়াসাল্লাম এর সদাচরণ

এ পরিচ্ছেদে আমরা মক্কার ঐ সব বড় বড় শত্রু-নেতাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণের পৃষ্ঠা উন্মুক্ত করবো যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দীর্ঘ তিক্ত শত্রুতা পোষণ করতো।

এক. আবু সুফিয়ানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ

আবু সুফিয়ান কুরাইশের একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিল না। তাকে প্রজ্ঞা ও দক্ষ নেতৃত্বের জন্য প্রসিদ্ধির শীর্ষে থাকা কয়েকজনের মধ্যে গণ্য করা হতো এবং ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হওয়ার পরে সে নিরপেক্ষ ছিল না; বরং ইসলামের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছিল এবং ইসলামের ক্রমবৃদ্ধি ও অগ্রসরমানতাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। ইসলামকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সাধনায় লিপ্তদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ছিল অন্যতম। ঐতিহাসিক আল্লামা তাবারী হিজরতের পূর্বে দারুন-নাদওয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা পরিকল্পনায়

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের নামও উল্লেখ করেছেন।[191] মাদানী জীবনে উবায়দাহ ইবন হারেসের[192] নেতৃত্বে ইসলামের প্রথম সারিয়্যায়'[193] (যুদ্ধাভিযানে) মক্কার কাফিরেদের সেনাপ্রধান ছিল এ আবু সুফিয়ান। সে কাফির সৈন্যদেরকে 'সানিয়্যাতুল মুররাহ'[194] নামক স্থানে একত্রিত করেছিল। যে বণিক কাফেলাকে কেন্দ্র করে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল -আবু সুফিয়ান ছিল সে কাফেলার প্রধান এবং সে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল। বদর যুদ্ধে শীর্ষ ও নেতৃস্থানীয় কাফিরদের সত্তর জন নিহত হওয়ার সুবাদে কুরাইশের সকল শাখার একমাত্র নেতৃত্ব আবু সুফিয়ানের হাতে এসে যায়। মক্কার ইতিহাসে এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা এবং এজন্যই আবু সুফিয়ান ইসলাম বিরোধী যুদ্ধে কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রসমূহের একমাত্র সংগঠক ও সমন্বয়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বদরের যুদ্ধে তার এক পুত্র (হানযালাহ) নিহত হয় এবং অপর পুত্র (আমর) মুসিলমদের হাতে বন্দি হয়।[195] ফলে তার প্রতিহিংসার আগুন আরো জলে ওঠে এবং সে সব সময়

---

191. তারীখুত-তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক (১/৫৬৬)।

192. উবায়দাহ ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন আবদি মানাফ আল-ক্বারাশী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়েও দশ বছর বেশি বয়সী ছিলেন। রাসূল দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নিজ দুই ভাইসহ মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তার আলাদা সম্মান ও মর্যাদা ছিল। অধিকতর জানতে- ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতি 'আব (৩/১৪১), ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (৩/৪৪৮), ইবন হাজার: আল ইসাবাহ (৫৩৭৯)।

193. সীরাতে ইবন হিসাম: (২/১৩৬)। ইবন ইসহাক বলেন, এটিই ইসলামের প্রথম সারিয়্যাহ। অন্যদের মতে প্রথম হচ্ছে, সারিয়্যায়ে হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব।

194. মুররাহ বা মুরাহ উভয় উচ্চারণ সুদ্ধ। হিজরতের পথে একটি গলি ও একটি দুর্গন্ধময় পুকুরের মধ্যবর্তি প্রসিদ্ধ স্থান। সূত্র: মুহাম্মদ হাসান শুররাব: আল-মাআলিমুল আসীরাহ ফিস-সুন্নাতি ওয়াস-সীরাহ (২৫০)

195. ইবনু সায়্যিদিন-নাস: উয়ূনুল আসার (১/৪৩২)

এ চেষ্টায় থাকত যে, সে নিজ হাতে একজন বিখ্যাত সাহাবী সা‘দ ইবন নু‘মান ইবন আকাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বন্দি করে তার পুত্রকে বন্দি করার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সে এ মর্মে শপথ করেছে যে, মুহাম্মাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে স্ত্রী-সঙ্গম করবে না। বাস্তবেও করেছে তাই। দুইশত অশ্বারোহীকে একত্র করে রাতের অন্ধকারে মদীনার ওপর অতর্কিত হামলা করে বসে। এতে দুইজন আনসারী সাহাবী শহীদ হন।[196] ইতিহাসে এটিকে গাযওয়াতুস-সুয়াইক নামে নামকরণ করা হয়।[197] উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে তিন হাজার কাফির সৈন্যের নেতৃত্বে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। উহুদ হচ্ছে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় সংকট ও মুসীবতের ইতিহাস। যুদ্ধের শুরুতে সাহায্য আসলেও শেষের দিকে তা আবার মুসীবতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং কাফিরদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। সেদিন সত্তরজন মুসলিম শহীদ হন। আবু সুফিয়ান সেদিন সালামা ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে[198] হত্যা করে।[199] কেউ কেউ বলেন, গাসীলুল মালাইকাহ হানজালাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও[200] আবু সুফিয়ানই হত্যা

---

196. একজন মা‘বাদ ইবন আমর আরেকজন তার সাথী যার নাম জানা যায় নি। ইবন ইসহাক পুরা ঘটনা উল্লেখ করেছেন তবে কারো নাম লিখেন নি।

197. ইবন কাসীর: আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যাহ (২/৫৪০)

198. সালামা ইবন সাবিত ইবন ওয়াকাশ আল-আনসারী আল-আশহালী। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। উহুদ যুদ্ধে তার ভাই আমর ইবন সাবিতসহ শহীদ হয়েছেন। তিনি নিহত হয়েছেন আবু সুফিয়ান ইবনুল হারাব এর হাতে। অধিকতর জানতে- ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতি‘আব (২/২০০), ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (২/২৯১), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (৩৩৬২)।

199. ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (১/৪৬৬)।

200. হানজালাহ ইবন আবি আমের। বিয়ের রাতে যুদ্ধে গিয়েছেন। যুদ্ধের আহ্বান শুনেই বেরিয়ে পড়েছেন। ফরজ গোসলও করতে পারেননি। অতঃপর ফেরেস্তারা তাকে গোসল দিয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাকে আবু সুফিয়ান হত্যা করে নি; তাকে হত্যা করেছে

করেছিল এবং বলেছিল যে, 'হানযালার বিনিময়ে হানযালাহ'। অর্থাৎ আমার পুত্র হানযালার প্রতিশোধে সাহাবী হানযালাহকে হত্যা করা হয়েছে।[201] সবচেয়ে বেদনাদায়ক ছিলো আরবের যুদ্ধরীতিকে সম্পূর্ণ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সেদিনের তার নির্লজ্জ উল্লাস প্রকাশের সে স্মৃতি। সেদিন উহুদ যুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে তার এবং মুসলিমদের মাঝে প্রত্যক্ষ কথোপকথন চলছিল। ইমাম বুখারী রহ. ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন যে, "উহুদের দিন যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর আবূ সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে উঠে বলল, কাওমের মধ্যে মুহাম্মাদ জীবিত আছে কি? একথা সে তিনবার বলল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার কোনো উত্তর দিও না। সে আবার বলল, কাওমের মধ্যে ইবন আবূ কুহাফা (আবূ বকর) বেঁচে আছে কি? একথাও সে তিনবার বলল। সে পুনরায় বলল, কওমের মধ্যে ইবনুল খাত্তাব কি জীবিত আছে? একথাও সে তিনবার বলল। তারপর সে তার সাথীদের দিকে ফিরে বলল, এরা সকলেই নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় জবাব দিত। এ সময় উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিজেকে সামলাতে না পেরে বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। যে জিনিসে তোমাকে লাঞ্ছিত করবে আল্লাহ তা বাকি রেখেছেন'। পরিশেষে আবূ সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদর যুদ্ধের বিনিময়ের দিন, যুদ্ধ কূপ থেকে পানি উঠানোর পাত্রের মতো (অর্থাৎ একবার এক হাতে আরেকবার অন্য হাতে)। (যুদ্ধের ময়দানে) তোমরা নাক-কান কাটা কিছু লাশ দেখতে পাবে। আমি এরূপ করতে আদেশ করি নি। অবশ্য আমি এতে অসন্তুষ্টও নই। অতঃপর সে চিৎকার করতে লাগল, 'হুবালের জয়, হুবালের জয়'। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

শাদ্দাদ ইবন আসওয়াদ ইবন শু'উব আল-লাইসী। অধিকতর জানতে:- ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতি'আব (১/৪৩২), ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (১/৬২১), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (১৮৫৮)।

201. তারীখুত-তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক (২/৬৮)।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা তার উত্তর দাও। তারা বললেন, আমরা কী বলব? তিনি বললেন, তোমরা বল 'আল্লাহ সমুন্নত ও মহান'। আবূ সুফিয়ান বলল 'আমাদের উযযা আছে, তোমাদের উযযা নেই'। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার জবাব দাও। তারা বললেন, আমরা কী জবাব দেব? তিনি বললেন, বল 'আল্লা হ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের তো কোনো অভিভাবক নেই'।[202]

এ কথোপকথনে আবু সুফিয়ান মুসলিম শহীদদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতি, নাক-কান কাটা হওয়া ও পেট বিদীর্ণ হওয়ার প্রতি তার আনন্দ ও মনোতুষ্টি প্রকাশ করেছে। অথচ আরবরা জাহেলী যুগে কিংবা ইসলাম পরবর্তী যুগে কোনো কালেই এটি পছন্দ করতো না। এ সব কিছু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করা এবং তাদের ওপর ধ্বংসলীলা চালানোর প্রতি তার মনস্কামনা ও আগ্রহাতিশেয্যরই বহিঃপ্রকাশ।

যায়েদ ইবন দাসানাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু[203]-এর হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়ে মু সলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে গাদ্দারী-নীতি অবলম্বনের স্পষ্ট স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে তার এ মানসিকতা আরো সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।[204] শুধু তাই নয়, আবু সুফিয়ানের এ মানসিকতার সর্ববৃহৎ

---

202. সহীহ বুখারী: (باب غزوة أحد،كتاب المغازي) হাদীস নং ৩৮১৭, আবু দাউদ: হাদীস নং ২৬৬২, নাসাঈ: হাদীস নং ৮৬৩৫

203. যায়েদ ইবন দাসানাহ ইবন বাইয়াযাহ আল-আনসারী আল-বাইয়াযী। বদর ও উহুদে অংশ নিয়েছেন। রজী' দিবসে খুবাইব ইবন 'আদী এর সাথে বন্দি হয়েছেন। মক্কায় সফওয়ান ইবন উমাইয়্যার নিকট বিক্রি করে দেওয়া হলে সে তাকে মেরে ফেলে। এটি ছিল চতুর্থ হিজরীতে। অধিকতর জানতে- ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতি'আব (২/১২২), ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (২১/১৪৭), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (২৯০০)

204. তারীখুত-তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক (২/৭৮)।

বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পঞ্চম হিজরীতে সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক মদীনা অবরোধের সময়। সে অবরোধের সময় দশ হাজার কাফির সৈন্যের নেতৃত্বে থাকা আবু সুফিয়ানসহ সকলে মিলে মদীনাকে সম্পূর্ণরূপে মুসলিম-শূন্য করে ফেলতে চেয়েছিল। শান্তি ও স্বস্তির শহর মদীনাকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করা এবং সেখানকার ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলকে ভীতি ও আতংকগ্রস্থ করে তোলার জন্য কাফিরদের সকল শাখা-উপশাখাকে সমবেত করা ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের এক ক্ষমার অযোগ্য মহা অপরাধ।

অষ্টম হিজরী পর্যন্ত আবু সুফিয়ান মক্কার অধিপতি ছিল। এর দু বছর পূর্বে হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়। সন্ধি-চুক্তিতে বনু বকর গোত্র মুশরিকদের এবং খযা'আহ গোত্র মুসলিমদের পক্ষ অবলম্বন করে। অতঃপর বনু বকর কর্তৃক প্রসিদ্ধ সেই চুক্তিভঙ্গের বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঘটে এবং খোয'আহ গোত্রের কয়েকজন লোক নিহত হয়। এ ক্ষেত্রে কুরাইশরা বনু বকরকে সহযোগিতা করেছিল।[205] ফলে হুদায়বিয়ার সন্ধি রহিত হয়ে যায় এবং এখান থেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হাজার সাহাবীদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা বিজয়ের অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঘটনা অনেক দীর্ঘ। বিস্তারিত বিবরণও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে যে, ইসলাম বিরোধী যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের ভূমিকা ছিল অন্যান্য শত্রুনেতাদের তুলনায় অনেক বেশি এবং মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার ক্ষেত্রে তার অবস্থান ছিল সকলের শীর্ষে।

প্রিয় পাঠক! এ সকল জটিল প্রেক্ষাপটগুলোকে মনের পর্দায় মেলে ধরুন! অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশের প্রাক্কালে গ্রেফতারকৃত আবু

---

205. তারীখুত-তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক (২/১৫৪)

সুফিয়ানকে হাতে পেয়ে তার সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীরূপ আচরণ করেছিলেন সেদিকে দৃষ্টিপাত করুন! এ বিষয়ে ইসলামের সুমহান দর্শন ও নবী চরিত্রের মাহাত্ম্য ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য আমরা পুরো ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ করছি-

যুগ পাল্টে গেছে। সময় বদলেছে অনেক। আবু সুফিয়ান তার জীবনের অত্যন্ত সংকীর্ণ অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। তার যাবতীয় কর্ম-তৎপরতা থেমে গেছে। সব ধরণের চিন্তা-ফিকির থেকেও সে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে। এটা ঐ সময়ের কথা যখন মক্কার মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে হঠাৎ করে মুসলিমদের বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং আবু সুফিয়ান ভালো করেই জানে যে, সে হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের প্রধান টার্গেট। ঐ সময় সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানতে মরিয়া হয়ে উঠলো এবং এক ধরণের ভীতি ও আতংক তাকে গ্রাস করে নিলো। ইতোমধ্যে সে তার এক পুরোনো দিনের বন্ধু -যিনি বর্তামানে মুসলিমদের দলভুক্ত- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সামনে পেয়ে গেল। তখন তার সাহায্য কামনা করে বলে উঠল, 'আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক, এখন উপায়?'

এরপরে মক্কার এ শত্রুনেতা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে যা ঘটেছিল চলুন তা আমরা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর ভাষায় পাঠ করি-

সে দিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবু সুফিয়ানকে বললেন,

«واللهِ لئن ظفر بك ليضربن عنقك ..!!»

"আল্লাহর শপথ! তোমাকে গ্রেফতার করতে পারলে তো অবশ্যই তোমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।"

এটি ছিলো আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। শুধু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই নন, ইসলামের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের অবস্থানের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত যে কোনো ব্যক্তিই আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে এ একই কথা বলবে। কিন্তু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবু সুফিয়ানের সাথে পূর্ব বন্ধুত্বের কারণে কিংবা কুরাইশদের প্রাণ রক্ষার প্রতি অত্যাধিক আগ্রহের কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবু সুফিয়ানের জন্য সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, 'তুমি আমার সাথে এ খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে চল। আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাব এবং তোমার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে নেব'। তাই আবু সুফিয়ান আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-র সাথে সওয়ার হলো। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, অতঃপর আমি তাকে নিয়ে রওয়ানা করলাম। যখনি মুসলিমদের কোনো আগুনের/মশালের/চুলার পাশ দিয়ে যেতাম তখনই তারা বলতো, 'কে এখানে?' পরে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চর এবং তাতে তাঁর চাচাকে দেখতে পেত তখন বলতো, 'এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চর এবং এতে রয়েছে তাঁরই চাচা। এক পর্যায়ে আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগুনের/মশালের/চুলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'কে এখানে?' এ কথা বলে আমার দিকে এগিয়ে এসে খচ্চরের পেছনে আবু সুফিয়ানকে দেখে চিনে ফেললেন এবং বলে উঠলেন, 'আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর দুশমন! সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি তোকে পাইয়ে দিয়েছেন'। এ কথা বলেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুর দিকে দৌড়ে ছুটলেন। আমিও

খচ্চরকে ছেড়ে দিলাম এবং ধীরগামী আরোহী ধীরগতির বাহনজন্তুকে যতটুকু পেছনে ফেলতে পারে ততটুকু খচ্চরকে পেছনে রেখে এগিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রবেশ করলাম। ইতিঃমধ্যে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুও প্রবেশ করেছেন এবং বলছেন, ‘এ হলো আল্লাহর দুশমন আবু সুফিয়ান, কোনো প্রকার শান্তি/সন্ধি চুক্তিকালীন সময়ের বাইরে আল্লাহ তাকে আমাদের হাতে এনে দিয়েছেন। সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই।’ তখন আমি (আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসলাম এবং তার মাথায় হাত রেখে বললাম, ‘আল্লাহর শপথ! আজ রাতে আমি ছাড়া তাঁর সাথে আর কেউ একান্ত আলাপ করতে পারবে না’। উমার যখন বারবার একই কথা বলছিলেন তখন আমি তাকে বললাম, চুপ কর, হে উমার! আল্লাহর শপথ! যদি এ লোকটি বনু আদী গোত্রের কেউ হতো তাহলে তুমি এরূপ বলতে না। কিন্তু এ লোকটি হচ্ছে বনু আবদে মানাফ গোত্রের’। এটা শুনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আপনি চুপ করুন, হে আব্বাস! আপনি এ ধরণের কথা বলবেন না। আল্লাহর শপথ! আপনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে আমার বাবা খাত্তাব যদি ইসলাম গ্রহণ করতেন তার ইসলাম গ্রহণের চেয়েও অধিক প্রিয় ছিল। আর এটা এ জন্য যে, আমি জানতাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার বাবা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক প্রিয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হে আব্বাস! তুমি তাকে তোমার তাবুতে নিয়ে যাও, সকালে আমার নিকট নিয়ে এসো’। অতঃপর আমি তাকে আমার তাবুতে নিয়ে গেলাম। সে আমার নিকট রাত্রি যাপন করল। পরদিন সকালে তাকে

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলে তিনি তাকে দেখেই বললেন,

«وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟»

"হে আবু সুফিয়ান! তোমার মঙ্গল হোক। তোমার কি এখনও এ সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আসে নি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই?"

আবু সুফিয়ান বলল, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আপনি কতই না সম্মানিত, কতই না ধৈর্যশীল আর কতই না উত্তম সম্পর্ক স্থাপনকারী! এখন তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, যদি আল্লাহর সাথে কোনো মা'বুদ শরীক থাকত তবে অবশ্যই আমার কোনো কাজে আসত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟»

"হে আবু সুফিয়ান! তোমার মঙ্গল হোক, এখনও কি তোমার সময় আসে নি যে, আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করবে?"

আবু সুফিয়ান বলল, 'আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আপনি কতই না সম্মানিত, কতই না ধৈর্যশীল আর কতই না আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী! এ ব্যাপারে এখনও মনে কিছুটা খটকা রয়েছে'। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, 'হে আবু সফিয়ান, তোমার নাশ হোক! তোমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার আগেই মুসলিম হয়ে যাও এবং সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল'।

এবার আবু সুফিয়ান কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলিম হয়ে গেলেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কিছুটা সম্মানপ্রিয় মানুষ। সুতরাং তাকে

বিশেষ একটা কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে, যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে সে নিরাপদ থাকবে, (এবং যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ থাকবে।[206]) অতঃপর আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মক্কাবাসীকে এ সংবাদ দেওয়ার জন্য চলে যেতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«يَا عَبّاسُ، احْبِسْهُ بِمَضِيقِ الْوَادِي عِنْدَ حطْمِ الخيل[207]، حَتّى تمُرّ بِهِ جُنُودُ اللّهِ»

"হে আব্বাস! তাকে বাহিনীর ভিড়ের নিকট (অথবা নাকের মতো পাহাড়ের সেই বাড়তি অংশের ওপর) দাঁড় করাও যে দিকে পাহাড়ি সরুপথ গিয়েছে, যাতে সে আল্লাহর বাহিনীগুলো অতিক্রম করার দৃশ্য অবলোকন করতে পারে।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে নিয়ে সেখানে দাড়ালেন। (আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন) প্রতিটি গোত্র নিজেদের বাহনজন্তুতে আরোহন করে অতিক্রম করছিল। যখনই কোনো গোত্র অতিক্রম করতো তখন তিনি বলতেন, এরা কারা? আমি বলতাম, বনু সালীম। তিনি বলতেন, বনু সালীমের সাথে আমার কী সম্পর্ক? অতঃপর অন্য গোত্র অতিক্রম করলে তিনি বলতেন, এরা কারা? আমি বলতাম, মুযাইনাহ। তিনি বলতেন, মুযাইনাহর সাথে আমার কী

206. এ কথাটি লেখকের মূল বইতে নেই; কিন্তু প্রায় সব বর্ণনায় রয়েছে বলে সংযুক্ত করে দেওয়া হলো- অনুবাদক।

207. حطم শব্দটি ازدحام অর্থে। حطم الخيل অর্থ হচ্ছে, অশ্বারোহী বাহিনীর ভিড়। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে- خَطْم الجَبَل । خَطْم শব্দটি أنف অর্থে। خَطْم الجَبَل এর অর্থ হচ্ছে, নাকের মতো পাহাড়ের বাড়তি অংশ।

সম্পর্ক? তিনি এভাবেই বলছিলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনী অতিক্রম করল যা বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রের দরুন কালো বর্ণ দেখাতে লাগল। সেখানে আনসার এবং মুহাজিররা ছিলেন। লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণের দরুন চক্ষু ছাড়া তাদের আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, এরা কারা? আমি বললাম, মুহাজির ও আনসারদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, 'কার ক্ষমতা আছে এদের মুকাবিলা করে? আল্লাহর শপথ! তোমার ভাতিজার রাজত্ব আজ অনেক বড় আকার ধারণ করেছে।' আমি বললাম, হে আবু সুফিয়ান! এটি হলো নবুওয়াত। তিনি বললেন, তা ঠিক। আমি বললাম, 'এবার দ্রুত আপনার কওমের নিকট যান'। এরপর তিনি চলে গেলেন এবং মক্কায় প্রবেশ করে ঘোষণা করতে লাগলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে গেছেন। তোমরা তাঁর মুকাবিলা করতে পারবে না। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহ এ ঘোষণা শোনে এগিয়ে এলো এবং তার দাঁড়ি ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল,

اقْتُلُوا الدَّسَمَ الأَحْمَسَ[208]، فَبِئْسَ طَلِيعَةَ قَوْمٍ!

"তোমরা এ কুশ্রী ইতরকে হত্যা করে দাও। হায়! কতই না খারাপ লক্ষণ!"

আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, 'তোমাদের নাশ হোক! এ মহিলা যেন তোমাদেরকে জীবন রক্ষা করা থেকে ধোকায় না ফেলে। যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ'। লোকেরা বলল, 'তোমার নাশ হোক, তোমার ঘরে আমাদের কী হবে?' তিনি বললেন, 'যে নিজ ঘরের

---

208. دسم শব্দের অর্থ হচ্ছে, ময়লাযুক্ত। এখানে أسود তথা কুশ্রী অর্থে ব্যবহৃত। আর أحْمَس শব্দের অর্থ হচ্ছে, সাহসী ও উত্তেজিত। এখানে دني তথা ইতর অর্থে ব্যবহৃত। সূত্র: আল-মু'জামুল ওয়াফী (৪৬৯ ও ৪৬-৪৭)।

দরজা বন্ধ করে দেবে সেও নিরাপদ এবং যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ'। এটা শুনে লোকেরা নিজেদের ঘর ও মসজিদের দিকে বিভক্ত হয়ে ছুটতে লাগল।[209]

এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য উদারতা ও মানবতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমনিভাবে এ ঘটনার মাঝে তাঁর একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়া এবং দাওয়াতের প্রতি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষারও অতুলনীয় নযীর স্থাপিত হয়েছে।

যেখানে নেতৃস্থানীয় সকলের মতে তরবারী-ই আবু সুফিয়ানের একমাত্র সমাধান সেখানে তিনি তার সাথে আন্তরিকতা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিতে দলীল-প্রমাণের বিশ্লেষণমূলক সংলাপ চালিয়ে গেলেন। আবার তাওহীদের প্রশ্নে আবু সুফিয়ানের উত্তরও যথেষ্ট এবং সন্তোষজনক ছিলো না। তবে এটা ঠিক যে, সে তাওহীদকে একেবারেই অস্বীকারও করে নি; কিন্তু রেসালাতের প্রশ্নে সে স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে, তার মনে এখনো খটকা বা সন্দেহ রয়েছে। এরপর যখন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে ভয় দেখালেন যে, তোমার হত্যা অত্যাসন্ন, ইসলাম ছাড়া তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল।

এখানে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু দীন ইসলামে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে বল প্রয়োগ করেন নি; বরং এতে তিনি শুধু আবু সুফিয়ানের প্রতিই নয় গোটা কুরাইশ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। কেননা ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে আবু সুফিয়ানের হত্যাকে কেউই খারাপ দৃষ্টিতে দেখতো না এবং আগে ও পরের পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রনায়কই এ ব্যাপারে সমালোচনা করার

209. তাবারী, সহীহ বুখারী (باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية ،كتاب المغازي يوم الفتح) উরওয়াহ এর মুরসাল সমূহের মধ্যে (৪০৩০), আল-মাতালিবুল আলিয়া (৪৩৬২), দালাইলুল বায়হাকী (৫/৩৩-৩৫), সীরাতে ইবন হিশাম (২/৩৯৯-৪০৫)

মতো কিছু পেত না; বরং বর্তমান পৃথিবীর রাজনীতিতে এ ধরণের ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া তো রীতিমত যুদ্ধাপরাধের আওতায় পড়ে। কারণ, এ আবু সুফিয়ানই মাত্র দু'বছর পূর্বে (পরীখার যুদ্ধে[210]) মদীনাবাসীকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল এবং এ ব্যক্তিই কয়েকদিন আগে মুসলিমদের সাথে কৃত সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করেছিল যাতে (খোয'আহ গোত্রের[211]) অনেক নারী-পুরুষকে জীবন দিতে হয়েছিল।

ব্যাপারটি তো এমনও হতে পারতো যে, আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণকে আন্তিরকতা থেকে নয়, শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য হয়েছে বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্দেহ করতে পারতেন এবং তা মেনে না নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষনণ না করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তা মেনে নিলেন এবং তার দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার নিরিক্ষণও করলেন না; বরং মূহুর্তের মধ্যেই তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এক সেকেন্ডেই তিনি আবু সুফিয়ানের সকল কষ্টদায়ক স্মৃতি এবং এমন সকল যন্ত্রনাদায়ক ক্ষত ও আঘাতের কথা ভুলে গেলেন যার ঘা এখনো শুকায়নি। তাঁর অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা কিছুই স্থান পায় নি। ইবলিস-শয়তানের সকল কারসাযি-ই এখানে চরম ব্যর্থ।

এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তাতেই ক্ষমা ও উদারতার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু, ঘটনা এখানেই শেষ নয়; এর পরে যা ঘটেছে তা পৃথিবীর সকল উত্তম আদর্শ ও মহৎ চরিত্রের সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এর ব্যাখ্যা শুধু একটাই যে, তিনি ছিলেন একজন মহান নবী...।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে এমন একটি

---

210. অনুবাদক।

211. অনুবাদক।

জিনিস দিলেন যা অনন্তকাল তার সম্মান ও মর্যাদার বাহক হয়ে থাকবে। তিনি শুধু আবু সুফিয়ানকেই নিরাপত্তা দিলেন না; বরং ঐ সকল ব্যক্তিদেরকেও নিরাপত্তা দিলেন যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে। ঘোষণা করলেন,

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن

"যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে।"

কতোই না ভাগ্য! কতইনা সম্মান ও মর্যাদা আবু সুফিয়ানের...!!

আমরা এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্যের সীমা ও পরিধি অনুমান করতে পারবো না যতক্ষণ না আমরা নিজেদেরকে এ ধরণের প্রেক্ষাপটে কল্পনা করতে পারবো।

সত্য ও বাস্তবকে সকলেরই স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ। বিশ্ববাসীর নিকট আমরা বাস্তব-সত্যের স্বীকৃতি চাই এবং প্রশ্ন রাখতে চাই যে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো নিকট কি এমন আচরণ আশা করা যেতে পারে? এরপরেও কি কেউ এ দাবী করতে পারে যে, মুসলিমরা অন্যেদেরকে স্বীকার করে না এবং অন্যদের সাথে সদাচরণ করে না? এখনো কি এমন কেউ আছেন যারা বলবেন যে, ইসলাম হচ্ছে সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের ধর্ম?

আমাদের অভাব শুধু জ্ঞানালোকের। নবী চরিত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা অতি সামান্য, শুধুমাত্র উপরের খোসা পর্যন্ত। আমরা যদি এর গভীরে প্রবেশ করতে পারি এবং জগতবাসীর সামনে তা তুলে ধরতে পারি তাহলে জ্ঞানদরিদ্র বিশাল জনগোষ্ঠির চোখের সামনের পর্দা সরে যাবে। তারা সত্যালোককে চিনতে ও গ্রহণ করতে পারবে।

আবু সুফিয়ানের সাথে যা ঘটেছে তা নবীচরিত্রের কোনো কাকতালীয় ঘটনা

নয়; বরং একই ধরণের আচরণ আমরা দেখতে পাই ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচনাকারী ও ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের অনেক সংগঠক নেতার সাথেও। ইকরামা ইবন আবু জাহালের সাথে তার এমনই আচরণ ছিল যা কখনো ভুলার মতো নয়।

দুই. ইকরামা ইবন আবু জাহালের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

ইকরামা ছিল নবী জীবনের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে উগ্র। সে এ দীর্ঘ সময়ের বৃহৎ অংশকাল যাবৎ তার পিতা -এ যুগের ফির'আউন, ইসলামের সবচেয়ে বড় ঝগড়াটে শত্রু -আবু জাহলের নিকট থেকে ইসলাম বিরোধিতা ও শত্রুতার শরাব পান করেছে। শুধু তাই নয়, তার উগ্রতা ও বিরোধিতা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন সে সাধারণ ক্ষমা প্রাপ্তদের তালিকায় ছিল না। ইকরামা ছিল খালিদ ইবন ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বিরুদ্ধে খানদামার[212] যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কয়েকজনের অন্যতম। কিন্তু, পরাস্ত হওয়ার পর পালিয়ে মক্কা ছেড়ে ইয়ামেন চলে যেতে চাইল এবং সে জন্য নৌকা বা সামুদ্রিক জাহাজ জাতীয় কোনো বাহন খুঁজতে লাগল।[213]

কুফুরীতে তার পথ-চলা ছিল অনেক দূরের এবং তার অবস্থান ছিল অতি কট্টর। এজন্য মক্কা বিজয়ের পর সে ছিল হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের টার্গেটকৃতদের অন্যতম। তাকে

---

212. খানদামা মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান। ইবনুল আসীর বলেছেন, খানদামা হচ্ছে মক্কার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়ের নাম। ইবন বারীয় বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন সেখানে একটি সংঘর্ষ ঘটেছিল। অধিকতর জানতে- ফিরোযাবাদী: আল-কামুসুল মুহীত (১৪২৭), ইবনুল আসীর: আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল আসার (২/১৬১)।

213. তারীখুত-তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক (২/১৬০)

যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে।

তার স্ত্রী -উম্মে হাকীম বিনত হারিস ইবন হিশাম[214] -স্বামীকে বাঁচাতে চাইল। তাই সে ইকরামার নিরাপত্তা ও তাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার সুপারিশ করার জন্য আগে নিজে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইকরামা আপনার ভয়ে মক্কা ছেড়ে ইয়ামানের দিকে পালিয়ে গেছে। আপনি তাকে নিরাপত্তা দান করুন'। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজে এবং স্বাভাবিকভাবেই বলে দিলেন, فهو آمن "সে নিরাপদ।"[215]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকরামার স্ত্রীকে এটা বলেন নি যে, সে তো আবশ্যিক হত্যার তালিকাভুক্ত। তার পিছনের দীর্ঘ ইতিহাসও তুলে ধরেন নি। এটাও বলেন নি যে, 'তুমি নিজেই নব মুসলিমা, তুমি কীভাবে অন্যের জন্য সুপারিশ করতে পার?' এগুলোর কিছুই বলেন নি এবং ইকরামা কিংবা তার স্ত্রীর ওপর কোনো শর্তারোপও করেন নি। শুধু বললেন, فهو آمن "সে নিরাপদ"।

এরপর স্ত্রী উম্মে হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বামী ইকরামাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। অনেক খোজাখোজি ও দীর্ঘ সফরের পর তাকে পেলেন -সে লোহিত সাগরের কিনারায় ইয়ামেনগামী একটি জাহাজে আরোহণের চেষ্টায় রত আছে। উম্মে হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আমার চাচাতো

---

214. উম্মে হাকীম বিনত হারিস ইবন হিশাম, ইকরামার চাচাতো ভাই। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা ও নিরাপত্তা চেয়ে নিয়ে তাকে খুঁজে বের করলেন এবং ইকরামাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর উভয়ে পূর্বের বিয়েতেই বহাল থাকলেন। অধিকতর জানতে- ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (২/৩২৯), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (১১৯৭৩)।

215. মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী-এর সূত্রে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক রহ. (৬০১)।

ভাই! আমি এখন সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সদাচারী ও সবচেয়ে বেশি আত্মিয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি। তুমি নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে তোমার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে এনেছি।

উত্তরে ইকরামা বললো, তুমি করতে পেরেছো এটা?

স্ত্রী: হ্যাঁ।[216]

ইকরামা সে সময় চোখে শর্ষে ফুল দেখছিল। সে ইয়ামান যেতে চাচ্ছে অথচ ইয়ামানও তখন ইসলামের আলোয় আলোকিত। পৃথিবীর চতুর্দিকেই মানুষ দলে দলে ইসলামের সু-শীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে কিংবা বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে শুরু করছে। গোটা পৃথিবী তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তাই সে দীর্ঘ চিন্তা-ফিকির বাদ দিয়ে তৎক্ষনাত স্ত্রীর সাথে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিল।

ইকরামা মক্কায় ফিরে আসছে। সে এখনো মক্কায় প্রবেশ করে নি এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বলছেন,

«يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي، ولا يبلغ الميت».

“ইকরামা কুফুরী ছেড়ে ইসলাম গ্রহণের জন্য তোমাদের নিকট আসছে তোমরা তার বাবাকে গালি দিও না, কেননা মৃতদের গালি দেওয়া জীবিতদেরকে কষ্ট দেয় এবং তা মৃতদের পর্যন্ত পৌঁছে না।”[217]

আল্লাহু আকবার! এ কেমন চরিত্র মাধুর্য্য?

---

216. মুসতাদরাকে হাকিম (৩/২৯৬)।

217. মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী এর সূত্রে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক রহ. (৬০১), মুসতাদরাকে হাকিম (৩/২৬৯), ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

আবু জাহল ছিলো এ উম্মতের ফির'আউন। তথাপি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলে ইকরামার সামনে তাকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। যেন ইকরামার অনুভুতিতে আঘাত না লাগে। অথচ ইকরামা এখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নি।

ইকরামা মক্কায় প্রবেশ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দূর থেকে দেখলেন। দেখে কী করলেন? আবু জাহলের কথা মনে করলেন? যে সব যুদ্ধে ইকরামা ইসলামের বিরুদ্ধে নিজের সৌর্য-বির্য প্রদর্শন করেছিল সে সকল যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করলেন। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে খানদামায় ইকরামা যে মুসলিমদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল তার কথা ভাবছিলেন নাকি ইকরামার বর্তমান দুরাবস্থার কথা ভেবে তাকে ইসলামের শক্তি ও ক্ষমতা দেখিয়ে ছাড়ার মনস্থ করলেন?

না, পৃথিবীর অন্য সাধারণ রাজনীতিকদের মতো এ ধরণের কোনো কিছুই তিনি করলেন না; বরং তিনি খুশিতে লাফিয়ে উঠলেন যে, তার শরীরে চাদরও ছিল না।[218] ইকরামা ইবন আবু জাহল ফিরে আসছে এ জন্য তাঁর অবয়বে খুশীর বদনদীপ্তি ফুটে উঠেছে। অথচ সে এখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নি। এটি কোনো কৃত্তিমতা নয় বরং এটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবজাত প্রকৃতি।

ইকরামা এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসে বলল, 'হে মুহাম্মদ! এ (নিজ স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে) আমাকে বলেছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই বললেন, 'হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে, তুমি নিরাপদ'। ইকরামা বলল, এখন আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

218. মুসতাদরাকে হাকিম (৩/২৬৯)।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে আহ্বান করছি যে, তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, এবং আমি আল্লাহর রাসূল। সালাত আদায় করবে। যাকাত দেবে। এভাবে ইসলামের বিধি-বিধান ও যাবতীয় উত্তম গুণাবলীর কথা উল্লেখ করলেন। ইকরামা বলল, আপিন আমাকে সত্য, সুন্দর ও ভালোর দিকেই আহ্বান করেছেন।

মানুষের অন্তর তো দয়াময় আল্লাহর কুদরতি আঙ্গুলের মাঝে, তিনি যার অন্তরকে যখন যেদিকে ইচ্ছা ফিরিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতক্ষণ যা বললেন এসব কথা হিজরতের পূর্বে মক্কী জীবনেও সত্য ছিল, হিজরত পরবর্তী মাদানী জীবনেও সত্য ছিল এবং মক্কা বিজয়ের পর এতদিনও সত্যই ছিল এবং অহী ও নবুওয়াতেরই অংশ ছিল; কিন্তু এতদিন পরে ইকরামা ইবন আবু জাহলের বুঝে আসছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সত্য, সুন্দর ও ভালোর দিকেই আহ্বান করছেন এবং এ পর্যায়ে এসে ইকরামা বলছেন যে, আল্লাহর শপথ! আপনি আমাকে যে দিকে আহ্বান করছেন সব সময় আপনি সে দিকেই আহ্বান করতেন আর আপনি আমাদের মধ্যে আচরণে সবচেয়ে সদাচারী, কথায় সবচেয়ে সত্যবাদী, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

মুহুর্তের ব্যবধানেই কাফির সৈন্য ইকরামা ইসলামের সৈনিকে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এরপরে ইকরামা রাদিযাল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উত্তম জিনিস শিক্ষা দিন’। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তুমি বল যে,

«أشهد أن لا إلاه إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله»

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।”

ইকরামা রাদিযাল্লাহু ‘আনহু বললেন, এরপর কী? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল যে, আমি আল্লাহকে স্বাক্ষী রেখে এবং উপস্থিত সকলকে স্বাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি মুসলিম, মুহাজির ও মুজাহিদ। ইকরামা রাদিযাল্লাহু ‘আনহু হুবহু সে কথাগুলোই বললেন। অতঃপর এ নও মুসলিম ইকরামাকে ইসলামের সাথে আরো আন্তিরকভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আজকে তুমি আমার নিকট যা চাইবে কাউকে না দিলেও আমি তোমাকে দেব’। ইকরামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কোনো ধন-সম্পদ, মান-সম্মান কিংবা নেতৃত্ব কিছুই চাইলেন না; বরং তিনি চাইলেন ক্ষমা। তিনি বললেন, ‘আমি আপনার নিকট চাই যে, আপনি আমার সকল শত্রুতা, সকল পদক্ষেপ, সামনা-সামনি সকল মুকাবিলা এবং আপনার সামনে বা পেছনে যত কটুক্তি করেছি সব কিছুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন’। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আল্লাহ! সে আমার বিরুদ্ধে যত শত্রুতা করেছে এবং আপনার দীনের বাতি নিভিয়ে দেওয়ার জন্য যত স্থানে যত সফর করেছে সেগুলোর জন্য আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং সে আমার সামনে বা পেছনে আমার যত সম্মানহানী করেছে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।” এটা শুনে ইকরামা রাদিযাল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘আমি সন্তুষ্ট, হে আল্লাহর রাসূল!’ এবং তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরো বললেন, ‘এতদিন আমি আল্লাহর পথের বিরুদ্ধে যত সম্পদ ব্যয় করেছি, এখন থেকে আল্লাহর পথে তার দ্বিগুণ ব্যয় করবো, এতদিন আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরানোর জন্য যত লড়াই করেছি, এখন থেকে আল্লাহর পথে এর দ্বিগুণ নিজেকে

বিলিয়ে দিবো'।[219] বাস্তবেও তিনি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য নিজের পরবর্তী পুরা জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। কখনো ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযানে আবার কখনো শামের কোনো না কোনো বিজয়াভিযানে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাকে গ্রহণ করা, নিরাপত্তা দেওয়া ও অতীতের সব কালো অধ্যায়কে ক্ষমা করে দেওয়ার মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহ তা'আলা তার জীবনকে পরিপূর্ণ পাল্টে দিলেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন,

«لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم»

"তোমার দ্বারা একজন ব্যক্তির হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া তোমার জন্য অনেকগুলো লাল উটের চেয়েও উত্তম।"[220] অন্য বর্ণনায় আছে, যার উপর সূর্য উদিত হয় (অর্থাৎ গোটা পৃথিবী) তার চেয়েও উত্তম।[221]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান ও ইকরামার সাথে যেমন আচরণ করেছেন এরা দুজন ছাড়া অন্য অনেকের সাথেও একই আচরণ করেছেন। সফওয়ান ইবন উমাইয়ার সাথে তাঁর আচরণ ছিল সবদিক থেকেই ইতিহাসের অপূর্ব ও চমৎকার ঘটনা।

তিন. সফওয়ান ইবন উমাইয়ার সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

219. মুসতাদরাকে হাকিম (৩/২৭০)।

220. সহীহ বুখারী: (باب مناقب علي بن أبي طالب،كتاب المناقب) সাহাল ইবন সা'দ-এর সূত্রে, হাদীস নং ৩৪৯৮; সহীহ মুসলিম: (باب فضائل علي بن ،كتاب فضائل الصحابة أبي طالب) হাদীস নং ২৪০৬।

221. মুসতাদরাকে হাকিম: আবু রাফে' সূত্রে (৬৫৩৭), তাবরানী: আল-মু'জামুল কাবীর (৯৩০)।

ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

উত্তরসূরী হিসাবে সাফওয়ান ইবন উমাইয়াও ইকরামার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। তার পিতাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোরতর শত্রু ছিল। বদর যুদ্ধে সে নিহত হয়েছিল। সাফওয়ান এ ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নিজের সর্ব শক্তি ব্যয় করতে নেমে পড়েছে। উহুদ যুদ্ধে পেছন থেকে আক্রমনকারীদের মধ্যে খালেদ ইবন ওয়ালীদের সাথে এ সাফওয়ানও ছিলো। সত্তরজন সাহাবী হত্যায় এরই ভুমিকা ছিল অন্যতম। আহযাবের যুদ্ধেও সে অংশ নিয়েছিলো। মক্কার অভ্যন্তরে রণ-প্রস্তুতিতে লিপ্তদের তালিকায়ও ছিলো সে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হত্যা চেষ্টায় সে এক স্বতন্ত্র পরিকল্পনা এঁকেছিলো। তারই চাচাতো ভাই উমায়ের ইবন ওয়াহাব তখনো ইসলাম গ্রহণ করে নি। সে তার সাথে চুক্তি করেছিলো যে, উমায়ের যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে পারে তাহলে সে উমায়েরের পরিবারের যাবতীয় ভরণ-পোষণ ও তার সকল ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেবে। তবে পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়। উমায়ের ইবন ওয়াহাব[222] মদীনায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাফওয়ান ও তার মাঝে সংঘটিত চুক্তির সব কথা অগ্রীম বলে দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়ে যান।

---

222. উমায়ের ইবন ওয়াহাব আল-জামহী আল-ক্বারশী। বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষাবলম্বী হয়ে অংশগ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলো। তবে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অধিকতর জানতে- ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতি 'আব (৩/২৯৪), ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (৩/৭৯৭), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (৬০৫৮)

দিন অনেক কেটে গেল। মক্কা বিজয় হয়ে গেল। সফওয়ান পালানোর পথ খুঁজতে লাগল। মক্কায় পালাবার কোনো স্থান খুঁজে পেল না। তার জানা হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপের কোথাও কেউ তাকে ঠাঁই দেবে না। ততক্ষণে ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাই সে স্থীর করলো, সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে। এ লক্ষ্যে সে ইয়াসার[223] নামীয় তার এক গোলামকে সাথে নিয়ে লোহিত সাগরের দিকে রওয়ানা করলো। গোলাম ছাড়া তার সাথে আর কেউই ছিল না। ঐ সময় সে ছিল মানসিক বিপর্যয়ের চুড়ান্ত পর্যায়ে। হঠাৎ সে পেছনে অনেক দূরে একজন ব্যক্তিকে তাদের অনুসরণ করতে দেখল এবং ইয়াসারকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমার নাশ হোক, পেছনে দেখ কাকে দেখা যায়?!' গোলাম ইয়াসার বলল, এ হচ্ছে উমায়ের ইবন ওয়াহাব। সফওয়ান বলল, উমায়ের ইবন ওয়াহাবকে দিয়ে আমার কী হবে...?! আল্লাহর শপথ! সে আমাকে হত্যা করার জন্যই আসছে। সে মুহাম্মাদের দলভুক্ত হয়ে গেছে। আর মুহাম্মাদ এখন আমার উপর বিজয়ী। ইতোমধ্যে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিকটে এসে গেছেন। সাফওয়ান তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'উমায়ের! তুমি আমার সাথে অনেক করেছ। তোমার ঋণ ও পরিবারের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছ। আর এখন আমাকে হত্যা করতে এসেছ'। উমায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, 'হে আবুল ওয়াহাব! আমার জীবন তোমার জন্য কুরবান হোক, আমি এখন সবচেয়ে সদাচারী ও সবচেয়ে অধিক সু-সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি।

উমায়ের ইবন ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন জানতে পারলেন যে, তার

223. আবু ফুকাইহা ইয়াসার। সফওয়ান ইবন উমাইয়ার গোলাম ছিল। ইবন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিসে বসতেন তখন তার নিকটে নীপিড়ীত সাহাবীরা তথা খাব্বাব, আম্মার ও আবু ফুকাইহা ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহুম-গণ বসতেন। অধিকতর জানতে- ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (৫/২৪৯), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (১০৩৮৪)।

পুরোনো দিনের বন্ধু চাচাতো ভাই সাফওয়ান মক্কা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তখন তার দয়া হলো। তিনি দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোত্রপতি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার জন্য পালিয়ে গেছে। সে আশংকা করছে যে, আপনি তাকে নিরাপত্তা দেবেন না। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি তাকে নিরাপত্তা দিলাম'। এমনই তাঁর আচরণ ছিল সাফওয়ানের সাথে যেমন ছিল ইকরামার সাথে। এগুলো কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়; বরং এটিই হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাইফ স্টাইল।

উমায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সাফওয়ানকে বললেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। সাফওয়ানের মনে ভয় ঢুকে গেল। সে বলল, আল্লাহর শপথ! তুমি তোমার কথার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ না আনলে আমি তোমার সাথে যাবো না। উমায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তৎক্ষনাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের দিকে ছুটলেন। লোহিত সাগরের পাড় থেকে মক্কা প্রায় আট কিলোমিটারের পথ তিনি সর্ব শক্তি ব্যয় করে দৌড়ে পাড়ি দিলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার জন্য পালিয়ে যাওয়া সফওয়ানের নিকট থেকে এসেছি। আমি তাকে আপনার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের সংবাদ দিয়েছি; কিন্তু সে কোনো প্রমাণ ছাড়া আমার সাথে আসবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার এ পাগড়ি নিয়ে যাও তার কাছে!' উমায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সফওয়ানের কাছে ফিরে এসে পাগড়ি দেখিয়ে তাকে বললেন, হে আবুল ওয়াহাব! আমি এমন ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সদাচারী, সবচেয়ে ধৈর্যশীল ও

সবচেয়ে সু-সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তি। যার গৌরব তোমারই গৌরব। যার সম্মান তোমারই সম্মান। যার রাজত্ব তোমারই রাজত্ব। সে তোমারই আপন (বংশীয়)[224] ভাই। আত্মহত্যা করার ব্যাপারে আমি তোমাকে আল্লাহর কথা স্ম রণ করিয়ে দিচ্ছি। সফওয়ান অত্যন্ত দুর্বল স্বরে বলল, আমার আশংকা হচ্ছে আমাকে হত্যা করে ফেলা হবে। উমায়ের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, না। তিনি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছেন। তুমি গ্রহণ করলে তো ভালো। অন্যথায় তিনি তোমাকে নিরাপত্তার সাথে দুই মাস অবকাশ দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতা দেখুন! সফওয়ান যদি ইসলাম গ্রহণে রাজি হয় তাহলে তো সে মুসলিমদের মতো সব সুযোগ-সুবিধাই ভোগ করবে। আর যদি সে এখনো ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি জানায় তাহলে সে পূর্ণ দুই মাস চিন্তা-ভাবনার জন্য অবকাশ পাবে এবং এ দুই মাস সে মুসলিমদের মতোই পরিপূর্ণ নিরাপত্তা পাবে!

সাফওয়ান উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ফিরে এলো। মসজিদে হারাম প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করছিলেন। তারা সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

সাফওয়ান জানতে চাইল: উমায়ের, দিনে রাতে তোমরা কয়বার সালাত আদায় কর?

উমায়ের রাদিয়ল্লাহু আনহু: পাঁচ বার।

সাফওয়ান: সব সালাতেই কি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমামতি করেন?

224. অনুবাদক।

উমায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু: হ্যাঁ।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরিয়ে সালাত থেকে অবসর হলেন তখন সফওয়ান তাঁকে সম্বোধন করে দূর থেকেই চিল্লিয়ে উঠল, হে মুহাম্মাদ! উমায়ের আমাকে আপনার পাগড়ি দেখিয়ে বলেছে, আপনি নাকি আমাকে আসতে বলেছেন এবং আপনার দাওয়াতে সাড়া না দিলে দুই মাস অবকাশ দিয়েছেন?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজ সরলভাবে বললেন, এসো হে আবু ওয়াহাব! (দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয়ের সাথে তাকে তার উপনাম দ্বারা ডাকছেন।)

সাফওয়ান ভয়ে ভয়ে বলল, না। আল্লাহর শপথ! আপনি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তোমাকে চার মাস অবকাশ দিলাম।

বাস্তবেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিন্তা-ভাবনার জন্য চার মাস অবকাশ দিয়ে দিলেন![225]

কিছুদিন পর হুনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হলে মুসলিমদের কিছু লৌহবর্ম ও যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। সফওয়ান ছিল মক্কার প্রসিদ্ধ অস্ত্র ব্যবসায়ী। সে সময় সাফওয়ান ইবন উমাইয়া ছাড়া গোটা মক্কাবাসী সবাই মুসলিম। এতো কিছুর পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুর্বলতা ও দুরাবস্থার সুযোগ নিলেন না; বরং তিনি তার নিকট থেকে কিছু অস্ত্র ভাড়া নিলেন।

---

[225]. পুর্ণ ঘটনাটি ইয়াহইয়া লাইসীর বর্ণনায় মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক রহ. গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে (১১৩৩), মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: যুহরী থেকে (১২৬৪৬)

যুদ্ধের দিন মুসলিমদের সাথে সফওয়ানও তার ভাড়া দেওয়া যুদ্ধাস্ত্রের দেখা-শুনার জন্য বেরিয়েছে। হুনাইন যুদ্ধে প্রথমে মুসলিমদের মনোবল ভেঙ্গে গেলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে অসাধারণ ঐশ্বরিক সাহায্য এসেছিল এবং মুসলিমরা এতো বেশি গনীমতের সম্পদ অর্জন করেছে যা আরবের লোকেরা কখনো চোখেও দেখে নি। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে ইতিহাসের কোনো সেনাপ্রধানই যা করেন নি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। তিনি সকল সম্পদ মুজাহিদদের মাঝে বেশি বেশি করে ভাগ করে দিয়ে দিলেন। নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না। অনেক নও মুসলিমদেরকে মন গলানোর জন্য শত শত উট, বকরী দিয়ে দিলেন, যা তাদের বিবেককেও হয়রান করে দিয়েছে।[226] এমনকি অনেক নেতৃস্থানীয় নও মুসলিমরাও সেদিন লজ্জা-শরম সব ভুলে গিয়ে বারবার চাইলেন, বারবার হাত পাতলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেদিন কারো আবেদনকেই ফিরিয়ে দেন নি, কোনো প্রার্থীকেই বঞ্চিত করেন নি।

সাফওয়ান দূরে দাঁড়িয়ে গনীমতের সম্পদ বণ্টন দেখছে আর আফসোস করছে। সে তো এখনো অমুসলিম, সে তো যুদ্ধাস্ত্রের ভাড়া ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কিন্তু এরপরের মুহূর্তে যা ঘটেলো তা সফওয়ান স্বপ্নেও ভাবে নি। উপস্থিতদের মধ্যেও কেউ কল্পনা করতে পারে নি। কিয়ামত পর্যন্ত যারাই

226. মক্কার কিছু নেতৃস্থানীয় নও মুসলিম। ইমানের দুর্বালতা হেতু তাদের পূর্বা জাতিয়তাবোধ যেন তাদেরকে কাফিরদের পক্ষাবলম্বনের দিকে নিয়ে না যায় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া ও তাদের মন গলানোর মতো আচরণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন। আবার যেন এতে তারা নিজেদের অধীনস্তদেরকেও ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এদের মধ্যে ছিলেন, আকরা' ইবন হাবিস আত-তামীমী, আব্বাস ইবন মিরদাস আস-সুলামী, উয়াইনাহ ইবন হিসন আল-ফাযারী ও আবু সুফিয়ান ইবন হারব। সূত্র: আল্লামা ইবন মনযূর: লিসানুল আরব (৯/৯)।

শুনবে অবাক হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ানকে ডাকলেন। মক্কার অনেক নেতৃস্থানীয় নও মুসলিমদের মতো সাফওয়ানকেও এক শত উট দিয়ে দিলেন! দানশীলতা ও বদান্যতায় বিশ্ব-রেকর্ড করা ব্যক্তি হলেও কোনো মানব সন্তান দ্বারা কি এ ধরণের আচরণ সম্ভব?

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে, সাফওয়ান হুনাইনের উপাত্যকাগুলোর দিকে স্থীর তাকিয়ে রয়েছে যেগুলো উট ও বকরীতে ভর্তি হয়ে আছে। সম্পদের প্রাচুর্য দেখে তার মধ্যে হতভম্ব ও আশ্চার্যান্বিত হওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নম্র ও শান্ত স্বরে বললেন, হে আবু ওয়াহাব! তোমার কি এটি (উট ও বকরীতে ভর্তি একটি উপাত্যকার দিকে ইঙ্গিত করে) খুব পছন্দ হয়? সাফওয়ান অতি স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, হ্যাঁ। আর স্বীকার করতেই হবে সে দৃশ্য ছিল বাস্তবেই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অবাক করে দিয়ে একেবারে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, ‘এ উপাত্যকা এবং এর মাঝে যত সম্পদ আছে সব তোমার’![227]

বিস্ময় তাকে হতবুদ্ধি করে ফেলল। আজ তার চোখের সামনে সে বাস্তব-সত্য উদ্ভাসিত হয়ে গেছে এতদিন যা সে বুঝতে পারে নি। সে আর কিছুই ভাবতে পারলো না। অকপটেই, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সে বলে উঠল, ‘নবী স্বত্তা ছাড়া এমন আচরণ আর কেউ করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।’

---

227. ইবনু সাইয়্যিদিন নাস: উয়ূনুল আসার (২/২৫৩-৪৩৪)।

সাফওয়ান ইবন উমাইয়া সেখানেই মুসলিম হয়ে গেলেন। এরপর সফওয়ান ইবন উমাইয়া রাদিয়ল্লাহু 'আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দিয়েছেন। অনেক অনেক দিয়েছেন। তিনি ছিলেন আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত। আর (নিরাপত্তা, অবকাশ ও অগণিত সম্পদ)[228] দিতে দিতে এখন তিনি হলেন আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব।[229]

কতইনা সৌভাগ্য সফওয়ানের...!

কতইনা সৌভাগ্য বনু জুমাহ গোত্রের যাদের অধিপতি মুসলিম হয়ে গেছেন...!

কতইনা সৌভাগ্য মক্কাবাসীর...!

কতইনা সৌভাগ্য মুসলিমদের, যাদের দলে মক্কার প্রসিদ্ধ নেতা সফওয়ান ইবন উমাইয়া যোগদান করে আল্লাহর পথের খাঁটি মুজাহিদ হয়ে গেছেন...! আর এসব কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে উট-বকরীতে পূর্ণ একটি উপত্যকার বিনিময়ে।

এ উট ও বকরীগুলোর মূল্য কতই আর হবে?

এগুলো হয়তো খেয়ে ফেলা হবে কিংবা বয়সকালে মারা যাবে...।

শুধু উট ও বকরী কেন, এ ধ্বংসশীল গোটা পৃথিবীর মূল্যই বা কত!

চিরসুখের এবং মহা-অমূল্য নি'আমত তো জান্নাতের নি'আমত। আর এ সামান্য এক উপাত্যকা ভর্তি উট-বকরীর বিনিময়ে সফওয়ান থেকে নিয়ে কতগুলো মানুষ চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেলো!

---

228. অনুবাদক।

229. সহীহ মুসলিম: [redacted]

দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনামূলক মান নির্ণয় এবং কিছু গনীমতের মালের বিপরীতে একজন মানুষের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমুচিত, যৌক্তিক ও অতি উন্নত বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা-ধারা নয়। তাৎক্ষনিকভাবে তুলনা করে তিনি যা স্থীর করলেন এটা কি প্রজ্ঞাময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশ ভাগ সঠিক সিদ্ধান্ত ছিলো না?

গনীমতের মালের বিনিময়ে ইসলাম গ্রহণ..।

দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত..।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে, গনীমতের মাল যত বেশিই হোক না কেন -একজন মানুষের ইসলাম গ্রহণের বিনিময় হিসেবে কিছুই না। শুধু গনীমতের মালই নয়, গোটা বিশ্বটাই তাঁর কাছে তুচ্ছ। তাই তিনি কোনো দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই এতগুলো সম্পদ দিয়ে দিলেন। দুনিয়ার মূল্য তো তাঁর নিকট মাছির ডানা পরিমানও নয়। তাঁর দৃষ্টিতে তো আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হচ্ছে বিশাল সমুদ্রের মাঝে এক ফোটা পানির ন্যায়। দুনিয়াকে তো তিনি ছোট ছোট কান বিশিষ্ট (বিশ্রী) মরা-পঁচা ছাগলছানার চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করেন। দুনিয়া সম্পর্কে এসব দর্শন শুধু থিওরিক্যালই নয়; বরং সমসাময়িক সকলেই তাঁর প্রাকটিক্যাল লাইফে এবং সাহাবীদের জীবনেও এর সু-স্পষ্ট বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং মুসলিম কিংবা অমুসলিম যারাই তাঁর সাথে উঠা-বসা চলা-ফেরা করেছেন সকলেই তা লক্ষ্য করেছেন।

হুনাইনের গনীমত থেকে তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না!

দু-এক বছরের দারিদ্র্য বিমোচন কিংবা জীবিকা নির্বাহ পরিমাণও না। অথচ তখন তাঁর বয়স ষাটেরও উপরে। তাঁর জন্য কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না দেখে

উপস্থিত লোকদের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পাওয়ার উপক্রম হলো। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। এদিকে গ্রাম্য লোকেরা নিজেদের জন্য কিছু ধন-সম্পদ ও জীব-জন্তু চেয়ে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে ভিড়াভিড়ি ও পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। এক পর্যায়ে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি গাছের সাথে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। অথচ তিনি তখন একজন বিজয়ী সম্রাট ও সেনানায়ক। ভিড়াভিড়ির ফাঁকে তারা তাঁর শরীরের চাদরটিও নিয়ে নিল। তিনি একজন মমতাময়ী নবী ও প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অত্যন্ত নম্র ও কোমল স্বরে বললেন,

«أيها الناس! ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا»

“হে লোক সকল! তোমরা আমার চাদর আমাকে ফিরিয়ে দাও, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমার নিকট যদি তিহামা[230] অঞ্চলের/এ নিম্ন ভূমির বৃক্ষরাজি পরিমানও উট থাকতো তাহলে আমি তাও তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম এরপরও তোমরা আমাকে কৃপন, কাপুরুষ ও মিথ্যাবাদী হিসেবে দেখবে না।”[231]

বাস্তবেও তিনি কোনো কৃপনতা, কাপুরুষতা কিংবা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ

230. তিহামাহ হচ্ছে নিম্নভূমি/হিজাযের একটি এলাকার নাম সূত্র: আল-মূজামুল ওয়াফী। (৩৩১)। –অনুবাদক।

231. সহীহ বুখারী: [redacted] আমর ইবন শু‘আইব থেকে ইয়াহইয়া লাইসীর বর্ণনায় মুআত্তায়ে ইমাম মালেক রহ. হাদীস নং ৯৭৭।

করেন নি।

এ সব শত্রুনেতাদের সাথে যা ঘটেছে হুবহু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে সুহাইল ইবন আমরের ক্ষেত্রেও।

চার. সুহাইল ইবন আমরের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

শুধু কুরাইশই নয় গোটা মক্কা নগরীর প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের একজন ছিল এ সুহাইল। সে ঐ সব শত্রুনেতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাদের দীর্ঘ কালো ইতিহাস রয়েছে। অধিক বয়সী ও বহু সন্তানের অধিকারী ছিল। যাদের অধিকাংশই মক্কা বিজয়ী মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর এতদিন তার সাথে যে সব নেতারা ছিল তাদের কারো নিকট থেকেই কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। সকলেই মুসলিম সৈন্যদের সামনে দিয়েই দৌড়ে পালাল। তাই সেও পালিয়ে নিজ ঘরে গিয়ে উঠল। যেমনটি সে নিজেই বর্ণনা করছে,

‘সে দিন আমি দৌড়ে এসে আমার ঘরে উঠেই দরজা বন্ধ করে দিলাম!’

সে আরো বর্ণনা করছে, ‘অতঃপর আমি বিজয়ী সৈন্যদের মাঝে থাকা আমার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবন সুহাইলের[232] নিকট খবর পাঠালাম যেন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে নেয়।

232. আব্দুল্লাহ ইবন সুহাইল ইবন আমর আল-ক্বারশী আল-আমেরী। উপনাম আবু সুহাইল। দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। মক্কায় ফিরে আসার পরে তার পিতা তাকে ধরে বেঁধে রাখে এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে অনেক নির্যাতন করে। বদর যুদ্ধের দিন তিনি ইসলামের কথা গোপন রেখে তার পিতার সাথে বেরিয়েছেন। যুদ্ধমাঠে এসে মুশরিকদের পক্ষ ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়ে যান। ১২ হিজরীতে ইয়ামামার ঘটনার দিন শহীদ হন। অধিকতর জানতে- ইবন আবদিল বার: আল-ইসতি‘আব (৩/৫৭), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (৪৭৩৪)।

কেননা আমি আশংকা করছিলাম যে, আমাকে হত্যা করে ফেলা হবে। কারণ, আমি ছিলাম সবচেয়ে দাগী অপরাধী। হুদায়বিয়ার দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যা করেছি অন্য কেউ তা করে নি। আমিই সন্ধি-চুক্তি লিপিবদ্ধ করেছি। আবার উহুদ এবং বদরেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমি লড়েছি।'[233]

আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার ব্যাপারে তার ইতিহাস ছিল অনেক দীর্ঘ। হুদাইবিয়ার দিন সে ছিল অনেক কঠোর ও একগুঁয়ে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার বার সুফারিশের পরও তার ছেলেকে মুসলিমদের সাথে যুক্ত হতে সে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু এখন সে এমন এক মহা আশংকাজনক অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছে যা তার প্রাণকেও হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। মৃত্যুভয় তাকে এমন ভাবে গ্রাস করে নিয়েছে যে, সে তার ছোট ছেলেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌঁছার অসীলাহ হিসেবে গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করে নি।

সুহাইল ইবন আমরেরই বর্ণনা: "(আমার ছেলে) আব্দুল্লাহ ইবন সুহাইল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে (আমার বাবাকে) নিরাপত্তা দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দ্বিধা-দন্ধ না করেই বললেন, 'সে আল্লাহর নিরাপত্তা দ্বারা নিরাপদ, সে বাইরে আসতে পারে'।"[234]

বর্তমান পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তখন সেখানে তারা যেরূপ আচরণ করে থাকে তার সাথে মক্কা

---

233. ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (৩/২১৯)।

234. ইবন আবদিল বার: আল-ইসতি'আব (৩/৫৭), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (৩/২১৯)।

বিজয়ের পর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপক্ষ নেতাদের সাথে আচরণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে, পরাজিত রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ভাগ্যে হত্যা, দেশান্তর কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী জেল-যুলুম ছাড়া আর কিছুই জোটে না। আর লাঞ্চনা ও অপদস্থতার কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুনেতাদেরকে শুধু নিরাপত্তাই দেন নি; বরং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং যাবতীয় নিন্দাবাদ এমনকি কটাক্ষ দৃষ্টির অবসান কল্পেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। চূড়ান্ত সভ্যতা ও অসাধারণ মানবতা প্রদর্শনপূর্বক সাহাবীদেরকে তিনি বলছেন,

«فمن لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه»

“সুহাইল ইবন আমরের সাথে সাক্ষাৎ হলে তোমাদের কেউ যেন তার দিকে কটাক্ষ দৃষ্টিতে না তাকায়।”[235]

দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশের ভিত্তিতে হোক কিংবা শত্রুকে কাছে পেয়ে মনোতুষ্টি লাভের ভিত্তিতে কোনোভাবেই সুহাইলের প্রতি কটু দৃষ্টিপাত করতে সাহাবীদেরকে নিষেধ করেছেন। বরং আরো আগে বেড়ে তিনি তার প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করছেন। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, “সুহাইল একজন জ্ঞানী ও সম্মানী মানুষ। সুহাইলের মতো ব্যক্তির ইসলামকে অনুধাবন না করে থাকার কথা না। সে বুঝতে পেরেছে যে, এতোদিন সে যার ওপর প্রতিস্থাপিত ছিল তা তার জন্য উপকারী নয়।”

সুবহানাল্লাহ! এ জাতীয় বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করার ভাষা আমাদের নেই। আব্দুল্লাহ ইবন সুহাইল পিতাকে নিরাপত্তা প্রাপ্তির সংবাদ দিতে গিয়ে যখন

235. ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (২/৩৪৬)।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বক্তব্যের কথা বললেন, তখন সুহাইল বলে উঠল, ‘আল্লাহর শপথ! তিনি ছোট-বড় সকলের সাথেই সদাচারী’।[236]

সুহাইল ইবন আমর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং ইসলামের পরশে ধন্য হলেন। পরবর্তী জীবনকে তিনি পরিপূর্ণাভাবে পাল্টে ফেললেন। যেমনটি বিভিন্ন রেওয়ায়াতে পাওয়া যায় যে, তিনি খুব বেশি বেশি সালাত আদায়, সাওম পালন ও দান-সদকা করতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি মুসলিমদের একটি গ্রুপের প্রধান ছিলেন।

প্রিয় পাঠক! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিকর্ম দেখুন, কীভাবে তিনি মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। যা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। এটা একমাত্র সদাচরণ, অন্তরের প্রসস্ততা ও উদারতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা ভুলে যাওয়ার কারণেই হয়েছে।

পাঁচ. ফুযালাহ ইবন উমায়েরের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

ফুযালাহ ইবন উমায়েরও ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোরতর শত্রুদের একজন। তার শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সেটি ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর ষড়যন্ত্র। সেদিন সেনানায়ক হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হাজার সাহাবীদের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছিলেন। ফুযালাহ নিশ্চিত জানতো যে, এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হলে তার প্রাণে রক্ষা নেই। তারপরও সে

236. ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতি‘আব (৩/৫৭)।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে তৈরী হয়ে গেল...।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করছিলেন। ফুযালাহ পোষাকের নিচে তরবারী লুকিয়ে রেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশে পাশে ঘুরাঘুরি করছিলো। যখন খুব নিকটবর্তী হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ফুযালাহ নাকি?' সে বলল, 'হ্যাঁ আমি ফুযালাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' (ঐ সময় সে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিমদের বেশ ধরে ছিল)।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি মনে মনে কী ভাবছ?

ফুযালাহ বলল, না না কিছু না, আমি আল্লাহর যিকির করছিলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁসে ফেললেন এবং বললেন, ফুযালাহ, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। অতঃপর তিনি তার বক্ষে হাত রাখলেন। ফলে তার অন্তর প্রশান্ত হয়ে গেল। সে নিজেই বর্ণনা করছেন, 'তিনি আমার বক্ষ থেকে হাত উঠানোর সাথে সাথেই আমার অনুভব হলো যে, পৃথিবীতে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি তিনিই'।[237]

এটা ছিল ঐ ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ যে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনাই করে নি শুধু; বরং তা বাস্তবায়নের চেষ্টাও করেছে এবং তরবারী বহন করে তার কাছাকাছিও চলে এসেছিলো। যদি না আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হিফাযত করতেন।

ছয়. হিনদ বিনত উতবাহ-র সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

---

237. ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (৪/৩৪২)।

হিনদ বিনত উতবাহ-র সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণের ঘটনাটিও উল্লিখিত ঘটনাবলীর চেয়ে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে ঐ সব মহিলাদের একজন, যারা দীর্ঘাকাল ইসলাম বিরোধী সংগ্রামে ব্রতী ছিল। মুসলিমদের মনে তাকে নিয়ে অনেকগুলো পীড়াদায়ক স্মৃতি জমে আছে। বিশেষ করে ব্যক্তিগতভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনেও। সে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু -র স্ত্রী এবং প্রসিদ্ধ কুরাইশ নেতা উতবাহ ইবন রবী'আর মেয়ে। ইসলামের প্রথম দিন থেকেই সে প্রচণ্ড ইসলাম বিদ্বেষী ছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধের পরে তা আরো বহু গুণে বেড়ে যায়। কারণ, বদর যুদ্ধে তার পিতা উতবাহ ইবন রাবী'আহ, তার চাচা শাইবাহ ইবন রবী'আহ, তার ছেলে হানযালা ইবন আবু সুফিয়ান ও তার ভাই ওয়ালীদ ইবন উতবাহ নিহত হয়েছিল। এ চারজনই তার অতি নিকটাত্মীয় এবং কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাই এদের নিহত হওয়ার ঘটনা তার মনে অভাবনীয় ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। বদর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সে এ ক্ষোভ লালন করে এসেছে। উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর সাথে সেও এসেছিল। সে তাদের বাহিনীকে সাধ্য অনুযায়ী মুসলিম নিধনে উত্তেজিত করতো। যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন কুরাইশরা মুসলিমদের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন সে তাদের চেহারায় বালি নিক্ষেপ করছিলো এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করছিলো। কুরাইশ পুরুষদের মতো সে ময়দান থেকে পালিয়েও যায় নি...!! শেষের দিকে যখন কুরাইশদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন সে একটি অত্যন্ত জঘন্যতম নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সে একর পর এক মুসলিম শহীদদের লাশগুলোর রূপ বিকৃত করতে থাকে। একাধারে সে সকল লাশের নাক-কান কাটতে থাকে। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিবের লাশের সামনে গিয়ে স্থীর হয় এবং তার পেট বিদীর্ণ করে

কলিজা বের করে আনে। প্রচণ্ড বিদ্বেষে উত্তেজিত হয়ে এক পর্যায়ে সে কলিজার একাংশ চাবাতে শুরু করে। পরে স্বাদ অনুভব না করায় দূরে ছুড়ে মারে..!!

এ দৃশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কঠিনভাবে প্রভাবিত করেছে এবং তার মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিকৃত লাশের নিকট দাঁড়ালেন তখন মনে হলো এর চেয়ে বেদনাদায়ক কোনো দৃশ্য তিনি আর কখনো দেখেন নি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বললেন, "হে চাচা! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন, আপনি ছিলেন অধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং অধিক দান-খয়রাতকারী।"[238]

প্রিয় পাঠক! হিনদ বিনত উতবাহ-র ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোধের পরিমাণটা এবার আপনি একটু কল্পনা করুন। আবার সে আহযাবের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল; বরং মক্কা বিজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময় সে ইসলামের বিরুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এমনকি মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তার স্বামী আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করছিল এবং নিরাপত্তার জন্য সকলকে নিজ ঘরে প্রবেশের আহ্বান করছিল তখন সে তার বিরোধিতা করেছিল। মক্কাবাসীকে আবু সুফিয়ানের হত্যা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল।[239]

সে অনেক দীর্ঘ ইতিহাস। মুসলিমদের সাথে এ মহিলার দুর্বৃত্তির উপাখ্যান

238. ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (১/৬০৪)।

239. ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (৪/৩২৪)।

অনেক বিস্তৃত। এরপরও হাজারো বাধা-বিপত্তির দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করে নিলেন। চতুর্দিক থেকে মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসছেন আর বায়'আত গ্রহণ করছেন। অনেক দিন পর হিনদ বিনত উতবাহও ঘোমটা পরে নিজের বেশ-ভূষা পাল্টিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসল। তার ইচ্ছা ছিল, সাধারণ মহিলাদের ভিড়ে সেও বায়'আত গ্রহণ করে নিবে। সে সময় মহিলাদের বায়'আত ছিল তারা এ মর্মে শপথ করবে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা-ব্যভিচার করবে না, নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং সৎ কাজের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হবে না।

হিনদ বিনত উতবাহ-র অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি মাত্রই তার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমনের কথা কল্পনাও করতে পারবে না। সবার একই ধারণা যে, সে নিশ্চিত হত্যার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, বাস্তব অবস্থা ছিল মানুষের সকল চিন্তা-ভাবনারও অনেক ঊর্ধ্বে। চলুন, দেখি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কী আচরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে অনেক মহিলার বায়'আত গ্রহণ করছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন,

«بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا»

"তোমরা আমার হাতে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না।"

হিনদ বিনত উতবাহ মুখোষ পরা অবস্থাতেই বলে উঠল, (রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনো তাকে চিনতে পারেন নি) আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের বেলায় এমন কিছু বাড়াবাড়ি করছেন যা পুরুষদের বেলায় করেন না। (অর্থাৎ, পুরুষরা শুধু একটি বাক্য দ্বারা মুসলিম হয়ে যায়, কিন্তু মহিলাদেরকে বিস্তারিতভাবে অনেক কথার শপথ করানো হয়)।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আপত্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে শপথ বাক্য পূর্ণ করার দিকে এগুলেন এবং বললেন,

«ولا تسرقن»

"এবং তোমরা চুরি করবে না।"

এখানে এসে হিনদ চুপ হয়ে গেল (এ বাক্য পাঠ করল না)। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপন মানুষ। সে আমার ও সন্তানদের প্রয়োজনীয় খরচ দেয় না। আমি কি তার অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ থেকে আমাদের প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করতে পারবো?
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সততার সাথে তোমার ও সন্তানদের একান্ত প্রয়োজন পরিমান সম্পদ তুমি খরচ করতে পারবে।"[240]

এতক্ষণে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। বুঝতে পারলেন যে, তিনি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদ বিনত উতবাহ-র সাথেই এতক্ষণ কথা বলছেন। চমকে উঠে বললেন, 'তুমিই কি হিনদ বিনত উতবাহ?' সে বলল, হ্যাঁ, আমি হিনদ বিনত উতবাহ, অতীতের সব কিছুর জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন।

---

240. সহীহ বুখারী: (باب من أجرى أمر الأمصار على مايتعارفون بينهم في ،كتاب البيوع البيوع والإجارة) হাদীস নং ২০৫৯, সহীহ মুসলিম:(كتاب الأقضية، باب قضية هند) হাদীস নং ১৭১৪।

এ মুহূর্তটি হিনদ এর জীবনের বাঁচা-মরার চূড়ান্ত ফয়সালার মুহূর্ত। দেখা যাক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সকল অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করে বিশেষ করে চাচা হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার কার্যকলাপের স্মৃতিচারণ করে তার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?

কিন্তু তিনি নিজ স্বভাবজাত অবস্থানে অটল ছিলেন। অতীতের পীড়াদায়ক স্মৃতিগুলো নিয়ে একটি মন্তব্যও করলেন না; বরং সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তার ইসলাম গ্রহণকে আন্তরিকভাবে মেনে নিলেন এবং যেন তার সাথে কিছুই হয় নি -এমন ভঙ্গিতে অন্যান্য মহিলাদের সাথে তারও বায়‘আত পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে গেলেন, বললেন,

«ولا تزنين»

“এবং তোমরা যিনা-ব্যভিচার করবে না।”

হিনদ বিনত উতবাহ আপত্তি উত্থাপন করেই যাচ্ছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সম্ভ্রান্ত মহিলারা কি যিনা-ব্যভিচার করে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথায়ও কান দিলেন না। বায়‘আতের পরবর্তী বাক্য বললেন,

«ولا تقتلن أولادكن»

“এবং নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।”

হিনদ বলে উঠল, সন্তানদেরকে তো আমরা ছোটকালে লালন-পালন করে দিয়েছি আর বড় হওয়ার পর আপনি তাদেরকে মেরে ফেললেন। বদরের দিন কি আপনি আমাদের কোন সন্তান বাকি রেখেছেন? আপনি বদর যুদ্ধে সন্তানদের পিতাদেরকে হত্যা করে এখন বলছেন আমরা যেন সন্তান হত্যা না করি। (হত্যা করার জন্য সন্তান আমরা পাবো কোথায়?) এখানেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি।

এ কথাও বলেন নি যে, বদরে আমরা তাদেরকে কেন হত্যা করেছি? তাদেরকে কি এজন্য হত্যা করা হয় নি যে, তারা ছিল মুশরিক –যাদের মধ্যে তোমার বাবা, চাচা, ভাই এবং ছেলেও ছিল। যারা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা আমাদেরকে আমাদের দীন থেকে বিচ্যুত করার ধান্ধায় থাকতো। যারা আমাদের ওপর অত্যাচারের স্টীম-রোলার চালিয়ে ছিল। আমাদেরকে দেশান্তর করে আমাদের ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদ দখল করে নিয়েছিলো?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর কিছুই বললেন না; বরং তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল অসাধারণ। তিনি মুসকি হাঁসলেন এবং বিষয়টিকে অত্যন্ত সহজ ভাবে নিলেন। হিনদ বিনত উতবাহ-র অবস্থান হিসেবে তার উপর আঘাত হানা ইসলামের পদক্ষেপগুলো কঠিনই ছিল। বিষয়টি তিনি বিবেচনায় নিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن»

“এবং তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না।”

হিনদ বিনত উতবাহ বলল, আল্লাহর শপথ! অপবাদ আরোপ করা আসলেই অত্যন্ত মন্দ কাজ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«ولا تعصينني في معروف»

“সৎ কাজের ক্ষেত্রে আমার অবাধ্য হবে না।”

হিনদ বলল, আল্লাহর শপথ! আপানার অবাধ্য হওয়ার মানসিকতা নিয়ে

আমাদের কেউ এখানে বসে নি।[241]

এভাবেই মক্কার নারীরা এ বরকতময় বায়‘আতের মাধ্যমে চির সুখের জান্নাত পানে যাত্রা শুরু করেন। যাদের মধ্যে হিনদ বিনত উতবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা-ও ছিলেন।

কত মহান আমার আল্লাহ যিনি অন্তরসমূহের গতি-প্রকৃতির মালিক। হিনদ বিনত উতবাহ কতইনা আন্তরিকভাবে ইসলামকে গ্রহণ ও বরণ করে নিয়েছেন। আগে যেমন কাফির সৈনিকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য যুদ্ধে যেতেন ইসলাম গ্রহণের পর তার চেয়ে আরো অনেকগুণ বেশি আগ্রহের সাথে মুজাহিদদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য জিহাদের ময়দানে অংশ গ্রহণ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশি ভুমিকা পালন করেছেন ইয়ারমুকের দিন। দুই লক্ষ্য রোমীয় সৈন্যের মুকাবিলায় সাহাবীদের প্রলয়ংকরী সে যুদ্ধে ভিড়ের ভেতরে প্রবেশ করে মুজাহিদদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে তার অসামান্য অবদান ছিল সেদিনের সফলতার কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম।

হিনদ বিনত উতবাহ-র মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমার অগ্রযাত্রা আরো এক ধাপ বেড়ে গেল। যার সুচনায় ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি অমায়িক সদাচরণ। এমনিভাবে যেসব ঘোরতর শত্রুরা পরিশেষে খাঁটি বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন তাদের অনেকেরই এ পথে আসার শুভ-সুচনা হয়েছিল তাঁর এ অনন্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই।

241. ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (৪/৩৫৪-৩৫৫)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

অন্যান্য গোত্রের শত্রু-নেতাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ মহৎ অসাধারণ নবীসুলভ সদাচারণ বিশেষ কোনো পুরুষ বা নারী কিংবা শুধুমাত্র মক্কার শত্রুনেতাদের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং বিভিন্ন গোত্রের আরো অনেক নেতৃবর্গের সাথেও তিনি একইরূপ আচরণ করেছেন। এ পরিচ্ছেদকে আমরা মক্কা ব্যতীত অন্যান্য গোত্রের মধ্য হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি কষ্টদাতা কট্টর তিন শত্রুনেতার আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখবো।

এক. মালেক ইবন 'আউফ আন-নাসরী-র সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

হাওয়াযিন গোত্রসমূহের দলনেতা মালেক ইবন 'আউফ আন-নাসরী-র সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের ঘটনাটি হচ্ছে আমাদের ধারণার চেয়েও আশ্চর্যজনক।

মালেক ইবন 'আউফ ছিল আরবের সবচেয়ে ভয়ংকর নেতা। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুকাবেলার জন্য হাওয়াযিন ও সাক্বীফ ইত্যাদি সহযোগী গোত্রসমূহকে নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল যার সদস্য সংখ্যা পঁচিশ হাজারে গিয়ে উপনীত হয়েছে। যাকে সাধারণত তৎকালীন আরবের সবচেয়ে বড় বাহিনী বলা যায়। এ বাহিনীকে সে এমনভাবে উত্তেজিত করে তুলেছে যে, তারা রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসার পথ রুদ্ধ করার জন্য নিজেদের স্ত্রী-সন্তান, পশু-পাখি ও ধন-সম্পদ সবকিছু নিয়েই যুদ্ধমাঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

এভাবেই তারা মুসিলম নিধনে নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতো।

মালেক ইবন ‘আউফের লক্ষ্য আগে থেকেই স্থির করা ছিল। আর তা হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায়ের চিরকালের জন্য মূলোৎপাটন করে ফেলা। এ লক্ষ্যে সে সুপরিকল্পিত চকও এঁকেছিল এবং হুনাইন[242] উপাত্যকার নিকটবর্তী একটি স্থানে মুসলিমদের সাথে এক ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে চলছিল। মুসলিমরা মহা বিপর্যয়ে পতিত হয়ে যায় এবং ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ইসলামের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো প্রায় নিহত হয়েই গিয়েছিলেন। ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসে সেটিই ছিল স্মরণকালের বৃহত্তম মহা সংকট। কিন্তু এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের শেষের দিকে এসে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের দিকে ফিরে চাইলেন। যুদ্ধের চুড়ান্ত পর্বে সাক্বীফ ও হাওয়াযিনের লোকেরা পালাতে শুরু করলো। মালেক ইবন ‘আউফও পালিয়ে গিয়ে তায়েফের দূর্গগুলোতে সাক্বীফের লোকদের সাথে মিলিত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল..।

হাওয়াযিন গোত্রসমূহের লোকেরা যখন দেখল তাদের দলপতি মালেক ইবন ‘আউফও পালিয়ে গেছে তখন তারা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করতে শুরু করল। ইসলাম গ্রহণের প্রতি তাদের এ আগ্রহের পেছনে গনীমত ও যুদ্ধবন্ধি হিসেবে মুসলিমরা তাদের যেসব ধন-সম্পদ, জীব-জন্তু ও নারীদেরকে আয়ত্ব করেছিল সেগুলোর পুনরুদ্ধার করাই ছিল সবচেয়ে বড় কারণ।

---

242. হুনাইন হচ্ছে মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে একটি উপাত্যকার নাম। মক্কা বিজয়ের পর সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাওয়াযিন গোত্রের সাথে এক যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং বিজয় লাভ করেন। ইতিহাসে যা ‘হুনাইন যুদ্ধ’ নামে প্রসিদ্ধ।

প্রবল প্রতাপশালী গোত্রপ্রধান ও সেনানায়ক মালেক ইবন 'আউফ খুব একাকিত্ব ও অসহায় বোধ করতে লাগল। সে দেখল যে, তার ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও গোত্রের লোকেরা কেউই তার পাশে নেই। উপরন্তু সে আছে এখন অন্য গোত্র তথা বনু সাক্বীফের আশ্রিত হয়ে। যেখানে সে নিজের প্রাণের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কামুক্ত নয়..। একজন সেনাপ্রধান যতটা মানসিক বিপর্যয়ের স্বীকার হতে পারে মালেক ইবন 'আউফ তার সবটাই অনুভব করছে। তার এহেন নৈরাশ্যজনক দুরাবস্থায় তাকে নিয়ে ভাবার মতো শুধু একজন মানুষই আছেন..! তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালেক ইবন 'আউফ ও তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তার কওমের লোকেরা জানাল যে, সে পালিয়ে গিয়ে তায়েফের দূর্গগুলোতে সাক্বীফের লোকদের সাথে মিলিত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যেখানে সে নিজের প্রাণের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কামুক্ত নয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বকীয় কমনীয় স্বরে বললেন, "তোমরা মালেক ইবন আউফকে এ মর্মে সংবাদ পাঠাও যে, সে যদি আমার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তাহলে আমি তার ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন সবই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং আরো একশত উট দান করবো।"[243]

এ ধরণের ঘোষণার কথা কি আগে কেউ কল্পনা করতে পেরেছে? একজন বিজয়ী সেনানায়কের নিকট পরাজিত শত্রুনেতার সাথে এ ধরণের আচরণ কি কেউ আশা করতে পারে?

---

243. তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক (২/১৭৪)

পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই যে, সাধারণত বিজয়ী নেতারা পরাজিত শত্রুনেতাদের ওপর আইন প্রয়োগ করে, লাঞ্ছিত-অপমানিত করে ও কঠোর শাস্তি প্রদান করেই মজা পায় এবং তৃপ্তি অনুভব করে। বিজয়ী সেনাপ্রধান কর্তৃক পরাজিত শত্রুনেতার প্রতি দয়া করা, সহানুভূতিশীল হওয়া, তার জন্য ত্যাগ শিকার করা ও তাকে অকৃপনভাবে দান-সদকা করার কথা তো জগতের অন্যান্য সেনানায়কদের কল্পনাতেও আসতে পারে না!

মালেক ইবন ‘আউফ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরণের মন্তব্যের কথা শুনে বিদ্যমান সংকটের অবসান ও নিজের প্রাণ রক্ষার পথ আবিস্কার করে ফেলল। সে দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো তিরস্কার করলেন না, কোনো প্রকারের কঠোর আচরণ করলেন না, এমনকি তার কোনো কাজের ব্যাখ্যাও জানতে চাইলেন না; বরং তিনি কোনো শর্ত ও মন্তব্য ছাড়াই তার ইসলাম গ্রহণকে মেনে নিলেন। শুধু তাই নয়, আরো উন্নত ও মহৎ আচরণ দেখিয়ে তিনি তাকে হাওয়াযিনের গোত্রপ্রধানের পদ ফিরিয়ে দিলেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করলেন। তায়েফ অবরোধ অভিযানে তিনি তাকে দলনেতার দায়িত্ব দিলেন। কতক নেতার অহংকার ও দাম্ভিকতার ফলস্বরূপ যেমন তাদের অতীতের মান-সম্মান ও পদমর্যাদা সব বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে মালেক ইবন আউফের বেলায় তা করা হয় নি; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি সম্ভাব্য সকল প্রকার সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তার অতীতের যশ-খ্যাতি, মান-সম্মান ও পদমর্যাদা সবকিছুই বহাল রেখেছেন। এক মুহুর্তেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালেক ইবন ‘আউফের সকল অতীতকে ভুলে গেলেন। তার সাথে তিনি নিজেদের একজন সম্মানিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মতোই

আচরণ করলেন। পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিতে ব্যয় হওয়া তার শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে তিনি শান্তি ও প্রগতির পক্ষের শক্তিতে রূপান্তিরত করে দিলেন।

কতইনা সৌভাগ্য মুসিলমদের..!!

কতইনা সৌভাগ্য হাওয়াযিনবাসীর..!!

কতইনা সৌভাগ্য মালেক ইবন 'আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর..!!

এতকিছুর পরও এমন কেউ কি আছেন যারা মুসলিমদের প্রতি এ অভিযোগ করতে পারেন যে, তারা অন্য সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেয় না বা যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে না? পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম বা মতাদর্শে কি এমন কিছু পাওয়া যাবে, যা আমাদের মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এহেন মহৎ আদর্শের ধারে কাছেও যেতে পারে?

বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

দুই. 'আদী ইবন হাতেম তাঈ'র সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

মালেক ইবন 'আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একই ধরণের আচরণ করেছেন তিনি তাঈ গোত্রের অধিপতি 'আদী ইবন হাতেম তাঈ'র সাথেও। বনু তাঈ ছিল দীর্ঘদিন থেকে ইসলামের বিরোধিতায় অতি কট্টর একটি গোত্র। তাদের অতীত প্রেক্ষাপটে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা তাদের এ নতুন দীন ইসলামে প্রবেশকে আরো কঠিন করে দিয়েছে। এটি ছিল কাহতানী[244] শাখাসমূহের একটি। যাদের অবস্থান ছিল আদনানী শাখা কুরাইশ থেকে অনেক দিক থেকেই দূরে। এজন্যই উভয়ের মাঝের গোত্রগত

244. আরবের গোত্রগুলো প্রধানত দু'টি শাখায় বিভক্ত। আদনান ও কাহতান। আদনানের উপশাখা হচ্ছে- সাক্বীফ, বনু কিলাব ও বনু বকর ইবন ওয়ায়েল। কাহতানের উপশাখা হলো- বুজাইলাহ ও বনু তাঈ।

বিভেদ-বিভাজন ছিল সর্বোচ্ছ পর্যায়ের। বনু তাঈ গোত্রের নিজস্ব একটি দেবতা ছিল। যার নাম ছিল 'ফিলস'। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকেরা তা দেখার জন্য আসত৷ আবার তাদের মধ্যে কিছুলোক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে রোম সম্রাজ্যের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে চলতে শুরু করে। এজন্যই এ গোত্রের ইসলামি চিন্তা-চেতনাকে গ্রহণ করার পেছনে অনেকগুলো বিষয় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোত্রীয় বিভেদ, চিন্তাগত অনৈক্য ও তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র তথা রোম সম্রাজ্যের সাথে তাদের বন্ধুত্ব স্থাপন তার মধ্যে অন্যতম। উপরন্তু সে সময় তারা ছিল ঐ সমস্ত গোত্রসমূহের মধ্যে একটি, যারা আরব উপ-দ্বীপের অনেক দূর পর্যন্ত নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল৷ এমনকি বনু তাঈ গোত্রের লোকদের সন্তুষ্টি ও অনুমোদন ব্যতীত ইরাক কিংবা শাম অভিমুখে কেউ নিরাপদে সফর পর্যন্ত করতে পারতো না। এবার একটু ভেবে দেখুন যে, তাদের ইসলাম গ্রহণ করা কতটা দুরূহ ব্যাপার ছিল৷ ইসলাম বিরোধিতায় তাদের অবস্থান আরো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবেন যখন আপনি শুনবেন যে, কুখ্যাত ইয়াহূদী নেতা কা'ব ইবন আশরাফ এ গোত্রেরই লোক ছিল৷ যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলিমদের জন্য শত্রুতার জাল বিছিয়ে রাখতো৷ তার পিতা ছিল তাঈ গোত্রের৷ মাতা বনু নাদ্বীরের৷ যখন তার ষড়যন্ত্র মাত্রারিক্ত বেড়ে গিয়েছিল এবং গোটা আরব ভূ-খণ্ডকে সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল৷ তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। তাঈ গোত্র আরবের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য যতগুলো পয়েন্ট ছিল কা'ব ইবন আশরাফের হত্যার মধ্য দিয়ে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট ঝরে গেল৷ এ প্রভাবশালী গোত্রের গোত্রপতি ছিল দানশীলতা ও মেহমানদারীর প্রবাদপুরুষ প্রখ্যাত আরবনেতা হাতেম তাঈ'র ছেলে 'আদী

ইবন হাতেম তাঈ। 'আদী ইবন হাতেম তাঈ দেখল যে, তার পায়ের নিচের জমিন সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আরব উপ-দ্বীপে তার অবস্থান অত্যন্ত নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। তাই সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচণ্ডরকম হিংসা করতে শুরু করল। এমনকি সে বলে ফেলল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রেরিত হয়েছেন তখন তার চেয়ে অধিক ঘৃণা আমি কখনো কোনো কিছুকেই করি নি।[245]

অনেক দিন পরের কথা। মক্কা বিজয় হয়ে গেল। মক্কাবাসীরা নিরাপত্তার সাথে বসবাস করছে। হাওয়াযিনও ইসলামের ছায়াতলে এসে গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে মানুষের গড়া দেব-দেবিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য অনেকগুলো সারিয়্যাহ (অভিযান) প্রেরণ করলেন। বনু তাঈ গোত্রের দেবতা 'ফিলস'কে ধ্বংস করার জন্যও আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। প্রথমে তারা এ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিল। অনেকে বন্দি হয়। 'আদী ইবন হাতেম তাঈ পালিয়ে শামের মিত্রদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। তার বোনকেও বন্দি করা হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসার জন্য শামের বিভিন্ন অঞ্চলে তার ভাইকে খুঁজতে লাগল। এক পর্যায়ে ভাইকে খুঁজে পেয়ে বলল, 'তুমি এমন কাজ করেছ যা তোমার বাবা কখনো করে নি। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক চল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে যাই।'[246]

245. ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (৩/৫০৪), আয-যাহবী: তারীখুল ইসলাম (১/৩৫৪)।

246. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৯৪০০; ইবন হিব্বান হাদীস নং ৭২০৬; তাবরানী, হাদীস

সে সময় অন্য দেশে আশ্রিত হয়ে থাকার জন্য 'আদী ইবন হাতেম তাঈ নিজেই নিজ জীবনের ওপর ছিল অতীষ্ট। সে সময়কার তার অবস্থার চিত্রায়ন তার মুখ থেকেই শুনুন- 'আদী ইবন হাতেম বলেন, "সে সময় আমার অবস্থানের ওপর আমি নিজেই সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমার মনে হলো যে, পালিয়ে না এসে যুদ্ধমাঠে নিহত হয়ে যাওয়াই আমার জন্য অনেক ভালো ছিল। তাই আমি আমার বোনকে বললাম যে, আমি তার (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নিকট যাবো। যদি তিনি সত্যবাদী হন তাহলে আমি তার কথা মেনে নেব। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে সে আমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।"[247]

ভগ্ন হৃদয়, দুর্বল চিত্ত ও বিপর্যস্ত মানসিকতা নিয়ে 'আদী ইবন হাতেম তাঈ মদীনায় ফিরে আসল। আর তার দুরাবস্থার কথা তো কারো কাছেই অজানা নয়। দেখা যাক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কেমন আচরণ করেন।

আদী'র নিজেরই বর্ণনা, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আদী ইবন হাতেম! ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকতে পারবে। একথা তিনি তিনবার বললেন।

আমি বললাম, আমি তো একটি দীনের ওপর রয়েছি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার দীন সম্পর্কে তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি।

নং ১৩৯২৫।

247. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৯৩৯৭; মুসতাদরাকে হাকিম হাদীস নং ৮৫৮২; ইবন হিব্বান হাদীস নং ৬৬৭৯; ইমাম বুখারীও নবুওয়াতের আলামত অধ্যায়ে এ হাদীসের কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন: হাদীস নং ৩৪০০।

আমি বললাম: আপনি আমার দীন সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানেন?!

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি রকুসিয়্যাহ[248] সম্প্রদায়ের লোক নও? তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ খেয়ে ফেলো না?

আমি বললাম: হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: তোমার দীন অনুযায়ী এটা তোমার জন্য বৈধ নয়।

('আদী ইবন হাতেম বলেন) এরপর তিনি যাই বললেন আমি অবনত মস্তকে শুধু শুনে গেলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কেন এখনো ইসলাম গ্রহণ করতে পারছো না তাও আমি জানি। তুমি ভাবছো যে, আমার অনুসারীগণ সবাই দরিদ্র শ্রেণির লোক। আমাদের কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই। আরবরা আমাদেরকে একবার তাড়িয়ে দিয়েছিল। আচ্ছা তুমি কি হেরাত[249] চেনো?

আমি বলল: নাম শুনেছি। কখনো দেখি নি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ অবশ্যই এ দীনের পরিপূর্ণতা দান করবেন। এমন এক সময় আসবে যখন হেরাত থেকে একজন উষ্ট্রারোহিনী নারী একাকি ভ্রমন করে কা'বা ঘর তাওয়াফ করে নিরাপদে ফিরে যেতে পারবে। আল্লাহ অবশ্যই কিসরা ইবন হরমুজের ধন-ভাণ্ডারকেও আমাদের হস্তগত করে

248. খ্রিস্টানদের একটি বিকৃত শাখা।

249. ইরাকের কূফা নগরীর একটি স্থান।

দেবেন।

আমি বললাম, কিসরা ইবন হরমুজের?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হ্যাঁ, কিসরা ইবন হরমুজের এবং মুসলিমদেরকে এত বেশি সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে যে, দান করার জন্য লোক খুঁজা হবে; কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না।”[250]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সহজেই এক প্রসিদ্ধ কাফির নেতাকে মুসলিমদের সারিতে যুক্ত করে নিলেন। এটাও ভাবলেন না যে, হতে পারে সে ভেতরে ভেতরে বনু তাঈ গোত্রকে আবারও ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। তাকে অতীতের তার ইসলাম বিরোধী যুদ্ধগুলোর কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন না। তার সাথে কোনোরূপ অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশও করলেন না; বরং তিনি তার সাথে ধৈর্য ও নম্রতার সাথে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করলেন।

পরবর্তীতে ‘আদী ইবন হাতেম তাঈ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন: “এখন তো একজন উষ্ট্রারোহিনী নারী হেরাত থেকে একাকি ভ্রমন করে কা‘বা ঘর তাওয়াফ করে নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারে। কিসরা ইবন হরমুজের ধন -ভাণ্ডারের বিজয়াভিযানে আমি নিজেই উপস্থিত ছিলাম। আর তৃতীয় কথাটিও (দান গ্রহণ করার মতো লোক পাওয়া না যাওয়ার কথা) অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বলেছেন।”

তিন. আবদ ইয়ালীল ইবন আমর আস-সাক্বাফী-র সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

250. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৯৩৯৭।

উপসংহারে আমরা এমন এক আশ্চর্যজনক ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণের ঘটনার অবতারণা করছি কেউ ভাবতেও পারে নি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের ব্যক্তির সাথেও ভালো আচরণ করবেন। এ ব্যক্তি দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে অনেকগুলো গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে রেখেছিল। আবার যখনও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসেছিল তখনও অন্যান্য শত্রুনেতাদের মতো ইসলাম গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে নয়; বরং এসেছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করার জন্য। গোটা আরব ভূখণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ ছিল একজন। এ হচ্ছে প্রখ্যাত সাক্বীফ গোত্রের অধিপতি আবদ ইয়ালীল ইবন আমর আস-সাক্বাফী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার অতীতের অধ্যায় অত্যন্ত কলংজনক।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার ঘটনার সূচনা হয় নবী-পিতৃব্য আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামি দাওয়াতের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সাক্বীফ গোত্রকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তায়েফ অভিমুখে রওয়ানা করলেন। তাদের নিকট থেকে তিনি সম্মানজনক আচরণের আশা করেছিলেন। সাক্বীফের নেতৃস্থানীয় তিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করলেন। যাদের প্রধান ছিল এ আবদ ইয়ালীল ইবন আমর আস-সাক্বাফী। তাদের নিকট বিষয়টি পেশ করলেন। কিন্তু ধারণাতিতভাবে তাদের নিকট অসম্মতি, অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচণ ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। শুধু কি তাই? বরং তারা তাকে ঠাট্টা, বিদ্রুপ, অপমান-অপদস্থ ও কটুক্তি করতেও কমতি করে নি। এমনকি তাদের প্রধান আবদ ইয়ালীল ইবন আমর মন্তব্য করেছিল যে,

“আল্লাহ যদি তাকে নবী করে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে সে কা‘বার গিলাফের পশম উপড়ানোয় লেগে যাক।”[251]

এরপর তারা বখাটে বালক ও নির্বোধ লোকদেরকে লেলিয়ে দিল। যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথী যায়েদ ইবন হারেছাকে গালাগালি ও পাথর নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে তায়েফের সীমানা থেকে বের করে দিয়েছিল। দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় আঘাত আর কোথাও পান নি।

সাক্বীফের খুব কম লোকই ঈমান এনেছিল। সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রসিদ্ধ সাহাবী মুগীরাহ ইবন শু‘বাহ[252] ব্যতীত সাক্বীফ গোত্রের আর কেউই ঈমান গ্রহণ করে নি।

এরপর তারা হাওয়াযিন গোত্রের সাথে মিত্রতা করে মুসলিমদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। অষ্টম হিজরীর হুনাইন যুদ্ধে[253] যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর তাদের সৈনিকরা তায়েফের দূর্গগুলোতে আশ্রয় নেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ একমাস[254] পর্যন্ত সে দূর্গগুলো অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু তাদেরকে বের করে আনতে সক্ষম হলেন না। অতঃপর এ অবস্থাতে তায়েফ বিজয় ছাড়াই

251. তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক (১/৫৫৪)।

252. মুগীরাহ ইবন শু’বাহ ইবন আবু আমের ইবন মাসউদ সাক্বাফী। খনদকের দিন (কারো মতে হুদায়বিয়ার দিন) ইসলাম গ্রহণ করেন। শা’বী হতে বর্ণিত: ‘আরবে চারজন বিচক্ষন ব্যক্তি ছিলেন। মু‘আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান, আমর ইবনুল আস, মুগীরাহ ইবন শু‘বাহ ও যিয়াদ।’ তিনি ৫০ হিজরীতে কুফায় ইন্তিকাল করেন। অধিকতর জানতে- ইবনুল আসীর: উসদুল গাবাহ (৪/৪৫৪), ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতি‘আব (৪/৭), ইবন হাজার: আল-ইসাবাহ (৮২৭৯)।

253. মক্কা বিজয়ের পর।

254. তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক (২/১৭১)।

স্থান ত্যাগ করে ফিরে আসেন। এটি মেনে নিতে সাহাবীদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টিকে সহজ করে দিলেন এবং সাক্বীফ গোত্রের হিদায়াতের জন্য দো'আ করলেন।

সাক্বীফের অপরাধ আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যখন তারা তাদের নেতা উরওয়া ইবন মাসউদ[255] রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করার অপরাধে হত্যা করে ফেলে। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে খুব প্রভাব ফেলেছিল।

অনেক দিন পর নবম হিজরীর রমযান মাসে সাক্বীফ গোত্রের লোকেরা যখন দেখল যে, মুসলিমরাই এখন আরব উপ-দ্বীপের একমাত্র প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে তাবুকে রোমীয়দের পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর। তখন তারা মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণের চিন্তা মাথায় নিল। তাদের কথা ও কাজ-কর্ম দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গিয়েছিল যে, তারা ইসলামকে ভালোবেসে বা ইসলামের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে নয়; বরং তারা এজন্যই ইসলামকে মেনে নিচ্ছে যে, এখন আর ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা তাদের

255. উরওয়া ইবন মাসঊদ ইবন সাক্বীফ। হুদায়বিয়ার দিন কুরাইশরা যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠিয়েছিল তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন। নিজ সম্প্রদায়ের সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং তাদেরেক ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। কওমের লোকেরা চতুর্দিক থেকে তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলে একটি তীর বিদ্ধ হয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বমূহুর্তে তাকে প্রশ্ন করা হলো যে, তোমার এ মৃত্যু সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান এবং শাহাদাতের অমীয় সুধা যা আল্লাহ আমাকে পান করিয়েছেন। আমি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। তোমরা আমাকে তাদের সাথে সমাহিত করিও। তাকে শহীদদের সাথেই সমাহিত করা হয়েছে। অধিকতর জানতে- ইবনু আবদিল বার: আল-ইসতি'আব (৩/১৭৬), ই বন হাজার: আল-ইসাবাহ (৫৫২৭)।

নেই তারা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মতবিনিময়, কথোপকথন ও সম্ভাব্য সর্বোচ্ছ পর্যায়ের সু-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি প্রতিনিধি দলকে প্রেরণ করল। যাদের নেতৃত্বে ছিল সেই আবদ ইয়ালীল ইবন আমর যে কোনো একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অত্যন্ত লজ্জাজনক বিদ্রুপ করেছিল। কিন্তু সময় অনেক বদলেছে। এখন সে দুর্বল চিত্তে অবনত মস্তকে শক্তি ও ক্ষমতার শীর্ষে থাকা মহান রাষ্ট্রনায়ক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছে।

আবদ ইয়ালীল ইবন আমরের নেতৃত্বে সাক্বীফের প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের অতীতের কোনো কিছুই স্মরণ করিয়ে দেন নি। যেদিন সাহায্যের আবেদন নিয়ে তাদের নিকট গিয়েছিলেন সেদিনের অপমানকর ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাসের কথাও উল্লেখ করেন নি। এটাও বলেন নি যে, আজ প্রতিশোধের দিন। আজকের দিন সেদিনের বদলা নেওয়ার দিন, যেদিন তোমরা আমাকে উপহাস করেছিলে। বরং তিনি তাদেরকে অভিবাদন, হাসি-মুখ, সদাচরণ, ভোজ-সভা ও উপঢৌকন দ্বারা বরণ করে নিলেন। তদের নিকট বসলেন। তাদের মতামত ও চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতামূলক উপস্থাপনাগুলো শুনে গেলেন। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না এবং রাগান্বিতও হলেন না। বাদানুবাদ করলেন শান্ত স্বরে। কথা বললেন ধীরতার সাথে। তারা কয়েকটি শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। তাদেরকে সুদ, যিনা-ব্যভিচার ও মদ্যপানের অনুমতি দিতে হবে। সালাত মওকূফ করে দিতে হবে। তাদের দেবতা ‘লাত’-কে[256] অক্ষত রাখতে হবে।[257]

256. ‘লাত’ হচ্ছে তায়েফের সাক্বীফ গোত্রের একটি দেবতার নাম। দেখুন- ইবনুল আসীর: আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল আসার (৪/৪১৩)।

257. দেখুন- ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (৫/৩৩), ইবনু সাইয়িদিন নাস:

তাদের এসব নির্বুদ্ধিতামূলক দাবী প্রমাণ করে যে, তারা ইসলামের অর্থই বুঝে নি। তাদের এসব অমূলক দাবী-দাওয়ার কথা শুনেও তিনি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন না এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্নও হলেন না; বরং তাদেরকে বিস্তারিত বুঝাতে লাগলেন এবং অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে তাদের দাবীগুলো প্রত্যাখ্যান করে গেলেন। সকল কথার ক্ষেত্রেই তিনি নম্রতা ও কোমলতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। ইশার পর থেকে সারারাত তিনি তাদের সাথে আলাপচারিতায় কাটিয়ে দিলেন। তাদের সম্মানার্থে মসজিদে নববীতে তিনি তাদের জন্য আলাদা তাঁবু স্থাপন করলেন।[258] অথচ তারা এখনো পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নি।

চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে সাক্বীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল কোনো ছাড় ও অপূর্ণতা ছাড়াই ইসলামকে গ্রহণ করে নিল। পরে গোত্রের অন্য সকলেও ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হল। পরবর্তীতে তারাই ছিল দীনের ওপর অধিক অটল ও অবিচল। এমনকি ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফিতনা ছড়িয়ে পড়লেও।

এটা নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন। তাদেরকে দূরাবস্থায় পেয়ে যদি আনন্দ ও মনোতুষ্টি প্রকাশ করতেন। তাহলে বর্তমান অবস্থায় তাদেরকে নিয়ে আসা যেত না; বরং আরব ভূখণ্ডে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তারা পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এসব কিছুর মধ্যে যা দেখতে পেলাম এতে তিনি আমাদেরকে নম্রতা ও সদাচরণেরই সবক শেখালেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق مالايعطي على العنف وما

উয়ূনুল আসার (২/৩০৬)।

258. ইবন সা'দ: আত-তাবাকাতুল কুবরা (১/৩১৩)।

لايعطي على ماسواه»

“আল্লাহ সহনশীল। তিনি সহনশীলতাকে পছন্দ করেন। তিনি সহনশীলতার অবস্থায় যা দান করেন কঠোরতার অবস্থায় তা দান করেন না এবং অন্য কোনো অবস্থায়ও তা দান করেন না।”[259]

আরব ভূ-খণ্ডেরই নয় শুধু; বরং গোটা পৃথিবীর শান্তি ও কল্যাণ বিরুদ্ধাচারীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আচরণ -বিধিতেই আমরা দেখতে পেয়েছি। বিনয় ও নম্রতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে কতইনা চমৎকার কথা তিনি বলেছেন,

«من يحرم الرفق يحرم الخير»

“যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।”[260]

وصل اللّٰهم و سلم و بارك على من علم الناس الخير وهداهم إلى الرشد... رسول الله و على آله وصحبه وسلم .

259. সহীহ মুসলিম: (باب فضل الرفق،كتاب البر والصلة والأدب) হাদীস নং ২৫৯৩, ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৫৫২, বায়হাকী: আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ২০৫৮৬।

260. সহীহ মুসলিম: (باب فضل الرفق،كتاب البر والصلة والأدب) হাদীস নং ২৫৯২, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮০৯, ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৬৮৭, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৯২২৯, ইবন হিব্বান: জুবাইর হতে, তিনি আব্দুল্লাহ আল-বাজালী হতে- হাদীস নং ৫৪৮।

পরিশিষ্ট

এ গ্রন্থে আমরা ইসলামি শরী'আতের অনেকগুলো বিষয় থেকে একটি বিষয়ের এবং নবী চরিত্রের অনেকগুলো দিক থেকে একটি মাত্র দিকের মোড়ক উন্মোচন করার প্রয়াস চালিয়েছি। শত চেষ্টা সত্ত্বেও শরী'আতের এ বিধানটির এবং এ বিধান বাস্তবায়নে নববী পদ্ধতির পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি।

এ তো হচ্ছে শুধু অমুসলিমদের সাথে আচরণ প্রসঙ্গ...।

আর ইসলামের অন্য সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়নে তাঁর মাহাত্ম্য এবং তাঁর জীবনের অভিনবত্বের যাবতীয় সকল বিষয়গুলোর ব্যাপারে আপনার কী ধারণা..?!

নিশ্চই এটা এমন বিষয় যার ধারণ ক্ষমতা পাহাড়েরও নেই..!!

আমাদের মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও জীবনীর একটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এখন আমি কয়েকটি আবেদনের দিকে যাব।

প্রথম আবেদন: সাধারণ মুসলিমদের প্রতি।

হে মুসলিম সম্প্রদায়..!

কতইনা মহান দীন আপনারা পালন করছেন, কতইনা উন্নত জীবন বিধান আপনারা অনুসরণ করছেন। ইসলাম হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত দীন। এটি নাযিল করেছেন যিনি প্রকাশ্য গোপন সব জানেন। এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ, যিনি সকল সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয়েও সম্যক জ্ঞাত।

আপনারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টির নিকট প্রেরিত সর্বশেষ বার্তা বহন করছেন। মহৎ, সর্বজনীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বার্তা। যা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

আল্লাহ আপনাদেরকে এমন নি'আমত দান করেছেন যার কোনো সীমা নেই। তা হচ্ছে ইসলামের নি'আমত। সুতরাং নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করুন। আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিবেন। ইসলামের নি'আমতের

শোকরিয়া আদায় করার পদ্ধতি হচ্ছে,

প্রথমত: ইসলামের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল বিধানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা।

দ্বিতীয়ত: পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর নিকট এর সুস্পষ্ট ও সঠিক দাওয়াত তুলে ধরা। দায়িত্ব অনেক বড় এবং প্রাপ্তিও অত্যন্ত মহান।

আপনাদের ওপর নবীদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কেননা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কোনো নবী নেই। দীন ইসলামের পরেও আর কোনো দীন নেই।

হে মুসলিম ভাইয়েরা..!

আপনাদের নিকট এ মহা বাণী বিশুদ্ধ ও অবিকৃতভাবে এসে পৌঁছেছে। কারণ নবী যুগের এবং পরবর্তী যুগের একদল অতি নিষ্ঠাবান পুরুষ ও নারী তা বহন করে এনেছেন। নইলে আপনাদের পর্যন্ত এ দীন অবিকৃতভাবে পৌঁছতো না।

হে মুসলিম জাতি..!

আপনারা স্বীয় দীন নিয়ে গর্ব করতে পারেন। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, নবী-রাসূলগণের সর্দার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করুন। যারা কুফুরীতে ছুটাছুটি করছে তারা যেন আপনাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। তারা আল্লাহর কিছুই করতে পারবে না। তারা যে নবী জীবনীতে দুর্নাম করে বেড়াচ্ছে তা যেন আপনাদের মনকে দুর্বল করতে না পারে। কেননা তা যত বর্ধিত ও ভয়াবহ আকারই ধারণ করুক না কেন -এটি হচ্ছে মানব সৃষ্ট ষড়যন্ত্র মাত্র, যার বর্ণনায় আল্লাহর এ বাণীই ﴿وَيَمۡكُرُونَ﴾ "আর তারা ষড়যন্ত্র করে"- যথেষ্ট।

অপর পক্ষে আল্লাহর ঘোষণাটিও আপনাদের জানা থাকা উচিত।

﴿وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠﴾ [الانفال: ٣٠]

"আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বোত্তম কুশলী।" [সূরা

আল-আনফাল, আয়াত: ৩০]।

ততদিন ইসলাম ঠিকে থাকবে যতদিন পৃথিবীতে প্রাণ ও প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে। মানুষ যতদিন থাকবে ইসলামি শরী'আতও স্বমহিমায় ততদিন বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ নিজ কর্মসম্পাদনে চিরবিজয়ী; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না।

দ্বিতীয় আবেদন: মুসলিম সমাজে বসবাসকারী অমুসলিমদের প্রতি।

এটিই আমাদের ধর্ম।

এতে কি আপন বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভীতি সঞ্চার করার মতো কিছু আছে?

ইসলামি শরী'আতের মৌলিক নীতিমালা এবং সেগুলোর সরেজমিনে বাস্তবায়নের ইতিহাস এ কথার দাবী করে যে, অমুসলিমরা গোটা পৃথিবীতে ইসলামের মতো এতো অধিক সদাচারী, ন্যায়পরায়ণ ও মহৎ কোনো মতাদর্শ কোথাও দেখে নি। পৃথিবীর ইয়াহূদী-খ্রিস্টানরা ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়াতলে যে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা পেয়েছে তা তারা নিজেদের রাষ্ট্রের স্বজাতীয় লোকদের ন্যায়পরায়ণতার মাঝেও পায় নি।

আমরা আমাদের ধর্মের বিস্তৃত ইতিহাসের কোথাও এমন কিছু খুঁজে পাই নি যা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী সংখ্যালঘু অমুসলিমদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার, নিপীড়ন বা পক্ষপাতমূলক আচরণের ইঙ্গিত বহন করে। আমরা ইসলামের উষালগ্ন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সকল শ্রেণির অমুসলিমদের সাথে লেন-দেনে সদাচারণ, বিচারে ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিকভাবে সম্মান প্রদর্শনের মূলনীতিকেই প্রতিপালন করে আসছি।

ইতিহাসের কোথাও কিংবা ঘটনাপ্রবাহের কোনো দৃশ্যে যদি আপনি কোনো মুসলিম শাসক বা বিচারক কর্তৃক যুলুম-নির্যাতনের কিছু দেখতে পান তাহলে সেটাকে নিশ্চয় বিচ্ছিন্ন ঘটনাই বলতে হবে এবং দেখবেন যে, সেখানে যুলুমের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে অবশ্যই মুসলিম ব্যক্তিরাও রয়েছেন। যালিম তো যুলুম করার ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম বিচার করে না। একজন

ন্যায়পরায়ণ মুসলিমও তেমন। সে ইনসাফের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করে না।

আমাদের দীনের ন্যায়পরায়ণতার সবচেয়ে স্পষ্ট ও সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে ন্যায়পরায়ণতা সর্বজনীন। মানুষই নয় শুধু বরং এখানে প্রতিটি সৃষ্টজীবের সাথে ইনসাফ করা হয়। যে দীনে কোনো বিড়াল কিংবা উষ্ট্রীর সাথে এমনকি কোনো উদ্ভিদের প্রতিও অবিচার করা নিষিদ্ধ সে দীনে কীভাবে মানুষের প্রতি অবিচারের অবকাশ থাকতে পারে?!!

মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ও নির্ভরতার কারণ হলো যে, আমরা মুসলিমরা তাদের সাথে ইনসাফ ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে ধর্মীয় ইবাদত হিসেবেই পালন করে থাকে। আমরা যদি অমুসলিমদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম-নির্যাতন করি এতে আমরা আমাদের রবের নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হই। শরী'আতের দৃষ্টিতে বড় ধরণের অন্যায় কাজে জড়িত বলে বিবেচিত হই। পরকালে এর জন্য হিসাব ও জবাবদিহিতার ভয়ে শঙ্কিত থাকি।

﴿يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ ٨٩﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩]

“যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না, তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তরে।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

ব্যক্তিগত সমালোচনা এবং আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আমাদেরকে সংযত রাখে। আমাদের কোনো পুলিশ বা সভা-সংঘের প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে গ্রথিত। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যেমনটি এ গ্রন্থে আমরা দেখেছি যে, আমরা যেন অমুসলিমদের প্রতি দয়াদ্র হই, তাদের সাথে নম্র ও কোমল আচরণ করি, তাদের কল্যাণে হস্ত প্রসারিত করি এবং তাদের স্বার্থে মন-প্রাণ উজাড় করে দেই।

এসব কিছু করতে আমরা কখনো চাপ বা কষ্ট অনুভব করি না; বরং এটিই আমাদের ধর্মের স্বভাবজাত প্রকৃতি এবং এমনই আমাদের লাইফ স্টাইল।

সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান হচ্ছে আমাদেরকে জানুন, বুঝুন এবং অনুধাবন করুন।

তৃতীয় ও সর্বেশষ আবেদন: সর্বকালের সর্বসাধারণের প্রতি:

আপনারা ইসলামের বিধি-বিধান ও মুসলমিদের ইতিহাসকে তার সঠিক উৎস থেকে জানুন। আমরা অতীত ও বর্তমানে ইতিহাসে ও বাস্তবে অনেক যুলুমের স্বীকার হয়েছি। আমাদের অনেক ইতিহাস লিখিত হয়েছে আমাদের শত্রুদের হাতে। আমাদের অনেক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয় ও অনেক ভেদ-রহস্যের। কথা রচিত হয়েছে আমদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারীদের কলমে। এটি তো ইনসাফের কথা হতে পারে না যে, মানুষ আমাদের ঘটনা শুনবে এমন কারো নিকট থেকে যে আমাদেরকে ঘৃণা করে। এটাও ইনসাফের দাবী নয় যে, আমরা ইসলামের একনিষ্ঠ ধারক-বাহকদের রচনা বাদ দিয়ে অন্যদের মিথ্যা ও বানোয়াট কথার ওপর নির্ভর করবো।

ইসলামের ইতিহাসকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে জাল করা হয়েছে এবং স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে এর বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। পশ্চিমারা ও স্বার্থবাদী মহলের অনেকেই মুসলিম উম্মাহর মস্তিস্ক বিকৃত করা ও সভ্যতার ইতিহাসকে কলংকিত করার প্রয়াস চালিয়েছে। তাদের কেউ জাল ইতিহাস রচনা করেছে আবার কেউ করেছে বিকৃতি সাধন। কেউ সঠিককে ভুলে যাওয়ার ভান করে অশুদ্ধকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আবার কেউ মানবীয় দোষ -ত্রুটিকে প্রকাশ করে গুণ-গরিমা সম্পর্কে নিরবতা প্রদর্শন করেছে। এসব কিছু করেছে তারা গভীর ষড়যন্ত্র সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। ফলে ইসলামী ইতিহাসের নতুন এক বিকৃত রূপ ও কাঠামো তৈরি হয়েছে, বাস্তবতার সাথে যার কোনো মিল-ই নেই। আমি পৃথিবীর সত্য সন্ধানী গবেষকদেরকে এবং শান্তি ও উন্নতি প্রত্যাশী সকলকে আহ্বান করবো যে, আসুন, আমরা দীন ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসকে তার সঠিক উৎস এবং স্বচ্ছ উৎপত্তিস্থল থেকে অধ্যয়ন করি।

পৃথিবী যদি আমাদের ইতিহাস অধ্যয়নের পাঠ ছেড়ে দেয় এবং আমাদের

সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণসমূহ ভূলে যায় তাহলে অনেক মঙ্গল ও কল্যাণকে হারারে এবং এক মহা সম্পদের অবহেলা ও অপচয় করা হবে।

মানবতার দীর্ঘ ইতিহাসে ইসলাম কোনো গতানুগতিক কিছু নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে মানব ইতিহাসের মেরুদণ্ডতুল্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের পূর্বে যেসব কল্যাণকর বিষয় পৃথিবীতে ছিল আমরা সেগুলোকে বহাল রেখেছি, সেগুলোর সাথে সংযোজন করেছি এবং সেগুলোকে আরো ত্বরান্বিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ»

“নিশ্চয় আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম গুণাবলীর পূর্ণতা বিধানের জন্যে।”[261]

যার ফলে ইসলাম উন্নত চরিত্রের সর্বোচ্চ শিখড়ে উপনীত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ে উঠেছেন প্রশংসনীয় গুণাবলীর উজ্জল দৃষ্টান্ত।

হে সর্বকালের ইনসাফপ্রিয় লোক সকল! ইসলামকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখুন, তার সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের সীমাহীনতা দেখে অবাক হয়ে যাবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনুন, জানুন। আপনাদের প্রতি এটি অনেক বড় অবিচার যে, আপনারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারেন নি।

হে লোক সকল!

পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে বসবাসকারী হে মানবগোষ্ঠী! আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় এবং এটা আমাদের দায়িত্বও নয় যে, আমরা তোমাদের মুসলিম বানিয়ে ফেলবো। আমরা যেটি পারবো এবং যে জন্য আমরা আদিষ্ট তা হচ্ছে আমরা তোমাদের নিকট আমাদের স্বচ্ছ-সুন্দর বাণী পৌছে দিতে পারি, অতঃপর তা গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে তোমরা পূর্ণ স্বাধীন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟} [الاسراء: ١٠٧]

[261]. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৪২২১, বায়হাকী, হাদীস নং ২০৫৭১, আলবানী: সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (৪৩)।

“বলো, ‘তোমরা এতে ঈমান আন বা না আন’।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৭]

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অবশ্যই এমন একটি দিন আসবে যেদিন মহান আল্লাহ আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন। সেদিন সকলেই বুঝতে পারবে যে, কে সঠিক পথে ছিল আর কে ভুলের মধ্যে ছিল। কে হিদায়াতের অনুসারী ছিল আর কে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾ [يونس: ٩٣]

“নিশ্চয় তোমার রব কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে ফয়সালা করবেন যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করত।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৩]

সবশেষে.........

এটি নিশ্চিত যে, এ গ্রন্থে সংযোজন করার মতো এমন অনেক কিছুরই সংযোজনের ক্ষেত্রে আমি সফল হতে পারি নি। সময়ের সংকীর্ণতা, পূণরোক্তি থেকে নিরাপদ থাকা, কোনো ঘটনা ভুলে যাওয়া কিংবা অন্য কনো অজ্ঞতার কারণে। আমি স্বীকার করছি যে, আমি একজন মানুষ। আর অপূর্ণতাই মানুষের বৈশিষ্ট্য।

ইমাম শাফে‘ঈ[262] রহ. কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন -আমি এ গ্রন্থকে সে কথা দ্বারাই শেষ করতে চাই। তিনি তার কিতাবুর রিসালাহ[263] (كتاب

262. তিনি হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে‘ঈ। জন্ম ১৫০হি.। তিনি তৃতীয় স্তরের মুজতাহিদ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা‘আতের মতে বড় চার ইমামের একজন তিনি। তিনিই গোটা শাফে‘ঈ মাযহাবের উদ্ভাবক। তিনিই সর্বপ্রথম উসূলে ফিকহ শাস্ত্র সংকলন করেন। আহমদ ইবন হাম্বল রহ. বলেন, ইমাম শাফে‘ঈ হলে দিবসের সূর্য এবং ত্রাণকর্তার ন্যায়। আমি প্রত্যেক সালাতের পরে দো‘আ করি:

اللهم اغفرلي ووالدي ولمحمد بن أدريس الشافعي.

“হে আল্লাহ আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতা এবং মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে‘ঈকে ক্ষমা করে দিন।” ইমাম শাফে‘ঈ রহ. ২০৬হি. মিশরে মারা যান।

263. কিতাবুর রিসালাহ হচ্ছে ফিকহে শাফে‘ঈদের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ। এটি শুধুমাত্র উসূলে ফিকহ বিষয়েই সর্ব প্রথম রচিত গ্রন্থ নয়; বরং উসূলে হাদীসের বিষয়েও সর্ব প্রথম রচিত গ্রন্থ। ফিকহের পাশাপাশি এটি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও গ্রন্থ। কারণ,

(الرسالة)-কে আশি বার নিরীক্ষণ করার পর স্বীয় ছাত্র আল্লামা মাযানী[264] রহ. -কে বলেছেন: "আল্লাহ চান না যে, তাঁর গ্রন্থ (আল-কুরআন) ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ নির্ভুল হোক।"[265]

وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين

ইমাম শাফে'ঈ রহ. সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অগাদ পাণ্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। এ গ্রন্থে তিনি উসূলের আম-খাস, নাসেখ-মানসূখ, ইসতেহসান প্রভৃতি অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

264. তিনি হলেন আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবন ইয়াহইয়া আল মাযানী। তিনি বাগ্মী, ফকীহ, ও আবেদ ছিলেন। তার যৌবন কালে তার সম্পর্কে ইমাম শাফে'ঈ রহ. বলেছেন,

لو ناظر المزني الشيطان لقطعه.

"যে শয়তান মাযানীর দিকে দৃষ্টিপাত করে মাযানী তাকে কেটে ফেলেন।" ইমাম শাফে'ঈ আরো বলেছেন, "মাযানী হচ্ছে আমার মাযহাবের সাহায্যকারী"। শাফে'ঈ মাযহাবের অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। যেমন, আল-মুখতাসার (المختصر), ওয়াল মুখতার আস-সগীর (والمختصر الصغير)।

265. ইবন আবেদীন: হাশিয়াতু রদ্দুল মুখতার ১/২৯।

ড. রাগিব আস-সারজানী-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ড. রাগিব আস-সারজানী ১৯৬৪ সালে মিশরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে মিশরের কায়রো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেটার মার্ক পেয়ে কৃতিত্বের সাথে স্নাতোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর ১৯৯১ সালে পবিত্র কুরআনুল কারীমের হিফয সমাপ্ত করেন এবং ১৯৯২ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেটার মার্ক পেয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৯৮ সালে মিশর ও আমেরিকার যৌথ ব্যবস্থাপনায় "কিডনী ও মূত্রনালীর প্রদাহ" বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি একাধারে-

১. কায়রো মেডিকেল বিশ্বদ্যিালয়ের প্রফেসর।

২. কায়রোস্থ ইতিহাস ও সভ্যতা রিচার্স সেন্টারের পরিচালনা বোর্ডের প্রধান।

৩. ইসলামী ইতিহাস সম্বলিত সর্ববৃহৎ ওয়েব সাইট www.islamstory.com-এর স্বপ্নদ্রষ্টা, রূপকার ও উপদেষ্ঠা।

৪. ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক বিষেশত ইসলামের ইতিহাসে গভীর পাণ্ডিত্ব অর্জনকারী।

৫. ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়ণে তার অভিনব ও কৌতুহলুদ্দিপক গবেষণা এবং এ নিয়ে বিষদ পর্যালোনায় তার মননশীলতা ছিল এ রকম যে, "(معًا نبني خير أمة) চলুন আমরা আমাদেরকে সর্বোত্তম উম্মত হিসেবে তৈরী করি"। আর এ লক্ষে তিনি উম্মতের জন্য কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে:

(ক) জাগরণমূলক কর্মতৎপরতা গ্রহণ এবং উম্মাহের পূণর্গঠনে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া।

(খ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মুসলিম হৃদয়ে আশা সঞ্চারণ ও তাদেরকে উপকারী বিদ্যার্জনে উদ্বুদ্ধকরণ।

(গ) ইসলামের ইতিহাসকে মিথ্যা অপবাদ থেকে পরিশোধন করতঃ ইসলামের প্রকৃত সভ্যতার চিত্র উন্মোচিত করণ।

(ঘ) বক্তৃতা, গ্রন্থ রচনা, প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং নানা বিশ্লেষণ ও গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ইলম ও দাওয়াহ ইলাল্লাহ-এর ময়দানে বিস্ময়কর অবদান রেখে চলেছেন। তিনি তার দাওয়াতের মিশন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ইতিহাস ও ইসলাম নিয়ে গবেষনায় এ পর্যন্ত তার ৩৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

(১) من هو محمد صلى الله عليه وسلم

(২) ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين ف حضارة الإ نسانية

(৩) الرحمة في حياة الرسول صلى الله عليه و سلم

(৪) المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب

(৫) أليست نفسًا.. جمال التعامل النبوي مع غير المسلمين

(৬) قصة الأندلس

(৭) قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب

(৮) قصة التتار من البداية إلى عين جالوت

(৯) قصة الحروب الصلبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي

(১০) العلم وبناء الأمم- دراسة تأصيلية في بناء الدولةو تنميتها

(১১) روائع الاوقاف في الحضارة الإسلامية

(১২) أخلاق الحروب في السنة النبوية

(১৩) قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية

(১৪) فلسطين.. واجبات الأمة

(১৫) وشهد شاهد من أهلها

(১৬) رحماء بينهم- قصة التكافل والإغاثة في الحضارة

(১৭) بين التاريخ والواقع- أربعة اجزاء

(১৮) رمضان و نصر الأمة

(১৯) أمة لن تموت

(২০) رسالة إلى شباب الأمة

(২১) كيف تحافظ غلى صلوة الفجر

(২২) كيف تحفظ القرآن الكريم

(২৩) القراءة منهج حياة

(২৪) المقاطعة.. فريضة شرعية و ضرورة قومية

(২৫) أخي الطبيبقاطع

(২৬) أنت و فلسطين

(২৭) فلسطين لن تضيع.. كيف؟

(২৮) لسنا في زمان أبرهة

(২৯) إلا تنصروه صلى الله عليه و سلم

(৩০) التعذيب في سجون الحرية

(৩১) رمضان و بناء الأمة

(৩২) الحج ليس للحاج فقط

(৩৩) من يشتري الجنة

এ ছাড়াও তিনি মানবিক কল্যাণে নানা ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন টিভি ও রেডিওতে সংলাপ ও আলোচনা পেশ করেন। তন্মেধ্য রয়েছ- ইক্বরা, আর-রিসালাহ, আল-হিওয়ার, আন-নাস, আল-কুদস, আল-মুসতাকবীল, আল-আরাবিয়্যাহ, আল-জাযিরাহ, আল-জাযিরা মুবাশির, আস-সাওদান, ইযা'আতু উম্মুল কাওয়ীন ও ইযা'আতু আল-কুরআনিল কারীম ফিলিস্তিন, উরদুন, লেবানন, সুদান ও আরব আমিরাতের প্রভৃতি রেডিও ও টিভি সম্প্রসারণ কেন্দ্রসমূহ।

ড. রাগিব সারজানীর সৃজনশীল কর্ম তৎপরতা এখানেই শেষ নয়; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের জীবনাচার, উন্দোলুসের ইতিহাস, তাতারীদের ঘটনাপ্রবাহসহ নানা বিষয়ে রয়েছে তার

শত শত অডিও-ভিডিও, লেকচার ও টকশো।
আল্লাহ এ মহৎ ব্যক্তির কর্মতৎপরতাকে কবূল করুন। আমীন।

সমাপ্ত